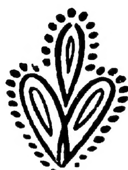


বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
* * * * * * * * কলিকাতা-১২ * * * * * * * *



প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

মুদ্রাকর—সুকুমার চৌধুরী

বাণীশ্রী প্রেস

৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

মাতৃদেবীকে—

আরম্ভের আগে একটু ভূমিকার দরকার।—

একদিন জেলে বসিয়া জেলের কথা লিখিয়াছিলাম, আজ আর একবার বাহিরে আসিয়া সেই অসমাপ্ত কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। যখনকার কথা লিখিতেছি, তখন হইতে আঠারো বছর দূরে সরিয়া আসিয়াছি। ইহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। অসুবিধার কথাটাই আগে বলি। আঠারো বছরের দীর্ঘ ব্যাবধান পার করিয়া দৃষ্টিটাকে পিছনে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে, অর্থাৎ অতীতকে উদ্ধার কারতে গিয়া স্মৃতির সাহায্য লইতেছি। স্মৃতি যে সব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা জানা কথা। আবার স্মৃতি যে ইতিহাস নহে, একথাও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। আরও একটা কথা, সময়ে স্মৃতি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, অর্থাৎ স্মৃতির চোখে ছানি পড়িয়া আসিতে থাকে। স্মৃতির এই ঝাপ্‌সা ও প্রায়-অন্ধ চোখে অতীতকে দেখিতে গিয়া যাহা দেখা যায়, তাহা ঠিক অতীতকে দেখা নহে। একেবারে নূতন কিছু দেখার সামিল তাহা। সংক্ষেপে ইহাই হইল অসুবিধার দিক।

সুবিধাও যে কিছু না আছে, এমন নহে। সুবিধা এই যে, আঠারো বছর বয়স বাড়িয়াছে। বয়স বৃদ্ধি মানে আয়ুর পুঁজি ব্যয় করিয়া জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন। ঘটনার স্থান ও কাল হইতে পাত্র যখন আঠারো বছর দূরত্বে সরিয়া আসে, তখন অভিজ্ঞতার চেয়েও বড় একটা লাভ অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত হইয়া পড়ে। স্থান ও কালের সঙ্গে পাত্রের সম্বন্ধ একেবারে স্থায়ী পাকা বন্ধন। দূরত্বের দরুণ স্থান ও কালের বন্ধনটুকু হইতে পাত্রের মুক্তিলাভ

ঘটে। এই মুক্তিটুকুই পরমলাভ। ইহাকে মনের গ্রন্থি-মোচনই বলা চলে। ইহার ফলে আমাকেই দেখিবার আশ্চর্য সুযোগ বা সুবিধাটা আমার আসিয়া যায়। বর্তমানের আমি-র চোখে অতীতের আমি-কে দেখিবার এই সুযোগটাকেই আমি মস্তবড় সুবিধা বলিয়া মনে করি। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, আঠারো বছরের আগের আমি ও আজিকার আমি—এই দুই আমি এক হইয়াও কিন্তু এক নহে। ভূমিকা এই পর্যন্তই, অর্থাৎ অলম্—

জেলে আসিয়াছি ছয় মাসও ভালো করিয়া পার হয় নাই, কিন্তু একটা কথা বেশ পরিষ্কার বুঝিয়া ফেলিলাম এবং একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। কথাটা এই—ছয় কোটি বাঙালীর মধ্য হইতে যাঁহারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছেন এবং এত সমাদরে জেলের খাঁচায় আনিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন, খুব সহজে তাঁহারা আমাদিগকে রেহাই দিবেন না। যদি কোনদিন ছাড়িয়া দিতেই হয়, তবে তার আগে আমাদিগকেও যথাসাধ্য শায়েস্তা করিয়া লইবেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস ছিল না। প্রত্যুত্তরে "জেল জেলই সই" বলিয়া আমরাও প্রস্তুত হইয়া গেলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি, ছাড়া একদিন পাইবই; আর, যদি মরিয়া যাই, তখনও ইংরেজের জেল হইতে ছাড়া পাইব। যেদিক দিয়াই দেখি, হিসাব আমাদের মিলিয়া গেল। অর্থাৎ, দেশের মুক্তি আসার বহু আগেই আমাদের অনেকেরই মানসিক মুক্তি হিসাবের খাতায় জমা হইয়া গেল।

বরাতের জোর ছিল, তাই ছয়মাসের মধ্যেই তিন তিনটা জেল দেখা হইয়া গেল—প্রথম মাদারীপুর জেল, দ্বিতীয় ফরিদপুর জেল এবং তৃতীয় সিউড়ী জেল। এদেশে জন্মিয়াও এদেশ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের মত লোকের খুব বেশী ছিল না। ভাগ্যের উপর রাজদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, তাই পদ্মাপাড়ের বাঙাল হইয়াও সরকারের কাঁধে চড়িয়া একেবারে বীরভূমের রাঙ্গামাটির দেশে

চালান হইয়া আসিতে পারিয়াছিলাম। ইহাকেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা, যাহা বহন করিবার জন্য ভগবান পর্যন্ত লোলুপ হইয়া উঠেন—আর মর্তের ভগবান মানেই রাজা অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট।

১৯৩০ সাল, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্যারাকের হট্টগোল হইতে সরিয়া সেলে আশ্রয় নিয়াছিলাম। ফাঁসীর আসামী, ভয়ানক কয়েদী, পাগল প্রভৃতির জন্যই সেলের ব্যবস্থা। সেলকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এহেন ভয়ঙ্কর সেলে কি সুখে অথবা সখে আমি ব্যারাকের বন্ধুদের ছাড়িয়া একা বাস করিতে চাই, ইহা জেলার সাহেব কিছুতেই বুঝিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষে বলিতে হইল যে, পড়াশুনা করার বদ অভ্যাসটা আমার আছে। সেলে আসিলে সেদিক দিয়া একটু সুবিধা হইবার আশা রাখি। আরও একটা কথা, একা থাকিতেই আমার ভাল লাগে।

জেলার বাবু যেন একটা আলোচনার বিষয় পাইলেন, কহিলেন, "বলেন কি ? একা থাকতে ভালো লাগে ?"

—"আজ্ঞে, আমার তো তাই লাগে।"

শুনিয়া জেলার বাবু শুধু বিস্মিতই নহে, একটু যেন ভীতও হইলেন,—"আমার তো একা থাকার কথা ভাবতেই ভয় করে। নিজেকে পর্যন্ত তখন আমার ভয় ভয় করে।"

হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম,—"একা থাকেন নি কিনা, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আসলে কিন্তু একা থাকতেই আরাম।"

কথাটা জেলার বাবু একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া বলিলেন—"কি যে বলেন, মানুষ একা থাকতে আরাম পায়।—সেলেই যাবেন তবে ?"

—"আজ্ঞে হাঁ, যদি আপনারা বাধা না দেন।"

—"না না, আমরা বাধা দিতে যাব কেন। কিন্তু ভয় পাবেন না তো ?"

এ প্রশ্ন জেলারবাবু পূর্বেও করিয়াছেন, তাই এবার আমাকেই প্রশ্ন করিতে হইল—"ভয়ের কথা এত বলছেন, ব্যাপার কি বলুন তো ?"

জেলার বাবু যেন অতি অনিচ্ছাতেই খবরটা ব্যক্ত করিতেছেন, এইভাবেই বলিলেন,—"সেলের বাইরে দেয়ালের ওপাশে নিমগাছটা দেখেছেন?"

কহিলাম, "দেখেছি, একটা অশ্বত্থ গাছও তো নিম গাছটার গা ঘেঁসে আছে।"

—"হাঁ, আছে। কিন্তু জায়গাটা ভালো না।"

—"কেন?"

—"একটা কবরের উপর গাছটা উঠেছে। দেখেননি, রোজ সন্ধ্যায় ওখানে বাতি দেওয়া হয়!"

"তাতো দেখেছি, এতে ভয়ের কি হোল।"

জেলার বাবু বলিলেন,—"শুনলেন না যে, একটা কবরের উপর গাছ দুটো রয়েছে।"

কহিলাম, "তাতে কি হয়েছে?"

জেলারবাবু কহিলেন, "আপনাকে ভয় দেখাচ্ছিনে, সত্যিই ওখানে একটা কবর আছে, কোন পীর না ফকিরের।"

হাসিয়া কহিলাম, "পীর ফকিরের কবর ভয়ের চেয়ে ভক্তিরই ব্যাপার ওটা, তা ভালোই হোল।"

এবার জেলারবাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং আমিও আমার বাক্স বিছানা ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি সহ সেলে আসিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইলাম।

জেলারবাবুর পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া সেলে আসিয়াছি, এজন্য নিশ্চয় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। গোয়ার্তুমির জন্য আমার একটু শিক্ষা হউক, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। তাই সপ্তাহ দুয়েক পরে যখন তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি ভূত দেখিয়াছি, তখন তিনি আনন্দে ডেক চেয়ারটার উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, অর্থাৎ ব্যাপরটা শুনিবার জন্য জুৎসই হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মুখে বলিলেন, "ভূত দেখেছেন? কোথায়?"

কহিলাম. "এই সেলে।"

—"এই ঘরে ? কখন ?" বলিয়া ঘরের মধ্যে চোখটা একবার ঘুরাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লইলেন।

আমি প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—"রাত আড়াইটা হবে।"

জেলারবাবু ধৈর্য রাখিতে পারিতেছিলেন না, অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, "খুলে বলুন না।"

খুলিয়া যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে এই—

ছোট্ট সেলের একটিমাত্র দরজা, লোহার গরাদ ব্যতীত আর কোন বস্তু ছিল না, কাজেই বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদির অবাধ প্রবেশের ঢালা রাস্তা ছিল। দরজার পরেই ছোট্ট ইয়ার্ড দেয়ালঘেরা, তৎপরে কাঠের মজবুত একটি দরজা। রাত্রে দুই দরজাতেই তালা পড়িত। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়া একটা বই শেষ করি। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মশারি ফেলিয়া বালিশে মাথা দিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ এক সময়ে কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই চোখ খুলিলাম। দরজার দিকেই পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলাম। নেটের মশারি, তাই দৃষ্টি তেমন বাধা পায় নাই, দেখিলাম, অদ্ভুত রোগা তেমনি অদ্ভুত লম্বা একটা লোক দুই হাতে গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেয়ালের ওপাশের কবরের কথা মনে পড়িতেই দরজায় দাঁড়ানো উপস্থিতিটার পরিচয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই মনে রইল না, বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। যতদূর মনে আছে গায়ে কাঁটাও দিয়াছিল। কিন্তু অমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে কেন ? নড়ে না কেন ? হঠাৎ হাসি আসিয়া গেল, মশারি তুলিয়া ফেলিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই।

এইখানে জেলারবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আপনার গায়ে কাঁটা দিল, তারপরেই আপনার হাসি পেল ?"

—"আজ্ঞে, তাই পেল। ব্যাপারটা যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

—"কি ব্যাপার ? কে দাঁড়িয়েছিল ?"

—"কেউ না।"

—"কেউ না? এই যে বল্লেন, দুই হাতে গরাদ ধরে রোগা লম্বা কে দাঁড়িয়েছিল।"

—"ওটা দৃষ্টিবিভ্রম। ঘুমাবার আগে চেয়ারটা দরজার কাছে টেনে নিয়ে গড়গড়টা তার উপর রেখেছিলাম। মাথায় কল্কি চড়ানোই ছিল, আর নলটা ছিল তার গলায় মালার মত জড়ানো। হঠাৎ চোখ চেয়েছিলাম, চোখে ছিল ঘুমের জড়তা, বাধা ছিল পাতলা নেটের মশারির, আর কাৎ হয়ে শুয়ে থাকায় দৃষ্টি-কোণে অস্বাভাবিকতা ছিল,—তাই সবশুদ্ধ মিলে গড়গড়াটাই ঐ আকার ধারণ করেছিল। বুঝতে পেরে মনে মনে না হেসে থাকতে পারলাম না।"

জেলারবাবু অতিশয় ক্ষুণ্ন হইলেন, ভূত দেখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে শেষে কিনা একটা গড়গড়া দেখাইলাম, ইহাতে আশাভঙ্গের আঘাত লাগে বৈ কি। মুখে কিন্তু বলিলেন,—"যাক, বেঁচে গেছেন। কিন্তু ভাবুন দেখি, সত্যই যদি অন্য কিছু হোত—"

আমিও উত্তর দিলাম,—"আগে আপনার সেই সত্যই অন্য কিছু হোক, তখন দেখা যাবে।"

ভূত নাই, এই কথাটা কিন্তু এই কৌশলে বলিবার চেষ্টা আমি করিতেছি না। আমি ভূত দেখি নাই বলিয়াই যে ভূত নাই, এমন গোয়ার্তুমি বা যুক্তি আমার নহে। ভূত আছে, সত্যই আছে, অর্থাৎ আমি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। ভূতে বিশ্বাস করি বলিয়াই যে আমি ভূত দেখিতে চাহি অথবা ভূত দেখিয়াছি, এমনও যেন কেহ না মনে করেন।

সিউড়ী জেলে শীত আসিল। ছয়টা ঋতুতে পৃথিবীর বৎসরটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনে দিন ও রাত্রির আবির্ভাব ঘটে, আর তার বার্ষিক গতিতে ঋতুগুলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হইয়া আসে—পণ্ডিতেরা এইরকম বলিয়া থাকেন। আমাদিগকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু দেয়াল তুলিয়া জেলটাকে পৃথিবী হইতে

বিচ্ছিন্ন করার শক্তি ইংরেজ গভর্নমেণ্টেরও ছিল না। তাই দেয়ালের বাধা ডিঙ্গাইয়া সিউড়ী জেলেও শীত দেখা দিল।

শীতকে অনেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তুলনটা মিথ্যা নয়। সন্ন্যাসীর কথা মনে হইলেই শুষ্ক, কঠিন, আভরণ-শূন্য মূর্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। সর্ব আভরণ-রিক্ত তপস্বী ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে শীতের যে কতখানি সাদৃশ্য, তাহা আমার সেলের ছোট্ট ইয়ার্ডের মধ্যে থাকিয়াই দেখিতে পাইলাম, এজন্য বাহির পৃথিবীর প্রকাণ্ড মূর্তিটি দেখিবার আবশ্যক রহিল না।

আমার সাঁওতাল ফালতু ভোরেই ডেক চেয়ারটাকে বাহির করিয়া ইয়ার্ডে পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। পায়ের কাছে কাঠের চেয়ারটায় দু পা তুলিয়া দিয়া পূর্বমুখী হইয়া আরাম-আসনে পড়িয়াছিলাম। চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইলাম, দেয়াল ডিঙ্গাইয়া অশ্বত্থের একটি ডাল এদিকে ইয়ার্ডের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, আর সঙ্গে আসিয়াছে বুড়ো নিমগাছটার কয়েকটা ডাল। অশ্বত্থের পাতা ঝরিয়া একেবারে রিক্ত শাখা হইয়াছে। নিমগাছটার শাখা-প্রশাখায় কিছু পাতা ঝরিবার জন্য তখনও টিকিয়া আছে। যে অনুরাগে বা বৈরাগ্যে শীতের পৃথিবী তপস্বিনী সাজে, তার চিহ্ন আমার মাথার উপরে প্রসারিত রিক্ত ও নগ্ন শাখা কয়টিতেই দেখিতে পাইলাম।

যে বাতাস গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল, তাতেও সেই একই চিহ্ন পরিস্ফুট। উপমার সাহায্য লইতেছি—এ বাতাস যেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর, রসের বা বাষ্পের কোন আর্দ্রতা বা আবিলতা ইহাতে নাই। কঠিন, শুষ্ক ও তুহীনশীতল এই বাতাস, শবাসনে আসীন তান্ত্রিকের নিশ্বাস যেন, প্রাণের স্পর্শ নিঃশেষে নিষ্পেষিত। ঘাড় তুলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি প্রেরণ করিলাম, আকাশের গায়ে গিয়া তাহা আবদ্ধ হইল। শীতের আকাশ, মেঘের ছায়া বা মায়া কোনটারই লেশমাত্র নাই। যেন সন্ন্যাসীর উদ্ধত রুক্ষ ললাট, সমস্ত চিন্তাকে পিষিয়া অথবা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে সেখান হইতে, ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি এই শীতের আকাশের। মাঝে

মাঝে বাতাসে শুকনো পাতা, ধূলো, খড়কুটা উড়াইয়া আনে—যেন সন্ন্যাসী শঙ্করের মুখ-নিশ্বাসে উৎক্ষিপ্ত ধুনীর ভস্মরাশি।

চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিলাম, বাতাসে নিমগাছের শুকনো পাতা সর সর করিয়া ঝরিয়া পড়িল, সিমেণ্ট বাঁধানো ইয়ার্ডে শুকনো পাতাগুলির মৃদু ঘর্ষণ শব্দ কানে প্রবেশ করিল। মনে হইল, দূরে নির্জন প্রান্তরে যেন পথচারী কোন্ সন্ন্যাসীর হস্তের লৌহবলয়ে ও চিমটায় ঝনৎকার শুনিতে পাইতেছি।

কোলের উপর খোলা বই পড়িয়া—নিজের চিন্তায় নিজে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। সেলের সদরগেটে পুলিস-প্রহরী আমারই প্রদত্ত সিগারেট মুখে লইয়া দরজায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া ধূমপান ও উদ্গীরণ করিয়া চলিয়াছে।—হঠাৎ বাহিরে একটা হৈ-হৈ উঠিল। ডেটিনিউ বন্ধুরা ওয়ার্ড হইতে এদিকে আসিতেছেন, নিশ্চয় কোন উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছে।

শচীশ সরকার ও শরৎ দাস মত্ত-মাতঙ্গের মত হুড়মুড় করিয়া আসিয়া সেলের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

কহিলেন,—"উঠুন, আর বসে থাকতে হবে না। কৰ্ম্ম হয়ে গেছে।"

উঠিলাম বটে, কিন্তু কি কর্ম হইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম না। বলিবার জন্য ইঁহারাই ছট্‌ফট্ করিতেছেন, আমি কেন খামাকা মাঝখান হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরিশ্রমটা করিতে যাই।

মুখে হাসি লইয়াই বলিলাম, "চলুন, ভিতরে চলুন।"

বাহিরে বসিবার সুবিধা ছিল না, সেলের ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম। শরৎ দাস চেয়ারটার কাঁধ ধরিয়া হাতে ঝুলাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া তাতে উপবেশন করিলেন, আর শচীশ সরকার লম্বা মোটা হাতে ডেক-চেয়ারটার কান ধরিয়া ঘরের মধ্যে হেচড়াইয়া টানিয়া লইয়া তাহাতে আসন লইলেন। আমি গিয়া লোহার খাটে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

বসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম, অর্থাৎ এখন কার্যটা যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

শচীশবাবু বলিলেন, "বক্সায় যেতে হবে।"

এতবড় একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিবার পরেও আমাকে হাসিতে দেখিয়া শরৎ দাস কহিলেন, "বিশ্বাস হোল না বুঝি ?"

কহিলাম, হবে না কেন, আমি কি নাস্তিক ? তবে খবরটা কোথায় পেলেন ?"

শচীশ সরকারই জবাব দিলেন,—"অতি বিশ্বস্ত সূত্রে !"

—"বিশ্বস্ত সূত্রটি কে ?"

—"যে কণ্ট্রাক্টর ভদ্রলোক আমাদের মাল সাপ্লাই করেন, তিনি।"

ইহার পরেও প্রশ্ন থাকে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তিনি জানলেন কেমন করে ?"

ইহাতেও আমার প্রতিপক্ষ দমিলেন না, উত্তর দিলেন,—"ভদ্রলোক বেশ অবস্থাপন্ন, পুলিশ ক্লাবে যাতায়াত আছে, সেখানেই শুনেছেন।"

যেন আদালতের কাঠগোড়ায় সাক্ষীকে পাইয়াছি,তাই সহজে নিষ্কৃতি না দিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম,—"কি শুনেছেন ?"

—"শুনেছেন যে, এখান থেকে একদলকে বক্সা দুর্গে পাঠানো হবে, অর্ডার নাকি এসে গেছে। কাল রাত্রে খবরটা দিয়ে গেছেন, গেট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আপনাকে বলা হয়নি।"

কহিলাম, "লোকটা নিশ্চয় স্পাই।"

—"তা হতে পারে, কিন্তু খবরটা যা দিয়েছেন, সত্য বলেই মনে হোল।"

এই সওয়াল জবাব শরৎ দাসের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বলিলেন,—"আসল খবরটা তো আপনাকে এখন পর্যন্ত বলা হয় নাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি খবর ?"

—"ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, অমলবাবু কে ?"

এবার সত্য সত্যই আগ্রহ সঞ্চারিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

"পুলিশ ক্লাবে নাকি আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। সবাই নাকি বলেছে যে আপনাকে বক্‌সা যেতে হবে।"

—"আর কারো নাম জানতে পারলেন ?"

ঠিক এই মোক্ষম সময়ে কেষ্ট চক্রবর্তী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই কহিলেন, "উঠুন, সময় হয়ে গেছে, অফিসে ডাক পড়েছে," বলিয়া হাতের কাগজে নামের লিষ্ট দেখাইলেন।

শচীশ সরকার ডেক-চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, শরৎ দাস চেয়ার পরিত্যাগ করিলেন এবং কেষ্ট চক্রবর্তী এক পাক নাচিয়া লইয়া গাহিয়া উঠিলেন,—"বাঁশরী বাজিল যমুনায়, ওলো তোরা কে কে যাবি আ-য়-য়।"

আমার সাঁওতালী ফালতু দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া শ্রীমান বোধহয় সেই যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই হইয়া গিয়া থাকিবে। হতভম্বের মত তাকাইয়া অবশেষে হয়তো সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল যে, বাবুদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হইয়াছে। গেটে মানে জেল-অফিসে খবর দেওয়া তার কর্তব্য কিনা, তাহাই বোধহয় এখন পর্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

কেষ্ট চক্রবর্তী কহিল,—"নে ব্যাটা, পথ ছাড়, ডাক এসেছে।"

বন্ধুদের সঙ্গে বাহির হইয়া ব্যারাকে আসিলাম। সত্য বলিলে বলিতে হয় যে, বন্ধুরা আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ব্যারাকে আনিয়া হাজির করিলেন।

সেখানে বন্ধুরা অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। মাল লইয়া বাহকগণ যথাস্থানে উপস্থিত হইতেই একেবারে হুলুধ্বনি দিয়াই তাঁহারা আগন্তুককে বরণ করিয়া লইলেন।

চীৎকার থামিলে পর কেষ্ট চক্রবর্তী হাঁকিয়া হুকুম দিলেন,—"বক্‌সার নামে একটা হুঁ দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ-পনর জনের গলায় সমস্বরে গর্জন উঠিল—"হুঁ-উ।"

ব্যারাকের চার চারটা দেয়াল ও মাথার উপরের ছাদটা এই গর্জনে থর থর

করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উঃ, গলার জোর যে কত ভীষণ হইতে পারে, সেদিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

পরে শুনিয়াছিলাম যে, এ আওয়াজ জেল অফিসে পর্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে এবং অফিসের বাবুরা একটু চমকিত মানে চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। ডেপুটি জেলার নাকি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"ব্যাপার কি? হল্লা কিসের?"

জেলারবাবু প্রবীণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অনুমানেই ব্যপারটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন—"ও কিচ্ছু না, বক্‌সা যাবার খবর পেয়ে ডেটিনিউরা উল্লাস করছে।"—উল্লাসই বটে!

আমরা ছিলাম চৌদ্দজন, নয়জনের উপর বক্‌সা বদলীর অর্ডার হইল। আরও জানানো হইল যে, সেদিন দুপুরের গাড়িতেই আমাদের রওনা হইতে হইবে।

বক্‌সা যে যাইতে হইবে, এ খবরটা আমি আগেই পাইয়াছিলাম। খবরটা পাই সিউড়ির এক নাপিতের নিকট। বাহির হইতে নাপিত আসিয়া আমাদের ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত। সপ্তাহখানেক আগে সেলের ইয়ার্ডে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিলাম, সিপাহী আসিয়া দেখা দিল, সঙ্গে এক নরসুন্দর।

বাহিরের লোক কেহ জেলে আসিলে জেলের পুলিশ, পাহারা বা অফিসার কেহ একজন সঙ্গে থাকার নিয়ম আছে। জেলে ঢুকাইবার সময় একবার এবং জেল হইতে বাহির হইবার সময় আর একবার, মোট দুইবার এই বহিরাগতদের কাপড়-ঝাড়া দিয়া তল্লাসী করিবার ব্যবস্থাও আছে। এমন কি, সিপাহীদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এই নিয়মটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জেলের কোন মাল বা কাগজপত্র অথবা স্বদেশীদের কোন চিঠিপত্র ইহারা বাহিরে লইয়া যাহাতে না যাইতে পারে, কিংবা বাহির হইতে কোন বস্তু ভিতরে আমদানী যাহাতে না করিতে পারে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। জেলের নিয়ম-কানুন এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত। কোথাও কোন ত্রুটি বা ফাঁক রাখিয়া তাহা প্রস্তুত করা হয় নাই।

নিয়ম যত কড়াই হউক, তাহা পালনে সিপাহীদের যে খুব নিষ্ঠা আছে, তাহা মনে করিবার কান কারণ নাই। নিয়ম মানুষের প্রয়োজনেই তৈরী হয় এবং সেই মানুষের প্রয়োজনেই তা আবার ফাঁকি দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে, সিপাইজী নাপিতকে আমার কাছে পৌছাইয়া দিয়াই সরিয়া পড়িল। ক্ষৌর কার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তার এখানে থাকার নির্দেশ ছিল। কার্য শেষে নাপিতকে জেল-গেট পার করিয়া দিয়া তবে তার কর্তব্য শেষ হইত। কর্তব্যের প্রতি অযথা আসক্তি সিপাইজীর ছিল না, বোধ হয় ধারে কাছে তারই মত কর্তব্য-নিযুক্ত আর কোন সিপাহীর সঙ্গে দুটা সুখ-দুঃখের আলাপ করিতে গিয়া থাকিবে।

গালে সাবান মাখাইতে মাখাইতে নরসুন্দর বলিল,—"আপনাকে ওরা খুব ভয় করেন।"

লোকটির আলাপ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, স্পষ্ট বুঝা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কারা ?"

—"জেলার বাবুরা।"

কেহ কাহাকেও যে ভয় না করে তাহা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে কথাটা কেহ সর্ব সমক্ষে প্রচার করিয়া বেড়াইবে, এমনও কোন নিয়ম নাই। ধরিয়া নিলাম যে, জেলারবাবুরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা এ জানিল কেমন করিয়া ? মনে পড়িয়া গেল যে, চাণক্যের ধূর্তের তালিকায় মানুষের পক্ষ হইতে নাপিতকেই নির্বাচিত করা হইয়াছে। লোকটা তবে আসলে নাপিতই, জেলে পা দিয়াই জেলারবাবুদের মনের এ দিকের ত্রুটিটা ধরিয়া ফেলিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এ কথা কেমন করে জানলে ?"

—"আসবার সময় জেলারবাবু ডেকে বললেন,—ওহে দেখ, সেলে যে-বাবু আছেন তাঁকে সেরে তবে অন্য বাবুদের কাছে যাবে।"

ব্যাপারটা ইহাতে আদৌ পরিষ্কার হইল না।

কহিলাম,—"এতে ভয়ের কি হোল ?"

—"যেভাবে বল্লেন, শুনলে বুঝতেন। ডেপুটিবাবুও সিপাইকে বল্লেন, হাঁ, আগে ওখানটায় সেরে তারপর যাকে খুশী কামাওগে বাপু! শুনলে বুঝতেন।"

না শুনিয়াও বুঝিলাম। কারণ, এ সব ক্ষেত্রে বুঝিবার আবশ্যক পর্যন্ত করে না, বিশ্বাস করিলেই হইল। তাছাড়া, আমাকেই যখন ভয় করেন, তখন বিশ্বাস না করা আমার পক্ষে ভালো দেখায় না। আর যেই বলুক, যার জন্য চুরি, অন্ততঃ তার কখনও চোর বলা উচিৎ নহে। তাহা হইলে সমাজে ধর্ম বলিয়া কোন কিছুই যে থাকে না।

ভয় করিবার জন্য জেলারবাবুদের যে নিজেদের বিশেষ কোন বাহাদুরি বা কৃতিত্ব আছে, আমি তা মোটেই মনে করি না। কারণ, ভয় বস্তুটি কারো বা কোন গোষ্ঠীর অথবা কোন বিশেষ সমাজের নিজস্ব একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ওতে সবারই সমান অধিকার বা ভোগ দখল রহিয়াছে। আমি তো তাই মনে করিয়া থাকি।

আচ্ছা, ভয় জিনিসটা আসলে কি বস্তু ? ইহাকে মনের একটি আদিমতম বৃত্তি বলিলে দোষ হয় কি ? এক কথায় ইহাকে মনের সহজাত স্বভাব বলিতে কোন বাধা আছে কি ? ভয়কে যদি মনের স্বভাব অথবা ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ইহাকে বৃত্তি আখ্যা দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক হইবে না। জীবন-বৃত্তের মধ্যে যে বৃত্তিটি দ্বারা জীব ধৃত, অথবা যে বৃত্তির জন্য জীবন পরিধির মধ্যেই জীব বিচরণ করিতে বাধ্য, তাহাকেই ভয় বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়াতে তখন আর বাধা থাকে না এবং তখন সকল জীবেরই ভয় নামক বস্তুটি সাধারণ ধর্ম ও স্বভাব বলিয়াই স্বীকৃত হইবে।

যাক, এত কথার আবশ্যক নাই। আমি সোজা বুঝিয়া লইয়াছি যে, ভয় মানে আসলে মৃত্যু ভয় এবং প্রাণী মাত্রেই এই জন্যই একদিক দিয়া ভীতু। বহু প্রতিভাবান, জ্ঞানী ও কর্মীকে জীবনে দেখিবার সুযোগ আমারও হইয়াছে। তাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহাও আমি মানিয়া থাকি। কিন্তু

সত্যিকার ভয়শূন্য নির্ভীক মানুষের সাক্ষাৎ আমি এতাবৎ পাই নাই। মৃত্যুকে যে জীবনেই সজ্ঞানে এই দেহে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়াছে, তার পক্ষে নির্ভীক বা অভী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই দেহে জীবিতকালে কে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে? মানুষের দীর্ঘদিনের ইতিহাসেও তেমন মানুষের সংখ্যা কি খুব বেশী?

চুপ করিয়াই ছিলাম, কারণ ভাবিতেছিলাম।

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল—"উল্টো কামাবেন?"

মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলাম এবং পূর্ববৎ চুপ করিয়াই রহিলাম।

"বাবু, অবলাবাবু কার নাম?"

—"অবলাবাবু? অবলাবাবু বলে তো কেউ এখানে নেই।"

—"যে-বাবুর ভাইয়ের ফাঁসি হয়েছে।"

বুঝিলাম, নাম ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।

ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম।

বলিলাম—"অবলাবাবু নয়, অমলবাবু। তার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

নরসুন্দর উত্তর দিল—"তাঁকে হিমালয়ে পাহাড়ের দুর্গে আটক করে রাখবে।"

বক্সা দুর্গের নামটা মনে রাখিতে পারে নাই, বলাই বাহুল্য। তাই হিমালয়ের দুর্গ বলিয়াই কাজটা চালাইয়া দিয়াছে।

এবার আমিই প্রশ্ন করিলাম—"এ কথা তুমি কোথায় শুনলে?"

—"কাল পুলিশ সাহেবের বাঙলাতে গেছলাম। সেখানে শুনলাম আপনাদের কথা হচ্ছে।"

শুনিয়া আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না যে, আমাকেও শীঘ্রই বক্সা দুর্গে স্থানান্তরিত হইতে হইবে, সিউড়ী জেলের মেয়াদ আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কহিলাম—"অমলবাবুকে দেখবে?"

সাগ্রহে কহিল—"কোথায় তিনি ?"

—"তোমার সামনেই রয়েছেন। তাঁকেই তুমি এখন উল্টো কামাচ্ছ।"

হাতিয়ার বাক্সে ভরিতে ভরিতে সিপাই আসিয়া দেখা দিল।

লোকটি বলিল—"আসি বাবু, আপনাদের দেখলে পুণ্য হয়," বলিয়া হাত জোড় করিয়া নীচু হইয়া পুণ্য লাভের দর্শনী নিবেদন করিল।

হাসিয়া বোকার মত বলিয়া ফেলিলাম,—"পুণ্য তো করেই গেলে।"

নরসুন্দর কিন্তু স্বভাব সুলভ ধূর্ততা পরিত্যাগ করিয়াই সরলভাবে উত্তর দিল—"হাঁ বাবু, ভাগ্য ভালো ছিল, তাই আপনাদের দেখতে পেলাম।"

ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমার মনকে স্পর্শ করিয়াছিল। তোষামোদেই মন তৃপ্ত হয়, আর অকপট শ্রদ্ধায় মন নম্র হইবে, এ আর বেশী কথা কি। ভক্তিতে পাথরের অচল শিব পর্যন্ত সচল হয়, আর মানুষের মধ্যেকার পুণ্যকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করা নিশ্চয় খুব বেশী আশ্চর্যের কথা নয়। কৃতিত্ব আমাদের নয়, যে আমাদের মধ্যে পুণ্যের, শ্রদ্ধার ইত্যাদি দিকটা দেখে, সমস্ত কৃতিত্ব তারই লম্পট স্বামীকে সেবা করিয়াও অনেক স্ত্রী যে সতী-শিরোমণি ও মুনি ঋষির আরাধ্যা হইতে পারিয়াছেন, তাও এই জন্যই। সত্যিকার স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা ইত্যাদি কি কম শক্তি! মানুষের জীবনে ইহাই দেবশক্তি বা আত্মশক্তি এবং মানুষের মাটির পৃথিবীকে একমাত্র এই স্নেহ-প্রেম-ভক্তিতেই স্বর্গে পরিণত করা সম্ভব। জীবন ও পৃথিবীকে সুন্দর ও সুখী করিবার অন্য কোন রাস্তা নাই।

নরসুন্দর বিদায় লইল। কিন্তু বক্সা যাইতে হইবে, এই খবরটায় মনের নোঙ্গর আলগা করিয়া দিয়া গেল। সিউড়ী জেল আমার কাছে সাময়িক বিশ্রামের পান্থশালার মতই ঠেকিতে লাগিল।

নাপিতের দেওয়া খবরটা অন্যান্য ডেটিনিউ বন্ধুদের দিতে পারি নাই। কারণ, খবরটার মধ্যে আমার আত্মপ্রচার আছে, ইহাতে অপরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে। খবরটা কাজেই, চাপিয়া গিয়াছিলাম।

তিন মাস আগে এক সন্ধ্যায় সিউড়ী জেলে চালান হইয়া আসিয়াছিলাম, এক দুপুরে তাকে আবার ছাড়িয়া আসিলাম।

দুই দারোগা ও এক পুলিশ পার্টির তত্ত্বাবধানে আমরা নিরাপদে চালান হইয়া চলিলাম। যে দারোগা বয়সে ও আকৃতিতে ছোট ছিলেন, তিনিই পদমর্যাদাতে ছিলেন বড়। তাঁর সঙ্গে সিউড়ি ষ্টেশনেই আমাদের একটু ঠোকাঠুকি লাগিয়া গেল।

বাক্স-বিছানা ইত্যাদি যাবতীয় মালপত্রই গাড়িতে উঠানো হইয়াছে। বন্দুকধারী পুলিশবাহিনী-বেষ্টিত হইয়া আমরা প্লাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছিলাম; চারি পাশে জনতা ভিড় করিয়া ফেলিয়াছিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল।

এক বন্ধু আসিয়া জানাইলেন—"দারোগাকে বলে এসেছি যে, সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়া আমরা যাব না। ইণ্টার ক্লাশে উঠবেন না যেন?"

বুঝিলাম, চরম পত্রই দিয়া আসিয়াছেন। এ দিকে মালপত্র আগেই ইণ্টারে উঠানো হইয়া গিয়াছে,—তখন কিন্তু এ ভদ্রলোক কোন কথা বলেন নাই।

—"সময় হয়ে গেছে, আপনারা এখন তবে গাড়িতে উঠুন", বলিয়া বয়সে-ছোট পদে-বড় সেই দারোগা সাহেব আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। কয়েকজনের সঙ্গে দারোগাবাবুর কিছু কথাবার্তা হইতে লাগিল, দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাইতেছিলাম। জনতা হইতে থাকিয়া থাকিয়া "বন্দে মাতরম্" চীৎকার ও মাঝে মাঝে দারোগা পুলিশের উপর মর্মভেদী মন্তব্য নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

দাঁড়াইয়া রহিলাম। আগাইতেও পারি না, পিছাইতেও পারি না, এমন জায়গায় আমরা পা ফেলিয়া বসিয়াছি।

স্টেশন মাস্টার আসিয়া দেখা দিলেন, চেনশুদ্ধ ঘড়িটা পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আপনাদের জন্য গাড়ি অলরেডি কুড়ি মিনিট লেট হয়ে গেছে।"

আমি চোখের ইঙ্গিতে দারোগাবাবুকে দেখাইয়া দিলাম। অর্থাৎ ঘড়িটা আমাকে না দেখাইয়া যাঁকে দেখাইলে কাজ হইবে, তাঁকেই দেখানো কর্তব্য।

গাড়ির দিকে তাকাইলাম—দূরে ইঞ্জিনটা ফোঁস ফোঁস করিতেছে, আর প্রত্যেক কামরার জানালা দিয়া মানুষের মুণ্ডু বাহির হইয়াছে—জোড়া জোড়া চোখে ঔৎসুক্যের সার্চলাইট। ব্যাপারটা কি হইয়াছে, দূর হইতে অনুমান করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে।

আমার সঙ্কেতে কাজ হইল, স্টেশনমাস্টার দারোগাবাবুকে বলিলেন—"আমি গাড়ি আর দাঁড় করাতে পারব না। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।"

বলিয়া ভারিক্কি চালে হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। স্টেশনমাস্টার যে!

দারোগাবাবুও যে খুব আরামে ছিলেন, মনে হইল না। বেচারা কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন,—"দয়া করে আপনারা হাওড়া পর্যন্ত ইণ্টারে চলুন।"

দয়া করিবার জন্য আমি তো প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। কিন্তু ধরা না দিয়াই বলিলাম,—"বেশ, তারপর?"

দারোগাবাবু কণ্ঠে যথাসাধ্য অকপটতা লইয়া বলিলেন,—"কলকাতা গিয়ে ফোন করে আমি দেখব যে, আপনাদের সেকেণ্ড ক্লাশে নিতে পারি কিনা। কথা দিচ্ছি, আমি চেষ্টা করব, বিশ্বাস করুন।"

বিশ্বাস করিবার স্বভাবটা আমার বরাবরই ছিল, তাই বিশ্বাস করিতে আমার একটুও বেগ পাইতে হইল না। আসল কথা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন হাঙ্গামাই আমার দিক দিয়া ছিল না, এমন অবস্থাতেই নিপতিত হইয়াছিলাম।

চোখ-মুখ হইতে গাম্ভীর্যকে তখন পর্যন্ত সরিতে দিলাম না, কহিলাম,—"আচ্ছা।"

শরৎবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"আসুন।"

অন্যান্য বন্ধুদের বলিলাম,—"দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে কলকাতা গিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশের চেষ্টা করবেন।"

তৎপর শরৎবাবুকে সঙ্গে করিয়া বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় আগাইয়া খোলা দরজার পথে নির্দিষ্ট কামরায় গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

একে একে সকলেই উঠিলেন।

যিনি চরমপত্র পেশ করিয়াছেন, তিনিও আসিলেন, অর্থাৎ মত-বিরোধ সত্ত্বেও তিনি বন্ধুদের ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

গাড়ীতে ঢুকিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শেষে ইণ্টারেই উঠলেন?"

মাথা নাড়িয়া কহিলাম,—"হাঁ। বলেন যদি তবে নেমে পড়ি।"

"—থাক কষ্ট করে দরকার নেই।"

মুখের ভাবে বুঝিলাম, মনে মনে সন্তুষ্টই হইয়াছেন। তবে আমাকে হয়তো সহজে নাও ছাড়িতে পারেন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। প্লাটফর্ম হইতে "বন্দে মাতরম্" শব্দে সমবেত অভিনন্দন আসিল, আমরাও জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম,—"বন্দে মাতরম্।"

গাড়ি কলিকাতার দিকে মরি-কি-বাঁচি করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

লোহার লাইনে ও চাকার ঘর্ষণে একটানা একটা কর্কশ চীৎকার উঠিয়া গাড়িটার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়া চলিল। চোখ বুজিলে মনে হয়, এই শীতের দুপুরে একটা ক্ষিপ্ত চীৎকার গাড়িটার পিছনে তাড়া করিয়াছে এবং তারই হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মাঠ-ঘাট-প্রান্তর সহরের উপর দিয়া গাড়িটা পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এই ক্ষিপ্ত চীৎকার তার সঙ্গ ছাড়িতেছে না।

কিছুক্ষণ যাইতেই বন্ধুরা বেশ জমাইয়া বসিলেন। আমি একপাশে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের উপর চোখ পাতিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাহির পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন জেলের আবদ্ধ জীবনযাপন করিয়াছি, চোখ ও মন দুই-ই দীর্ঘ উপবাসী হইয়াছিল। তাই কিছুই যাতে ফসকাইতে

না পারে, এমনই লোভ লইয়া চোখ দিয়া বাহিরের চলমান দৃশ্য ও ছবিগুলিকে গোগ্রাসে গিলিতেছিলাম।

কিছুক্ষণ দেখার পর একটা জিনিস মনে বড় স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল—পূর্ব বাঙ্গলার সঙ্গে বীরভূমের মাটির ও প্রকৃতির মোটেই মিল নাই। পদ্মার বৃহত্তম ও দুর্দান্ততম শাখা আড়িয়ালখাঁ নদীর পাড়ের বাঙ্গাল আমি, বীরভূমের রুক্ষ ও কঠিন লালমাটি, তাও আবার ঢেউ খেলানো ও টিলা ছড়ানো,—আমার চোখে এ ভূমি অভিনব লাগিবে বৈ কি! পাহাড় তখন পর্যন্ত চোখে দেখি নাই, ভূগোলের পুঁথিতে পড়া পাহাড় পর্যন্তই আমার দৌড়। পাথরের এই টিলাগুলিকে দেখিয়া আমি হিমালয় দেখার সুখই চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিতেছিলাম। মনের জিভে যখন আস্বাদ থাকে, তখন সামান্য বস্তুতেও অসামান্য রস ও তৃপ্তি পাওয়া যায়।

একটা নদী পার হইলাম। পাড় হইতে নদীর জল যে এত নীচে থাকিতে পারে, এও আমার নূতন অভিজ্ঞতা। আমাদের পদ্মার সঙ্গে এ-নদীর কত তফাৎ। পদ্মার জল-প্রাচুর্য, বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা এ-দেশের নদীর নাই। পদ্মার ভয়াল গাম্ভীর্য ও তেমনি প্রবল তরঙ্গ-নর্তনেরও এখানে একান্ত অভাব।

তবু এখানকার নদীরও নিজস্ব একটা রূপ আছে। অজানা জন্মগুহা হইতে বাহির হইয়া সহায়হীন একা এই দীর্ঘপথ চলিয়া আসিয়াছে এবং তেমনি অজানা মোহানায় একাকী একদিন গিয়া পৌঁছিবে—সেই পথচারী বৈরাগীর তপঃক্লিষ্ট দৃঢ়তা এর কৃশদেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পূর্ববাঙলার শ্যামল স্নিগ্ধতা এ-দেশের নাই সত্য, কিন্তু এর রুক্ষ কাঠিন্যে একটি নিরাভরণ নগ্ন শক্তির প্রখরতা ও দৃঢ়তা বেশ প্রস্ফুট। ভারতবর্ষে শক্তি-সাধনা ও তন্ত্র-সাধনার একটী বিশেষ পীঠভূমি নাকি এই বীরভূমি। দেশটার বাহিরের যতটা চোখে দেখিতে পাইলাম, তাতে এ কথায় অনায়াসে অন্ততঃ আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।

আমার বহুদিনের একটা বদ্ধ-ধারণা যে, দেশের ভূগোলই দেশের ইতিহাসের আসল মাল-মশলা যোগাইয়া থাকে। সত্য বলিতে কি, আমার ধারণাটা আসলে আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর। আমি এমন পর্যন্ত মনে করিয়া থাকি যে, সভ্যতারই আদি মূল শক্তি দেশ ও কালের মধ্যেই নিহিত থাকে। বিশেষ দেশ ও কাল এক এক সমাজের মধ্য দিয়া যে বিশেষ প্রকাশ ও রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সেই বিশেষ প্রকাশটীকেই আমি সভ্যতা বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

এই দৃষ্টিতে দেখিলে বীরভূমি যে শক্তি-সাধনা ও তন্ত্র-সাধনের ক্ষেত্র হইতে বাধ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সূর্য হইতে যত তাপ, তেজ ও আলো বিচ্ছুরিত হইয়া নীচে আসিয়াছে, তাহা সর্বদেহ দিয়া পান করিয়া পূর্ববাঙলা আবার ফুলে-ফলে-শস্যে-গাছপালায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ববাঙলার মাটি শক্তিকে যেমন গ্রহণ করিয়াছে, আবার তেমনি মুক্তও করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বীরভূমি? এর ভূমিতে সূর্য হইতে যত রৌদ্র নামিয়াছে, রসের মত তাহা নিজের মধ্যে সে তৃষ্ণাতুরের ন্যায় শুষিয়া লইয়াছে, রৌদ্ররসে এর বহির্ভাগ পুড়িয়া লাল হইয়াছে তবু সূর্যের তেজ ও তাপকে সে মুক্তি দেয় নাই, ভিতরে দগ্ধ অরণ্যের অঙ্গারে সে-আগুন বীরভূমি শবসাধক সন্ন্যাসীর মত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ফুলের পাপড়ি ঝরাইয়া ফল আনে না, সারা বনভূমিকে পোড়াইয়া আগুন জমা করে যে-মাটি, তাকে বীরভূমি নাম দেওয়া সার্থক হইয়াছে। এ-মাটি সূর্যশক্তিকে ধারণ ও বহন করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। তান্ত্রিক-শক্তির সত্যকার প্রকাশ এর মাটিতে রহিয়াছে।—

নরম ভিজা-মাটির দেশের মানুষ আমি, এই রুক্ষ, কঠিন, গৈরিক ভূখণ্ডের জন্য আকর্ষণ আজও বোধ করিয়া থাকি।

আমার পূর্ববাঙালার ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যদি লক্ষ্মী হয়, তবে এ-ক্ষেত্রের

অধিষ্ঠাত্রী।দেবী কালী। বিষ্ণুর সৃজনীশক্তিকে আমরা বলিয়া থাকি লক্ষ্মী, আর রুদ্রের প্রলয়-শক্তিকে বলি কালী। পূর্ববাঙলাকে আমি বলিতে চাই মহালক্ষ্মীর পাদপীঠ, আর বীরভূমিকে বলিব মহাকালীর পাদভূমি। শক্তির রুদ্রমুখ বীরভূমির মাটিতে আমি দেখিতে পাইলাম, আর আমার পূর্ববাঙলায় দেখিয়াছি শক্তির দক্ষিণ মুখ, কল্যাণময়ী মাতৃশক্তি।

রুদ্রশক্তি ও মাতৃশক্তি—দুইটী বিপরীত প্রকাশ সত্য, কিন্তু দুই-ই আমার আপন। অর্থাৎ ট্রেণের জানালায় বসিয়া যে-বীরভূমিকে আমার মানসনেত্রে দেখিতে পাইলাম, তাকেও আমি ভালো বাসিয়া ফেলিলাম।

সন্ধ্যার পরে গাড়ি হাওড়া স্টেশনে ঢুকিল। মালপত্র লরীতে উঠানো হইল, তারপর এক সময়ে আমাদের মোটর বাহির হইয়া আসিল। গাড়ির গতির সঙ্গে রক্তে আমাদের বেগ সঞ্চারিত হইল।

গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়াছি—শরীর ও মনে রোমাঞ্চ লাগিল। আচ্ছা, লোকগুলি অমন নিস্তেজ উৎসাহহীনভাবে পথ চলে কেন? নদীর উপর দিয়া চলিয়াছে, এ তারা খেয়াল করে না কেন? মুক্তভাবে যথেচ্ছ চলাফেরার অধিকার যে কত বড় অধিকার, তা কি ইহারা জানে না? জানিলে সে-সৌভাগ্যের এমন অপব্যবহার করে কেমন করিয়া?

হঠাৎ মনে হইল, যখন মুক্ত ছিলাম, তখন সহজ-প্রাপ্য আলো-বাতাস-জল-মাটিকে আমরাও এমন অবহেলা করিয়াছি। সহজ-প্রাপ্য বস্তু বড় সহজে পাইয়াছি বলিয়াই তার অর্থ ও মূল্য বুঝিতে পারি নাই। দীর্ঘ দিন জেলে থাকার ফলে আজ আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, জল-বাতাস-আলো সহজে পাই বলিয়াই আসলে সহজ নয়, তাকে গ্রহণ করিবার জন্য সৌভাগ্য ও সাধনা দুই-ই দরকার।

ভাসমান পুলের দুই দিকে উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত গঙ্গার দিকে তাকাইলাম। ভারতবর্ষের গঙ্গা! হিমালয়ের দুর্গম গিরিভবন হইতে মানস সরোবরের জল লইয়া সাগরে চলিয়াছে। সারা পথটা দুই হাতে উদার

অকৃপণতায় মানুষ ও মাটির তৃষ্ণা মিটাইয়া চলিয়াছে। শুধু কি তাই? কত পাপ, কত তাপ ধুইয়া মুছাইয়া দিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের সেই গঙ্গা, স্বর্গ হইতে মর্তের মাটিতে নামিবার পথে ধূর্জটির জটিল জটামণ্ডিত শিরে যে প্রথম আশ্রয় পায়, ভারতবর্ষের সেই গঙ্গা! ভারতবর্ষের মাতাকে, ভারতবর্ষের গঙ্গাকে মনে মনে যুক্তপাণি হইয়া প্রণাম করিলাম—মাতর্গঙ্গে।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছিলাম।

কয়েক মিনিটে, সামান্য কয়েক মিনিটে পথটা শেষ হইয়া গেল—শহরের পশ্চিম দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া পূর্ব দুয়ারে আসিয়া পৌছিয়া গেলাম। একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়া জাগিয়া পার হইয়া আসিয়াছি যেন।

প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। দার্জিলিং মেইল ছাড়িতে এক ঘণ্টারও উপরে দেরী আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে দার্জিলিং মেইল তার এক ইণ্টার কামরায় আমাদের ভরিয়া লইয়া উত্তরের অভিমুখে ঊর্ধশ্বাসে রাত্রির অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল।

ঘুমের মধ্যেই পদ্মা পার হইয়া আসিলাম এবং ঘুমের মধ্যেই শেষ রাত্রে পার্বতীপুরে গাড়ী বদল করিলাম!

এই শীতে আরামের ঘুম হইতে জাগিতে হইল বলিয়া সন্তোষ গাঙ্গুলী ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক এম-এস-সি পরীক্ষা দিবার আগটিতে ধরা পড়েন, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি। আমার পাশে পাশেই চলিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—"শালা!"

চমকাইয়া উঠিলাম, এ জাতীয় গালিগালাজ তাঁর মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করি নাই। বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোল?"

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, বলিয়া উঠিলেন—"কেন, স্বদেশী করেছি বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? ঘুমোতে পারব না, এমন তো কোন কথা ছিল না। ব্যাটা অমুককে (দলের বিখ্যাত নেতার নাম করিয়া) পেলে একবার ভালো

করেই জেনে নিতাম, এ কোন দেশী স্বদেশী ? ঘুমোতে পারব না, একথা ব্যাটা আগে বলেনি কেন ? জানলে কোন শালা আসত।"

আমাদের হাসির শব্দে শীতের শেষ রাত্রিটাও চমকাইয়া উঠিল। দারোগা দুজনও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই বয়সে-ছোট পদে-বড় দারোগবাবু জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলেন—"কি বলছেন ?"

সন্তোষবাবু বলিলেন—ও আপনারা বুঝবেন না। এমন স্বদেশীতে আমার কাজ নেই, ওর খুরে পেন্নাম" বলিয়া আলোয়ানের নীচেই হাত দুটো যুক্ত করিয়া প্রণামের মুদ্রাটি সম্পন্ন করিলেন।

গাড়ী বদল করিয়া আর এক গাড়ীতে উঠিলাম এবং উঠিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। দেখিয়া মনে হইতে পারিত যে কোন হাঙ্গামাই হয় নাই, আমরা শুধু পাশ ফিরিয়া শুইয়াছি যেন।

ভোরে যখন জাগিলাম, তখন জানালার পথে চাহিয়াই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম—দূরে উত্তরে সারি সারি শিখর-শ্রেণী লইয়া হিমালয় আকাশের গায়ে গা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই সেই হিমালয়—ভারতবর্ষের হিমালয় !

প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে সাহস হইল না যে, সত্যই আমি হিমালয়কে দেখিতেছি। জন্মার্জিত পুণ্য আমার ছিল, তাই হিমালয়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হইল। আমার বন্দিত্বের সমস্ত ব্যথা ও ক্ষোভ মুছিয়া গেল, ইংরেজের উপর যেন আমার কোন নালিশই আর রহিল না। হিমালয়কে দেখিবার সুযোগ তাহারাই আমাকে দিয়াছে।—সমস্ত মনকে সংহত, শান্ত ও কেন্দ্রস্থ করিয়া ভারতবর্ষের হিমালয়কে, দেবাত্মা হিমালয়কে আমি আমার প্রণাম জানাইলাম।

শরৎবাবু যে তাঁর জায়গা ছাড়িয়া আমার কাঁধ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তা টের পাই নাই। কানের কাছে তাঁর গলা শুনিয়া তবে সচেতন হইলাম। হিমালয়ের মহান শান্তি আমার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং

কয়েকটি ক্ষণের জন্য সেদিন আমিও ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, একথা বলিলে খুব জোর দিয়া যে প্রতিবাদ করিতে পারিব, মনে হয় না। তাই শরৎবাবুর সান্নিধ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন হই নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কি ?" বলিয়া চোখ ও আঙ্গুল দিয়া ওটার দিকে নির্দেশ করিলেন।

আমি কিন্তু ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া শুধু অনন্ত শিখরশ্রেণীই দেখিতে পাইলাম, কোন ওটার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

কহিলাম—"কোনটা ?"

—"ঐ যে চূড়াটা, আয়নার মত যা ঝক্‌ঝক্ করছে।"

নিজের বুদ্ধিমত উত্তর দিলাম—"ও চূড়াটা বরফে ঢাকা, রৌদ্র পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।"

এক সিপাই বলিল—"ওই তো কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া।"

—"কাঞ্চনজঙ্ঘা ? এখান থেকে দেখা যায় ?"

হ্যাঁ, যায়। সিপাইজী এই পথে আরও কয়েকবার নাকি যাতায়াত করিয়াছে, কাজেই সে জানে। পরের ষ্টেশনে খোঁজ লইয়া জানিলাম যে, সিপাহী ঠিকই বলিয়াছে, আমাদিগকে গ্রাম্য পাইয়া হাইকোর্ট দেখায় নাই।

কিন্তু এর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন ? যেভাবে জ্বলিতেছে, তাতে সোনার রং তো মোটেই নাই। বরং এর এই রজতকান্তি দেখিয়া এর নামকরণ হওয়া উচিত ছিল—রজতজঙ্ঘা।

আবার ভাবিয়া সংশোধন করিলাম যে, ভোরের প্রথম আলো যখন এর বরফের চূড়া স্পর্শ করে, তখন নিশ্চয় এর সারাদেহ সোনায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠে। সেসময়ে এর কনককান্তি দেখিয়াই বোধ হয় এর নামকরণ হইয়া থাকিবে—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বেশ, তাহাই নয় মানিয়া নিলাম। কিন্তু জঙ্ঘা কেন ? এতো জঙ্ঘা নয়, এযে শিখরচূড়া যেমন বলা হয় গৌরীশৃঙ্গ, তেমনি হওয়া উচিত ছিল—কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-শিখর। আজও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, কি কারণে

শিখর-চূড়াকে জঙ্ঘা নাম দেওয়া হইল। এই যদি জঙ্ঘা হয়, তবে বাকী উর্দ্ধাংশটি কোথায়? থাকগে, খামোকা মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। যত ভুল নামকরণই হউক না কেন, নামটা কিন্তু শ্রুতিমধুর এবং একটি কমনীয় কাঠিন্যও ইহাতে রহিয়াছে—কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

শরৎবাবু কানের ধারে সারা পথটা শিশুর মত কেবল অনর্গল কথা কহিয়া গিয়াছেন। আমার তরফ হইতে উত্তর না পাইলেও তাঁর কাকলীর স্রোত সমানই অব্যাহত ছিল। আমি মুগ্ধ দুই চোখ পাতিয়া রাখিয়াছিলাম,—বাহিরে ঐ হিমালয় সারি সারি শিখর লইয়া আকাশে গা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরেও মনের একটা আকাশ আছে, সেখানে অনন্ত গিরিশ্রেণী লইয়া আর এক হিমালয় স্বপ্ন-দেহে দাঁড়াইয়া ছিল। আমার মনের সমস্ত মনোযোগ তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, শরৎবাবুর কথায় কান বা মন কোনটাই আমি দিতে পারি নাই।—

রাজাভাতখাওয়া ষ্টেশনে যখন নামিলাম, রৌদ্র তখন রীতিমত তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে আমাদিগকে ছোট গাড়ীতে যাইতে হইবে। এ গাড়ী বক্‌সা হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া জয়ন্তিয়া ষ্টেশনে গিয়া থামিবে। জয়ন্তিয়া বোধ হয় বক্সার পরের ষ্টেশন, মাঝখানে ঘন অরণ্যে আর কোন ষ্টেশন আছে বলিয়া আমি শুনি নাই।

হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া ঘন অরণ্য হিমালয়ের মতই একটানা অবিচ্ছেদে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তারিত হইয়া আছে। এ অরণ্য যেমন দুর্ভেদ্য, তেমনি ভয়ঙ্কর, প্রস্থে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল, আর দৈর্ঘ্যে হিমালয়েরই প্রায় সমান। এ অরণ্যসম্পদের পরিমাপ করা সত্যই কষ্টকর, অফুরন্ত বলিলেও চলে। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এ দিককার 'ফরেষ্টে'ও ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ, মৃগ হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় শ্রেণীর পশুদেরই বসতি রহিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী মনুষ্য-সমাজ ও বসতির উপর তাহাদের উৎপাতও কিছু কম নহে।

ষ্টেশনের নামটায় আমাদের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল—রাজাভাতখাওয়া ! কোন রাজার ভাত খাওয়ার সঙ্গে ইহার যোগ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নামের মধ্যেই ষ্টেশনটির পরিচয় নিহিত আছে। রাজা হীরা-মুক্তা-সোনা-দানা না খাইয়া আমাদের মত সামান্য মনুষ্যেরা যে ভাত খাইয়া থাকে, সেই ভাতই ভক্ষণ করিয়াছেন, এই অসামান্য কীর্তিকেই বোধ হয় এই নামকরণে স্থায়িত্ব দিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে! এইটুকু পর্যন্ত চোখ বুজিয়াই অনুমান করিয়া লইলাম।

আমার এ অনুমান কিম্বদন্তী দ্বারাও সমর্থিত হইল। স্থানীয় একজনের নিকট ইতিহাসের তথ্য পাইয়া গেলাম। পুরাকালে—সেকালের সনটা বক্তাও বলিতে পারেন নাই, কুচবিহারের কোন রাজার সঙ্গে ভূটানের রাজার লড়াই লাগিয়াছিল। রাজায় রাজায় লড়াই লাগিয়াই থাকে, মান্ধাতার আমল হইতে রাজা মাত্রেই এই নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং কোচবংশের সহিত ভোট বংশের লড়াই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। কুচবিহারের রাজা ভূটানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অর্থাৎ আচ্ছা শিক্ষা দিয়া ফিরিবার পথে পাহাড় হইতে নামিয়া সসৈন্যে এখানে ছাউনী ফেলিয়া তবে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের মাটীতে পা দিয়া কেবল ভাত খাইয়াই তিনি প্রথম বিজয়োৎসব সম্পন্ন করেন, এ খবর শুনিয়া আমার মন ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইল। এতদিনে একজন খাঁটি বাঙালীর পরিচয় পাইলাম, যিনি ভেতো নামটাকে গর্বের ও বিজয়ের জিনিস মনে করিতে ভয় পান নাই বা দ্বিধা করেন নাই। ভাতকে যিনি এত বড় সম্মান দিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত বাঙালী জাতিরই নমস্য, এক কথায় তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

তাঁর আত্মত্যাগও তুচ্ছ করিবার মত নহে। শুধু মোগল-পাঠান আমলেই নহে, এ আমলেও বড় বড় লোকেরা নিজের নামটা গ্রামের বা নগরের কপালে লটকাইয়া দিয়া থাকেন—যেমন লেনিনগ্রাদ,

ষ্টালিনগ্রাদ ইত্যাদি। এই খাঁটি বাঙালী তাহা না করিয়া বাঙালীর প্রাণধারণের একমাত্র আহার যে ভাত খাওয়া, তার পূর্বে শুধু রাজা শব্দটি যোজনা করিয়াছেন। অশোকের শিলালিপির শিক্ষা ও অনুশাসনই শুধু উত্তরকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু রাজাভাতখাওয়ার মধ্যে যে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা বাঙালী আমরা তাকাইয়াও দেখি না। রাজাভাতখাওয়া মানে—বাঙালী যেদিন ভাত খাইতে পাইত, সেদিন সে সত্যই রাজা ছিল। ভাতের অভাবে বাঙালীর কি ছিরি ও দুর্দশা হইয়াছে, তাহা আর কহতব্য নহে।

তত্ত্বদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া যখন খোলা দৃষ্টিতে রাজাভাতখাওয়ার দিকে তাকাইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে, ষ্টেশনটি কাঠের গুদাম হইয়া রহিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে, কয়েক ষ্টেশন আগে আলিপুর-ডুয়ার্সেও সারি সারি কাঠের স্তূপ ছোট ছোট পাহাড়ের মত মজুত রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। এযে চোরাই মাল এতে আর সন্দেহ রহিল না। নিকটের ঐ অরণ্য হইতে এ সব সংগৃহীত হইয়াছে। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ চৌর্যের তেমন কোন প্রতিবাদ করেন নাই বলাই বাহুল্য। সমুদ্র হইতে কয়েক কলস জল লইলেই রত্নাকরের সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হয় মনে করিলে ভুল হইবে। বনলক্ষ্মীর ঐশ্বর্যের খুদকুড়োও মানুষ এতাবৎ অপহরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বক্সা ষ্টেশনে যখন অবতীর্ণ হইলাম, তখন বেলা প্রায় গোটা দশেক। মহাসমুদ্রের মাঝখানে ছোট একটুখানি দ্বীপ যেমন, মহা অরণ্যের মাঝখানে এই ষ্টেশনটিও তেমনি।

আমরা সিউড়ী জেলের নয়জন ছাড়া আরও পাঁচজন রাজবন্দী ট্রেন হইতে পুলিশের জিম্মায় অবতীর্ণ হইলেন দেখা গেল। ইঁহারা বগুড়া ও রংপুর জেল হইতে চালান হইয়া আসিয়াছেন। সর্বসাকুল্যে সংখ্যাটা এখন দাঁড়াইল চতুর্দশ।

শরীরের ভাবগতিক ভালো দেখিলাম না। সিউড়ী হইতে কয়েকশত মাইল কলিকাতা, তারপর সেখান হইতে দীর্ঘপথ, অবশ্য গাড়ীতেই চড়িয়া আসিয়াছি,

নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া আসিতে হয় নাই—তবু দেখিলাম শরীরটা অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ওয়েটিংরুম বলিতে যে ছোট্ট খোপটা আছে, তাতে আশ্রয় লইতে দল হইতে সরিয়া নিঃশব্দে আগাইয়া গেলাম।

দুয়ারেই বাধা পাইলাম, অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়া। প্রবেশমুখেই মানুষের অপকর্ম মজুত রহিয়াছে। মূত্র নাই বটে, কিন্তু দাগ স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। আর মল মেঝেতে লেপটাইয়া একাকার। ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছিলাম, গন্ধে ও দৃশ্যে পেটে মোচড় দিয়া উঠিল, বমির ইচ্ছা জাগিয়াছে বুঝিলাম। আর ফিরিতে পারিলাম না। পেটের মোচড়ে মোহমুদ্গরের কাজ দিল। অর্থাৎ মোহ বিদূরিত হইয়া জ্ঞাননেত্রই খুলিয়া গেল। আমার নিজের কোষ্ঠেই মল রহিয়াছে; তাই বলিয়া অপবিত্র ভাবিয়া ঘৃণায় নিজের শরীরটাকে তো ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াই না। এখন বাহিরে ও বস্তু দেখিয়া পিছাইলে চলিবে কেন?

বীরের মত আগাইয়া গেলাম। একটা হাতলভাঙ্গা আরামকেদারা ছিল, সেটাকে কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া জানালার ধারে লইয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মিথ্যা বলিব না, একটা চেয়ারও ঘরে ছিল, তার পিছনের ঠ্যাং দুটো পিছনে হেলিয়া ছিল। ভাবে মনে হয় যে, সঙ্গীয় আরামকেদারাটার কাৎ হইবার ভঙ্গীটুকু অনুকরণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। একটা চুরুট ধরাইয়া লইলাম। সেকালে লোকেরা বাণ দিয়া বাণ কাটিত, আমি গন্ধ দিয়া গন্ধ ঠেকাইতে লাগিলাম। তবু চুরুটের কড়া গন্ধের পর্দা ফাঁক করিয়া মাঝে মাঝে শত্রুটি অর্থাৎ অবাঞ্ছিত গন্ধটা উঁকি দিতে ছাড়িল না।

বক্সা ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িয়াছিল যে, একদল ভুটিয়া কুলী মাল নিবার জন্য উপস্থিত রয়িাছে, ফোর্টের কম্যাণ্ডাণ্ট পাঠাইয়াছেন। গাড়ী আসিতেই উহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। অবাক হইয়া আমরা সকলেই দুই চোখে চাহিয়া ছিলাম, মিনিট খানেকের মধ্যে পার্থক্যটা মালুম করিতে পারি নাই, পরে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া গেল।

—"ব্যাকরণের জ্ঞান যে লোপ করে দিল দেখছি।" আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শিক্ষিত সেই সন্তোষ গাঙ্গুলীরই গলা।

জিজ্ঞাস্থ মুখে চাইতেই তিনি জবাব দিয়াছিলেন—

—"ভেদ বুঝতে পারেন, কে পুরুষ আর কে মেয়ে মানুষ ?"

আমার ঠোঁট একটু ফাঁক হইয়া গেল, না হাসিয়া পারি নাই।

সন্তোষবাবু কহিলেন,—"দেখছেন না, বুক বলে কোন আপদ-বালাই নেই, সব সমান।"

দেখিয়াছিলাম বই কি! দেখিয়াই তো এতক্ষণ হাঁ করিয়াছিলাম। দেখা যখন আরও অভ্যাস হইয়াছিল, তখন আর থ' থাইতাম না। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, পাহাড়ী দেশের মেয়েদের দেহে প্রায় ক্ষেত্রেই এ ত্রুটি থাকে। উত্তমাঙ্গের দিকে যে-কোন কারণেই হউক ইহারা বিধাতার মার খাইয়াছে। কিন্তু অধমাঙ্গের দিকে এ ত্রুটি ভগবান বড় বেশী করিয়াই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। উরুর যে আভাস পাইলাম, তাতে দমিয়া গেলাম। দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়া ভীম বাহাদুর হইয়াছেন। তিনি যে কত বড় বীর এবং তাঁর গদার জোর যে কত, পাইলে একবার এখন পরীক্ষা করা যাইত।

এই সময়ে কেষ্টবাবুর গলা শুনিয়াছিলাম—"জয়মা মহিষমর্দিনী!"

ফিরিয়া দেখিলাম, সত্যই তিনি কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। প্রণম্যটিকে দেখিয়া আমারও মন জয়ধ্বনি না করিয়া পারে নাই —মহিষমর্দিনীই বটে! প্রায় আড়াই মণ তিন মণ ওজনের মাল কাঁধে লইয়া মহিষমর্দিনী দাঁড়াইয়াছে এবং ছ-সাত মাইল পাহাড়ী পথ পার হইয়া এ মাল পাহাড়ের মাথায় বক্সা দুর্গে পৌছাইয়া দিয়া তবে ভারমুক্ত হইবে। অধমাঙ্গের শক্তি ও পুষ্টি কি স্তরের হইলে ইহা সম্ভব হয়, তাহা আপনাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। বৃটিশ ললনাদেরও পাদ ও নিতম্বগর্ব এই ভুটিয়া মহিষমর্দিনীরা মর্দিত করিয়া ছাড়িয়াছে। এই জয়ের গর্বে আমরাও গর্বিত বোধ করিলাম।

গন্ধর্বপুরীতে মানে সেই ওয়েটিংরুমে খোলা দরজার পথে চোখ মেলিয়া দিয়া বসিয়াছিলাম। চোখ খোলা থাকিলে না দেখিয়া উপায় নাই, তাই অনেক কিছুই দেখিতে হইল। দেখিবার যে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তাও নয়। রক্তমাংসের মানুষের দোষগুণ যা থাকিবার কথা, তা আমারও ছিল। সর্বোপরি ছিল গভীর বনের পটভূমিকা, ঐ আবেষ্টনে মনে ধীরে ধীরে মোহ বিছাইয়া দিতেছিল। ফলে মনের মার্জিত সংযত সভ্য দিকটা ঝিমাইয়া পড়িল, অথবা মনের গাত্র হইতে এতদিনের জানাশোনার আচ্ছাদনটা স্খলিত হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া আসিল বনের আদিমতম অধিবাসীর বন্য নগ্ন রূপটি। বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে অরণ্যজীবন পার হইয়া আসিয়াছি, সেই অতীত কোথা হইতে উত্থিত হইয়া আমার বর্তমানকে গ্রাস করিয়া লইল, আমি মনে মনে এই গভীর অরণ্যানীরই অংশীভূত হইয়া গেলাম।

সম্মুখে ছোট্ট প্লাটফর্মে মালপত্র নামানো ও কর্মব্যস্ততা চলিয়াছে। ভূটিয়া ললনারা কাজ করিতেছে, কথা বলিতেছে, হাসিতেছে—প্রাণচাঞ্চল্যের কোন অভাবই দেখিলাম না, বরং যেন একটু বেশিই দেখিলাম। লজ্জা-সংকোচ বলিয়া ব্যাপারটা যে এদের তেমন জানা আছে বলিয়া তো মনে হইল না। কিংবা জানা থাকিলেও অপ্রয়োজনীয় বোধে বহু আগেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সিপাইরা পুরুষ মানুষ, তায় ক্ষত্রিয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, এদের উপর তাদেরই স্বাভাবিক অধিকার থাকার কথা। ক্ষত্রিয়রা শুধু ত্রাণই করিয়াছে তা নয়, সসাগরা বসুন্ধরা ভোগও তারাই করিয়াছে। কাজেই পৌরুষ তাদের চঞ্চল হইয়া উঠিতে ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ বাধ্য এবং হইয়াও যে উঠিয়াছে, টের পাইলাম। সিপাইদের মধ্যে কারো কারো ভাবভঙ্গী ঠিক রুচিসংগত হইতেছিল বলা চলে না। ভূটিয়া মেয়েরাও হাবভাবে এই পৌরুষে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিতেছিলনা। এ-খেলার ছলা-কলা কৌশল সবকয়টি ইহারাও বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে দেখিলাম।

আরও খানিকটা দেখিলাম। এই দেখাটির জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

স্টেশন হইতে হাত ত্রিশেক দূরে স্টেশন মাস্টারের ঘর। মোটা খুঁটির উপর হাত দশেক উঁচু মঞ্চ, তদুপরি ঘরখানা দাঁড়াইয়া আছে, অতিশয় দৃঢ় ও সুরক্ষিত। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী আসিয়া বড় জোর তর্জন-গর্জন করিয়া যাইতে পারে, গা দিয়া শুড় দিয়া ঠেলিয়া খুঁটির জোর পরীক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গৃহের বা গৃহবাসীর কোন ক্ষতিই করিতে সক্ষম হইবে না—এমন করিয়াই এই ঘনজঙ্গলের মধ্যে গৃহটি তৈরী করা হইয়াছে।

মাটি ও ঘরের মঞ্চের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান, একটা আস্ত হাতী গিয়াও দাঁড়াইতে পারে। দরজার দিক হইতে দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া জানালার পথে উক্ত গৃহটির অভিমুখে প্রেরণ করিলাম। দৃষ্টি সেখানে পৌছিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। একজোড়া ভূটিয়া ছেলে ও মেয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া প্রেমিকযুগল নিশ্চয় বহুক্ষণ পূর্বেই স্টেশনে ফিরিয়াছে। চোখ বুজিয়া হাতলভাঙ্গা ডেকচেয়ারটায় পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ পার হইয়াছে, খেয়াল ছিল না। এই অবস্থায় মনে একটি ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যার জন্য মোটেই প্রস্তুত ত ছিলাম না বটেই, কিন্তু এমন যে ঘটিতে পারে তাহাই আমার স্বপ্নেরও অভিজ্ঞতায় ছিল না। কয়েকটা সেকেণ্ড, বড় জোর একটি মিনিট সময় লাগিয়াছিল এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে।

চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ সচেতন হইলাম যে, আমার মনে আসন্ন কিছুর ছায়া পড়িয়াছে। মন ধীরে ধীরে কোথায় গভীরে যেন নামিয়া যাইতেছে, এও টের পাইলাম। পরক্ষণেই টের পাইলাম যে, পরিচিত জগতের সঙ্গে আমার এতদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল! ঠিক ছিন্ন হওয়া নয়, পরিচিত জগৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হইল। অথচ, বুদ্ধি আমার তখনও পূর্ণ জাগ্রত।

আমার সম্মুখে যাহা আসিল, তাহা হঠাৎ আসিল বলিয়াই আমার চেতনায় ধাক্কা লাগিয়াছিল। আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি এমন একটি লোকে আসিয়াছি, যে-লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতাবৎ আমার কোন ধারণা ছিল না।

এই লোকটি আমাদের জগতের মধ্যেই অবস্থিত, অথচ জগৎ তাকে এমন আড়াল করিয়া রাখিয়াছে যে, এর অস্তিত্বের খবরই আমরা জানি না। হঠাৎ কি কারণে মন এই লোকে পা দিয়া বসিল, আমি জানি না। হয়তো দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন একটি ক্ষণের জন্য অপসারিত হইয়া থাকিবে। ঐ একটি ক্ষণের বিদ্যুতালোকেই এই অজ্ঞাত লোকটি আমার চোখে উদ্ভাসিত হইল। ইহাকে কি নামে বুঝাইব, বুঝিতেছি না। কে জানে, হয়তো ইহাই—কামলোক।

একটি ক্ষণ, কিন্তু তাতেই আমার দেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। আমাদের জগতের দেশকালের কোন সীমা সেখানে নাই। প্রাণের অন্তরালে অন্তহীন কাম-জগৎ অবস্থিত, যেখান হইতে সামান্য বুদ্বুদের মত কিছু উপরে ভাসিয়া উঠিলেই আমাদের প্রাণ-জগতে সমস্ত কামকেন্দ্রগুলিতে অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইতে থাকে। এখানকার সামান্য নিঃশ্বাসেই আমাদের এই উপরের জগতে প্রবৃত্তির ঝড় দেখা দেয়। এ-লোকের বর্ণনা চলে না, শুধু দেখা চলে। কিন্তু মনের সে-চোখ হঠাৎ না খুলিলে দেখার পথ কেহই বলিয়া দিতে পারিবে না।

তেমনি হঠাৎ চোখ আবার ক্ষণপরেই বন্ধ হইয়া গেল, নিজের পরিচিত জগতে মন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে লাগিল। যাহা দেখিলাম, তাহার স্মৃতিতে মন আমার তখনও আচ্ছন্ন-আবিষ্ট হইয়া আছে। চোখ খুলিলাম, কিন্তু চোখে তখনও মায়া লাগিয়াছিল, সমস্ত বনভূমি আমার নিকট কাম-ভূমি বলিয়া প্রতিভাসিত হইল।

চোখ খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিলাম। ছবির পর ছবি আসিতে ও যাইতে লাগিল। ইচ্ছা করিয়া

কল্পনা করিয়া দেখিতেছিলাম, তাহা নয়। আবার জোর করিয়া তাড়াইতেও ছিলাম না। আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছবির পর ছবি দেখানো চলিতেছিল—শুধু এই জ্ঞানটুকু আমার ছিল যে, যেখান হইতে মন ফিরিয়া আসিয়াছে, তারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে এইভাবে।

ছবিগুলি যা সেদিন দেখিয়াছিলাম, তা একই গোত্রের।

গভীর বনে, যেখানে কোনদিন সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানে অন্ধকার গর্ত হইতে দলে দলে সাপ-সাপিনী বাহির হইয়া আসিল। একে অপরকে জড়াইয়া লইয়া মদাতুর হইয়াছে, ছোবলে ছোবলে পরস্পরের মুখ হইতে বিষের ফেনা উদ্গারিত হইতেছে এবং ঘন নিঃশ্বাসে উগ্র পিপাসায় সে ফেনপুঞ্জই আবার তাহারা পান করিয়া চলিয়াছে। দূর বনে বাঘিনী বাঘকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, নখর-দন্ত-ঘর্ষণে ও লেহনে আশে-পাশের গাছপালা ও মাটিতে পর্যন্ত রতি-রোমাঞ্চ জাগিয়াছে, বাঘের কাম-অগ্নি নিশ্বাসে ফুৎকারে জ্বালাইয়া লইয়া বাঘিনী অগ্নিস্নানে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাণ্ড মোটা গাছে গা ঠেকাইয়া হস্তিনীরা ঊর্দ্ধে শুঁড় তুলিয়া চীৎকার করিতেছে, দলে দলে দৈত্যের মত হাতীরা ছুটিয়া আসিল, তারপর মদস্রাবে সমস্ত বনটাই যেন ভিজিয়া সিক্ত হইল, পদতলে পৃথিবী এ দুর্দান্ত কামক্রীড়ার অসহ্য ভারে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছিল, কক্ষ পথ হইতে সরিয়া ছিটকাইয়া পড়িবার ভয়ে তার সর্বাঙ্গে থরথর কম্পন উঠিয়াছে। উপরে গাছের ডালে ডালে পাখীর বাসায় মদকূজন জাগিয়াছে, বিহগীদের ডানার আড়ালে ঢাকিয়া লইয়া পাখীরা তীক্ষ্ণ চঞ্চুঘায়ে কামক্ষত রচনা করিতেছিল, গাছগুলি উপরে একপায়ে দাঁড়াইয়া মাটির অন্ধকার অভ্যন্তরে শিকড়ে শিকড়ে জড়াইয়া রস-উদ্গার ও লেহন করিতেছিল। বনের যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই এই ছবি, সমস্ত বনভূমি আজ কামভূমি হইয়াছে।

কোন বিরাট শক্তিমানের এ কামরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও তা আমি বুঝিতে পারি নাই।

প্লাটফর্ম হইতে মোটা গলার ডাক আসিল—"অমলবাবু" ও অমলবাবু! কাণ্ড দেখ, ঘুমিয়ে পড়েছে—"

ঘুমাইয়া পড়ি নাই, জাগিয়াই ছিলাম, কারণ চোখ বুজিয়াও জাগা চলে। চোখ মেলিলাম।

শরৎবাবু ওয়েটিংরুমের দুয়ারের সামনে আসিয়া পৌছিলেন। ভিতরে ঢুকিতে গিয়া খেপিয়া গেলেন। উদ্যত পা পিছনে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"হুঁ, কিসের মধ্যে বসে আছেন? বাইরে আসুন!"

বলিয়া থুঃ শব্দে খানিকটা নিষ্ঠীবন মুখ ঘুরাইয়া অন্য দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং নাসিকায় হাতের পাতা চাপা দিয়া দুর্গন্ধটাকে ঠেকাইয়া রাখিলেন।

বাহিরে যাইতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মনের উপর হইতে মোহের আবেশ তখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই।

কহিলাম—"ভেতরে আসুন, চেয়ার আছে।"

—"থাক, চেয়ারের দরকার নেই। আপনি বাইরে আসুন।"

উঠিবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়াই প্রশ্ন করিলাম—"কেন?"

—"কথা আছে। গতিক বড় খারাপ।"

তবু উঠিলাম না। গতিক আর কি এমন খারাপ হইবে। টিকিয়া আছি, এই যথেষ্ট। তা'ছাড়া স্টেশনে আসিলেই একটা নটঘট নির্ঘাৎ বাধিবে, এমন যাত্রাই তো করিয়া বাহির হইয়াছি। অর্থাৎ আমার চোখেমুখে বোধ হয় এইরূপ একটা দার্শনিক ঔদাসীন্য ফুটিয়া থাকিবে। তাই শরৎ-বাবুকে বাধ্য হইয়াই ভিতরে আসিতে হইল। কারণ, কথা আছে এবং গতিক নাকি বড়ই খারাপ।

প্রবেশ পথে বাধা ছিল। তাই বিপজ্জনক স্থানটুকু এক লম্ফে ডিঙ্গাইয়া শরৎবাবু তার মোটা শরীরটাকে ধপাস করে আমার কাছাকাছি এপারে

আনিয়া ফেলিলেন। একটা হেঁচকা টানে চেয়ারটাকে কাছে আগাইয়া লইলেন, মেঝেতে ঘর্ষণে ও আকর্ষণে নিরীহ চেয়ারটা আর্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। শরৎবাবু সেটার উপর চাপিয়া বসিলেন, নড়াদাঁতের মত বেসামাল হইয়া চেয়ারটা কোন মতে খাড়া রহিল।

কিন্তু কতক্ষণ এই বোঝা কাঁধে লইয়া এ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে, নড়বড়ে পদচতুষ্টয়ের দিকে তাকাইয়া তাহা অনুমানের চেষ্টা করিলাম। যাহা মনে মনে চাহিতেছি, বরাত জোরে ঠিক তাহাই যদি ঘটে, অর্থাৎ পায়া যদি কাৎ হয়, তখনও কি যাহা চাহিব, ঠিক তাহাই ঘটিবে? অর্থাৎ ঘটোৎকচের মত আমার উপর চাপিয়া না পড়িয়া তিনি কি দয়া করিয়া পিছনের ঐ বিপজ্জনক স্থানেই গিয়া ভূমিশয্যা লইবেন? না, এতটা সৌভাগ্য আমার হইবে বলিয়া আমি আশা করিতে পারি না।

শরৎবাবু ঠিক হইয়া বসিলে পর প্রশ্ন করিলাম—"গতিক খারাপের কথা কি বলছিলেন?"

উত্তরের ধারকাছ দিয়াও তিনি গেলেন না, উল্টা আমাকেই প্রশ্ন করিলেন—"জিজ্ঞেস করি, আজ রাতটা স্টেশনে থাকবেন, না যাবেন?"

—"মানে?"

—"মানে সোজা, এই ছ'সাত মাইল চড়াই-উৎরাই করে ফোর্টে যেতে পারেন যদি তবে চলুন। নইলে স্টেশনেই থাকবার বন্দোবস্ত করুন।"

ভয় পাইয়া গেলাম, উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"হেঁটে যেতে হবে?"

উত্তর হইল—"কিসে যেতে চান, আমার কাঁধে চড়ে?'

অবশ্য তাঁর কাঁধে চড়িয়া যাওয়ার কথা উঠে না, শরৎবাবু নিজে রাজী হইলেও তাঁর কাঁধে চড়িয়া যাইতে রাজী হওয়া বা না হওয়া আমার ইচ্ছা। যে মেজাজের লোক, কাঁধ হইতে পাঁচশত হাত গভীর খাদের মধ্যে নামাইয়া দিয়া তিনি ভারমুক্ত হইবেন এমন সুযোগ তাঁকে দেই আর কি? বলিলেই হইল!

তাই কাঁধে চড়ার প্রস্তাবটায় কান না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হেঁ'টে যেতে হবে কেন? শুনেছিলাম যে, ঘোড়া ডাণ্ডী এসবের বন্দোবস্ত থাকে?"

—"তা থাকে," বলিয়া শরৎবাবু তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

শরৎবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ঘোড়া আসিয়াছে মাত্র ছয়টি, ডাণ্ডী আসে নাই একখানাও, এদিকে লোক আনিয়া নামানো হইয়াছে চৌদ্দ জন। আমরা সিউড়ির নবরত্ন, আর বগুড়া ও রংপুর হইতে পাঁচজন—সংখ্যাটা চৌদ্দই হয়।

শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধি যার বল তার। আর বুদ্ধিটা যার যার নিজ মাথার মধ্যেই রহিয়াছে। বুদ্ধির শরণ নিলাম এবং পরামর্শও পাইয়া গেলাম।

কহিলাম—"এতে এত ভাববার কি আছে?"

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতেও আপনি ভাবতে নিষেধ করছেন? বেশ, কখন আপনি ভাবতে বলেন?"

হাসি চাপিয়া কহিলাম—"সময় হ'লেই বুঝতে পারবেন, ভাবতে বলার পরামর্শের দরকার হবে না।"

—"কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছে আমার নেই, বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। এখন আপনি কি করতে বলেন শুনি?"

শুনিতে যখন চাহিতেছেন, শুনাইয়া দিলাম। বলিলাম—"ছয়টা ঘোড়া আছে, ছ'জন চলে যাক। তারা গিয়ে বাকী আটজনের মত ঘোড়া ডাণ্ডী পাঠিয়ে দিতে বলুক।"

—"এইতো? না, আরও কিছু পরামর্শ আছে?"

ঘাবড়াইয়া গেলাম, কহিলাম—"না, আপাততঃ এর বেশি অন্য কোন পরামর্শ আমার নেই।"

—"বেশ তবে শুনুন এবার। ছজন যেতেও পারে, গিয়ে ওকথা বলতেও পারে। কিন্তু ঘোড়া ডাণ্ডী আজ আর আসবে না। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।"

এত সহজে মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কহিলাম—"কেন কাটাতে হবে? ঘোড়া ডাণ্ডী আসবার বাধাটা কি?"

শরৎবাবুও হটিবার পাত্র ছিলেন না, মুখের উপর জবাব দিলেন—"কেন আসবে শুনি? জীবনের মায়া নেই?"

জবাব নয়, যেন চপেটাঘাত। একেবারে বোবা হইয়া গেলাম। জীবনের মায়া আছে কিঁ নাই, এ কি একটা জিজ্ঞাসা করার মত প্রশ্ন হইল! আমাদের জীবনে থাকার মধ্যে তো একমাত্র জীবনের মায়াটাই আছে। এ কে না জানে! নম্র হইয়া পড়িলাম। তখন শরৎবাবুর কাছে আরও খানিকটা তথ্য পাইয়া গেলাম।

ফোর্টে গিয়া এই দল যখন পৌছিবে, তখন আর ঘোড়া বা ডাণ্ডী পাঠাইবার সময় থাকিবে না। শীতকাল, একটু আগেই দিন শেষ হয়, সূর্যাস্তের বহু পূর্বেই এ প্রদেশে অন্ধকার নামে। দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই এই বনের ও পাহাড়ের পথে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। জানোয়ারের হাতে প্রাণ হারাইতে যাদের আপত্তি নাই, তারা তখন এ পথে চলিলেও চলিতে পারে। সে রকম লোক খুব বেশি আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। থাকিলেও ঘোড়ার সহিস বা ডাণ্ডীবাহকদের মধ্যে যে নাই, তা না দেখিয়াই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

তাছাড়া, ধরিয়াই নয় নিলাম যে, ঘোড়া ও ডাণ্ডী সন্ধ্যার কাছাকাছি স্টেশনে কোনরকমে সত্যই আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু তখন যাইবে কে? আমরা? কেন, বিপ্লবী স্বদেশী হইয়াছি বলিয়া কি এমনই অপরাধ করিয়াছি যে, আমাদের জীবনের মায়া থাকিতে নাই?

সমস্যাই শেষে দেখা দিল। শরীর ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম। এখন এই লম্বা পথটা নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া চড়াই-উৎরাই করিয়া পাহাড়ের মাথায় ফোর্টে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, ছবিটা একটুও আরামপ্রদ

বোধ হইল না। কাঁদিলে যদি উপায় থাকিত, তবে কাঁদিতেও রাজী ছিলাম। এমনই মনের অবস্থা।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর সকলে কি বলেন ?

—"কিছু বলেন না, শুধু ভাবছেন। একমাত্র সেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঘোড়া বা ডাণ্ডী না হলে পায়ে হেঁটে যাবেন না।"

সেই তিনি মানে যিনি সিউড়ী স্টেশনে 'সেকেণ্ড কেলাশ ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি' ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের জন্য ভাবিত হইলাম না, কারণ দরকার হইলেই তিনি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইবেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের উপর আমার ভরসা ছিল। তবু মনে মনে চটিয়া গেলাম। মুখের কথা বলিয়াই ইঁহারা মুক্ত হন, কথাটার যে কোন দাম থাকিতে পারে, এ তাঁরা যেন গ্রাহ্যই করিতে চান না।

শরৎবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বলে তো এলেন যে, যাবেন না। করবেন কি শুনি ?"

শরৎবাবু নির্বিকার উত্তর দিলেন,—"না গেলে এখানেই থাকতে হবে।"

—"এখানে ? এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় থাকবেন শুনি ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শরৎবাবু খোলা দরজার পথে দৃষ্টিটাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবার মত জায়গা খুঁজিতে লাগিলেন।

কহিলাম,—"স্টেশন মাস্টারটাও বোধ হয় ফিরতি ট্রেনে আলিপুর ডুয়ার্সে গিয়ে রাত কাটায়। এখানে রাত্রে জনমানব থাকে আপনি মনে করেন ?"

শরৎবাবু মাথা নাড়িলেন, অর্থাৎ তিনি তাহা মনে করেন না। শরৎবাবু কি মনে করেন, তাহা মনে করিবার ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দিলাম। নিজে কি মনে করি, এই প্রশ্নটা এতক্ষণে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

মন সজাগ হইয়া উঠিল। না, এখানে থাকা চলিতেই পারে না। যে-ভাবেই হউক, ফোর্টে গিয়া পৌছিতেই হইবে। শরীর ক্লান্ত বোধ করিতেছি, তা সত্য। কিন্তু প্রাণ যে তার চেয়েও বেশী সত্য। ঘোড়া ডাণ্ডী

না জোটে পায়ে হাঁটিয়াই এ পথটা মারিয়া দিতে হইবে—মনের হুকুম ও সম্মতি দুই-ই পাইয়া গেলাম।

আঠারো বছর আগের ব্যাপার, রক্তে তখনও বেগ ছিল, মনে তখনও স্থবিরত্ব আসে নাই। যাইতে হইবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ামাত্র মন নোঙ্গর তুলিয়া ফেলিল। শরীরে সায় পাইলাম, পথের জন্য পায়ের পেশী প্রস্তুত হইল এবং রক্তের পালে উৎসাহের বায়ু জোর ফুঁ দিল। চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কহিলাম,—"বাইরে চলুন।"

শরৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহির হইবার জন্য চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলিয়া দিলেন, চেয়ারটা আর্ত চীৎকার তুলিল—যেন বলিতে চায় যে, এ কেমন ব্যবহার, এতক্ষণ উপবেশনের পরে এই কি বিদায়?

তিনি বিপজ্জনক স্থানটুকু পূর্ববৎ লম্ফ প্রদানে পার হইয়া গেলেন। আমিও মহাজনেরই যেন গত স পন্থায় বাহির হইয়া আসিলাম।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হেঁটে যেতে পারবেন তো?"

শরৎবাবু শুধু হাস্য করিলেন। ভাবখানা এই যে, এমন অপমানজনক প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। শরৎবাবু পালোয়ান লোক, বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বয়স তখনও পঁচিশের অনেক নীচে, সবই আমি জানিতাম। কিন্তু শরীরের ওজনও তো কম নহে। সম্বলের মধ্যে তো ঐ আমারই মত দুইখানা ঠ্যাং, চতুষ্পদ হইলে নয় কোন কথা ছিল না। তা ছাড়া, আমি শুনিয়াছিলাম যে, যত উপরে উঠা যায়, ততই নাকি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তাই শরৎবাবুকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন কিনা। তাঁর হাস্যে নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রসর হইলাম।

প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইতেই দারোগার মুখোমুখি পড়িয়া গেলাম, তিনি আমাদের খোঁজেই আসিতেছিলেন। তিনি কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন, বাধা দিয়া কহিলাম,—"এদিকে আসুন," বলিয়া আর একটু দূরে সরিয়া লইলাম।

দূরে সরিবার কারণ ভূটিয়া কুলীরা। ভূটিয়ারাও মানুষ এবং আমাদের মতই মানুষ, এ-কথা অবশ্যই আমি স্বীকার পাইতে বাধ্য আছি। কিন্তু তাই বলিয়া তাদের জামা ও গায়ের গন্ধও নাক ভরিয়া শোষণ করিতে আমি বাধ্য থাকিব, ইহা কোন কাজের কথা নহে।

শুনিতে পাই পাহাড়েও জল পাওয়া বায়। শোনা-কথার প্রয়োজন কি, আমাদের দেশে সমতল ভূমিতে যে-গুলি নদী, তাহারাই তো এদের এখানে প্রথমে ঝরণা হইয়া নামে। মরুভূমির দেশের লোক নয়, তবু ইহারা স্নান করে না কেন? বরফ-গলা জলে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়? বেশ, জামাগুলির তো প্রাণ নাই, ও-গুলিকে মাঝে মাঝে ময়লা ও গন্ধমুক্ত করিতে দোষ কি? প্রত্যেকেই যেন এক একটি ছোটখাটো চলন্ত গন্ধমাদন অথবা গন্ধর্ববিশেষ।

বন্ধুরাও কাছে আসিয়া জমায়েত হইলেন। বেশী কথা বা বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে না যাইয়া আমি সোজা জানাইয়া দিলাম যে, ঘোড়া ডাণ্ডীর অপেক্ষায় এখানে পড়িয়া থাকা চলিবে না, পায়ে হাঁটিয়াই যাইব। আমাদের মধ্যে নৃপেন মৈত্র নামক বহরমপুরের বছর আঠারোর একটি ছেলে ছিল, পথে তার একটু জ্বরভাব হয়। নৃপেনের জন্য একটি ঘোড়া রাখিয়া বাকীগুলি যেন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়, এই অনুরোধ জানাইলাম।

তারপর দারোগাবাবুকে কহিলাম,—"আমরা যাচ্ছি। কয়েকজন কুলী এগিয়ে গেছে, পথ ঠিক চিনতে পারব, আপনারা সব ঠিকঠাক করে পিছনে আসুন।"

বলিয়া স্টেশনের বাহিরে আসিলাম, সঙ্গে সকলেই আসিলেন। আসিয়া দেখি পাঁচটি ঘোড়া আছে, ছ' নম্বরটিকে দেখা যাইতেছে না। খবর লইয়া জানা গেল যে, রংপুর না বগুড়া হইতে আগন্তুক এক ভদ্রলোক তাহাতে চাপিয়া আগাইয়া গেছেন।

লোকটির বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না, গতিক তেমন সুবিধা

নয় দেখিয়া অবস্থা বুঝিয়া নিজের ব্যবস্থা করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। এমন নিঃসঙ্কোচ মূর্তিমান স্বার্থটিকে দেখিবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইল। ঘোড়ার যদি তার সত্যিকার প্রয়োজনই থাকিত, তবে অন্যান্য বন্ধুদের উপর অনায়াসে তিনি নির্ভর করিতে পারিতেন, কেহই তাঁকে ঘোড়া হইতে বঞ্চিত করিত না। ভয় ও স্বার্থ তাঁকে সেটুকু ধৈর্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি দেয় নাই। লোকটির উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণাই জন্মিয়া গেল। পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি কটিবাত ও হাটুবাতের রোগী ছিলেন, ঘোড়া দেখিয়াই তিনি খোঁড়া হন নাই।

কাপড়ের কোঁচা দুই পায়ের মধ্য দিয়া গলাইয়া মল্লকচ্ছ মারিয়া মল্ল সাজিলাম, কাঁধের র‍্যাপারটাকে নামাইয়া কসিয়া কোমরবন্ধ করিলাম এবং পাঞ্জাবীর আস্তিনটা গুটাইয়া কনুই অবধি মুক্ত রাখিলাম। এখন 'হর-হর বম্-বম্' বলিয়া পা চালাইলেই হয়।

শরৎবাবু ও আমি দুই পদাতিক পথে নামিয়া পড়িলাম। আগে এক ঘোড়সোয়ার গিয়াছেন, তাকে অর্থাৎ ছ-নম্বরের অশ্বারোহীকে গিয়া ধরা চাই। গভীর বনের মধ্যেই ছিলাম, কিছুক্ষণেয় মধ্যে গভীরতর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

বনের ও পাহাড়ের পথে দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছি। দুই পাশে গভীর অরণ্য, ঝিঁঝিঁ ও পতঙ্গের একটানা শব্দে বনভূমির নিস্তব্ধতাকে গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। জনমানবের চিহ্ন নাই, বন্যশ্বাপদেরা দূর বনে ও গুহায় রাত্রির অপেক্ষা করিয়া দিনমান আলস্য-বিশ্রামে কাটাইতেছে—পথ চলিতে চলিতে আমার এতদিনের পরিচিত মন বদলাইয়া গেল।

প্রাণের এক বলিষ্ঠ রূপ দেখিলাম নিজের মধ্যে। একদিন এই অরণ্য জগতে বনস্পতি হইয়া একপায়ে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া আকাশের আলোর তপস্যা করিয়াছি, শাখা-পল্লবের করপুট ভরিয়া রৌদ্ররস পান করিয়াছি, আর মাটির গভীরে শত শিকড়ের মুখে ধরণীর রসস্তন্য প্রবল

পিপাসায় পূর্ণবলে আকর্ষণ করিয়াছি। এই অরণ্য-জগতের আমিও একদিন একটি অধিবাসী ছিলাম, আজ তাহা পার হইয়া প্রাণ-প্রবাহের পথে মানুষের ঘাটে আসিয়া আমি থামিয়াছি। বহু বহু যুগের অতীত একই সময়ে আমার চেতনায় রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। আমি যেন না জানিয়াও নিশ্চিত জানিতে পারিলাম যে, আমি আজিকার নয় খণ্ডকালেরও নয়—আমি সৃষ্টির আদিতে ছিলাম, বর্তমানে আছি এবং এই প্রাণের ধারাপথে ভবিষ্যতের শেষ সীমা পার হইয়াও আমার শেষ হইবে না।

আমার প্রাণের এই রূপই আমি সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলাম। বক্সা স্টেশন হইতে পাহাড়ের মাথায় বক্সা দুর্গ পর্যন্ত হাঁটাপথের এই অরণ্যযাত্রাটি আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ঘরে একটি পরম সম্পদ। এই দিনের অনুভূতিটি বক্সা দুর্গে পৌঁছিয়া অবসর মত আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আঠারো বছর পূর্বের সে-লেখার যেটুকু আছে, তাহারই খানিকটা আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

সেদিন নিজেকে যাহা জানিয়াছিলাম, অথবা যে অনুভূতিটি নিজের সম্বন্ধে আমার হইয়াছিল, তাহার অবশ্য আজ আর অপরের কাছে কোন দাম বা মূল্য নাই। তবু একজন বিপ্লবীর মনোভাবের খানিকটা আভাস হয়তো ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে।

সেদিন যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা এই—

"মিনিট পনেরো হয় বক্সা ষ্টেশনে বন্ধুদের পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। নির্জন গভীর বন চারিদিকে, পাশে শরৎবাবু।

হঠাৎ প্রশ্ন জাগিল—কে আমি? কোথায় চলিয়াছি? কোথায় আমার ঘরবাড়ি, বাপ-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-কন্যা, আর আমি কিসের জন্য এই বনের মধ্যে ক্লান্ত দেহে পথ চলিয়াছি? এই দুর্ভোগ আমার কিসের জন্য? কে আমি?

পথ চলিতে চলিতে নিজের ভিতরটায় দৃষ্টি দিলাম। দেখিলাম বুকের মধ্যে এক বিদ্রোহী মৌন হইয়া আছে—তার চোয়াল কঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখে তার ক্ষমাশূন্য দৃষ্টি, সে-দৃষ্টি পাগলের চোখের মত অর্থহীন ও যোগীর চোখের ন্যায়

পলকহীন। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য যাদেরই পায়ে শিকল পরানো হইয়াছে, আমার পায়ে আজ সেই সকলের শিকল-বন্ধনের শব্দ শুনিতেছি। আমি জগতের সমস্ত বিদ্রোহী মানবাত্মার প্রতিনিধি।

বনের মধ্যে তাই আমি সিংহের মত আজ একাকী গহনচারী। আমি যেদিন দিনের আলোকে লোকালয়ে বাহির হইব, সেদিন মানব-সমাজের মুক্তির দিন। ভিতরের বিদ্রোহীর মৌন-ভঙ্গের দিন সেটি।"

আঠারো বছর পরে আজ দেখিতেছি যে, সে-বিদ্রোহীর মৌন-ভঙ্গ তো দূরের কথা, সে-বিদ্রোহীই বুকের কোন প্রত্যন্ত দেশে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। আমাকে দিয়া এ মহা-বিদ্রোহীর স্বপ্ন সার্থক হয় নাই এবং হইবে না, ইহা আমি জানি। আর ইহাও জানি যে, এই বিদ্রোহী একদিন সত্যিকারের বীরের তনুতে তনু গ্রহণ করিবেন। সেদিন প্রলয়ংকর শঙ্কর ও দক্ষিণমুখ শিব সেই বীরের মধ্যে একাধারে শিব-শঙ্করের মূর্তিতে দেখা দিবেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্য ইতিহাসের তিনিই চালক ও নেতা, ধারক ও বাহক। নব মহাভারতের তিনিই নব মহাবীর।

এই অরণ্যপথ-যাত্রার আর একটি ছবিও দেখিতেছি সেদিনের ডায়েরীতে লেখা আছে। এটুকুও উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ নাই বা করিলাম।—

"বনের মধ্যে কিছুদূর আসিয়া একটি গাছ দেখিয়াছিলাম। গাছটি আমার কাছে শক্তির একটি প্রতীক হইয়া আছে। প্রকাণ্ড গাছ, আশেপাশের কোন গাছই এরকম মোটা বা দীর্ঘ নয়। গাছটার মাথাটা নাই। মনে হয়, মাথাটা ডালাপালা সমেত কেহ মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে। এখনও কাণ্ডটি যে-দৈর্ঘ্য লইয়া খাড়া আছে, তাহাও কম নহে। হয়তো ঝড়ের সঙ্গে সমস্ত বনের পক্ষ হইয়া এ লড়াই করিয়াছিল। একে ভূমিশায়ী করিবার জন্য ঝড় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তবু উন্মুল করিয়া ভূমিশয্যা লওয়াইতে পারে নাই—এক পায়ে এক স্থানে দাঁড়াইয়াই বনের বীর বনস্পতি ঝটিকার সঙ্গে সংগ্রাম চালাইয়াছে।

অবশেষে আকাশের কালো মেঘ হইতে বজ্র বাহির হইয়া আসিয়াছে। অটল

স্থিরতায় এ সমুন্নত মস্তকে আকাশের বজ্রকে অবরোধ করিয়াছে—কিন্তু হার সে মানে নাই।

শক্তিমান যোদ্ধার এর চেয়ে বলিষ্ঠতর মূর্তি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সত্যিকার যোদ্ধার বোধ হয় এই রকম পরিণামই হইয়া থাকে। মানুষের সমাজেও কত বীরের মাথা খণ্ডিত হইয়া ধূলায় পড়িয়াছে। ইহাদের স্মরণেও শক্তি পাওয়া যায়, সম্মান করিতে পারিলে নিজেদের পৌরুষেও তেজ সংক্রামিত হয়। অনায়াসে মাথা দিয়া দেয়, তবু সম্মান দেয় না—মানুষের মহিমা ও বীর্যের কি সীমা আছে!"

এই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অভিজ্ঞতা একটু যোগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

বহুদিন যাবত দীনতাকে শাস্ত্রে ও কোন কোন সাধক সমাজে আদর্শ আচরণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তৃণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া সুন্দরভাবে নীচু হইবার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে বলা হইয়াছে এবং বিরাট বনস্পতি-বটকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। শক্তির দীন রূপটাই অর্থাৎ তামসিক দিকটাই গ্রহণযোগ্য হইল, আর শক্তির বলিষ্ঠ রাজসিক মূর্তিটি অনায়াসে পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু কেন? একি শুধু রুচিরই তারতম্য, না শক্তিকে গ্রহণ করার স্বাভাবিক অধিকারের তারতম্য?

তৃণ কেন আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত হইল? ঝড়ে সে উন্মুলিত হয় না, নত হইয়া ঝড়ের গতিপথকে জায়গা ছাড়িয়া দেয়। অর্থাৎ তৃণ টিকিয়া থাকার কৌশল জানে, এই তো? আর বিরাট বট, সে ঝড়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাই উন্মুলিত হয়। অর্থাৎ টিঁকিয়া থাকার কৌশল তার স্বভাবে সহজাত নয়।

কিন্তু কথাটি কি ঠিক? তৃণ গবাদি পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়, কিন্তু বটকে গ্রাস করিবার খাণ্ডব ক্ষুধা বা শক্তি কোন জীবেরই নাই। তৃণ পদতলে নিত্য মর্দিত হয়, বটকে পদতলে মর্দন করিতে পারে ভূতলে তেমন ভূচর কোথায়? তৃণ কোনদিন ছায়া দেয় না, পাখীকে আশ্রয় দেয় না এবং পথিককে সুখ বিশ্রামের

সুযোগ দেয় না। বিরাট বনস্পতি ধরণীকে কঠিন বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্তি দেয় বলিয়াই ধরণীর ধূলায় তৃণস্তর বিস্তারিত হইবার সুযোগ ও অধিকার পায়। সর্বশেষে, আকাশের ঝড়কে জাগ্রত ও আহ্বান করিবার শক্তি তৃণের নাই। বৃহৎ শক্তিই প্রকৃতির বৃহত্তম শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়া থাকে।

আর টিকিয়া থাকা? কতটুকু বন্ধন মাটির সঙ্গে তৃণের রহিয়াছে? ক্ষুদ্র বালিকার কচি অঙ্গুলীর আকর্ষণেই তাহা উৎপাটিত হইয়া আসে। আর বট? সমস্ত আকাশের ঝটিকার সহস্র বাহুতে তাকে আকর্ষণ করিয়াও সহজে উৎপাটন করা সম্ভব হয় না। অস্তিত্বের সাগরে তৃণ ক্ষণায়ু ক্ষণভঙ্গুর বুদ্বুদ, আর সেই সমুদ্রে বিরাট বনস্পতি অতলোত্থিত মগ্ন গিরি, সমুদ্রের শত তরঙ্গের আঘাত তার গায়ে মায়ের ঘুমপাড়ানী ছন্দের সুকোমল স্নেহস্পর্শ।

তৃণের দীনতা বা নীচুতা মানুষের আদর্শ আচরণ হইতে পারে না এবং হওয়া উচিৎ নহে। বিরাট বনস্পতির শক্তিমান বলিষ্ঠতাই মানুষের চরিত্রে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার রাজসী শক্তিই ক্রিয়াশীল। মানুষকেও চরিত্রে ও স্বভাবে তার আপন স্রষ্টারই প্রতিরূপ হইতে হইবে। কিন্তু তার পথ তো শক্তিহীন তৃণের তামসিকতা নয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঐ রাজসী শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে ঈশ্বরসদৃশই হইয়া উঠা যায়। সে পথের সন্ধান শক্তিমান যিনি, শুধু তিনি দিতে পারেন।

—কিছুদূরে যাইতেই পথের ধারে একটি ভূটিয়া ছেলের সাক্ষাৎ পাইলাম। এখানে মানুষ দেখিলে সত্যই চমকাইতে হয়। মানুষের মাথাটা কাঁধের উপর না থাকিয়া যদি মানুষের হাতে থাকিত, তবে যে রকম ঠেকিত, লোকালয়ে সমাজের মধ্য হইতে মানুষকে এখানে প্রক্ষিপ্ত দেখিলে তেমনি লাগে। অর্থাৎ মানুষকে এখানে মোটেই মানায় না, ছন্দপতন মনে হয়।

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে, এখানে বসে আছিস যে?"

উত্তর দিল না, কেবল শ্রীমানের ভেকলাঞ্ছিত 'নাসিকা-অতুল'-এর দুই পাশের খুদে চোখ দুইটি মিটমিট করিয়া উঠিল।

ধমক দিয়া উঠিলাম—"কি, বাক্য বুঝি কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না? যাবি কোথায়? এখানে বসে আছ কোন বুদ্ধিতে? বাঘের পেটে যাবার মতলব করেছ বুঝি?"

আমার এতগুলি প্রশ্ন উপর্য্যুপরি নিক্ষিপ্ত হইল এবং সামান্য কিছু কাজ হইল, তাহার প্রমাণও পাইলাম। নোংরা ছাতাপড়া দন্তপংক্তির ঈষৎ বিকাশ দেখা গেল এবং সেই ঈষৎ অবকাশের পথে একটি শব্দ নির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমানের বাঁ হাতটা সম্মুখে প্রসারিত হইল, অর্থাৎ ছেলেটা হাত পাতিল।

—"কি বলছ ধন, কিছুই যে বুঝতে পারছিনে। সভ্য ভাষায় বল, অন্ততঃ ইংরেজী না হয় হিন্দিতে বল না বাবা।"

শরৎবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

কহিলাম—"হাত বাড়িয়েছ কেন, চাঁদ? মতলবখানা কি?"

বয়স অল্প হইলে কি হয়, বুদ্ধিটি দেখিলাম অল্প নয়। ভাষায় যখন কুলাইল না, তখন ছবির সাহায্য নিল। বাঁ হাতেই একটা কাল্পনিক চুরুট ধরিয়া ধূম্রপানের ও উদ্গীরণের প্রক্রিয়াটা রিহার্সেল দিয়া দেখাইল। আমার মুখের চুরুটটাই শ্রীমানের লোভটাকে চেতাইয়া তুলিয়াছে।

—"হুঁ, সখ আছে, দেখছি। উঠে আয় হারামজাদা।"

পকেটে হাত দিতে গিয়া দেখি, র‍্যাপারের কটিবন্ধে পকেট চাপা পড়িয়াছে। র‍্যাপারটা ঢিলা করিয়া লইয়া বাক্স বাহির করিলাম। একটি সিগারেট বাহির করিয়া বাক্সটা পুনরায় পকেটে রাখিলাম। সিগারেট দেখিয়া ছেলেটার চোখে-মুখে আহ্লাদ নাচিয়া উঠিল।

কহিলাম—"উঠে আয়, পাজি কোথাকার। এই বয়সেই চরিত্রের মাথাটি চর্বণ করে বসেছ?"

শ্রীমান উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়াইয়া দিল।

—"নে বাবা নে, একটু দূরেই থাক না বাপু! একেবারে গন্ধমূষিক হয়ে আছ, নাকে যায় না?"

বলিয়া সিগারেটটি তার প্রসারিত হস্তে ছাড়িয়া দিলাম।

কহিলাম—"নে, ধরা। আস্ত একটা সিগারেট তোর জন্য খরচ হোল, দের ভোঁতা মুখ থেতলে! আমার দয়ার কথা স্মরণ রাখিস," বলিয়া পকেট হইতে ম্যাচ বাহির করিলাম।

সিগারেট মুখে লইয়া ভূটিয়ানন্দন মুখাগ্নির জন্য প্রস্তুত হইল। আগুন ধরিতেই এক মুখ ধোঁয়া নাকমুখ দিয়া বমন করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়াই শ্রীমান হাসিয়া ফেলিল, অপূর্ব দন্তপংক্তি প্রকটিত করিয়া পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিল।

—"খুশী হয়েছিস, বুঝতে পেরেছি। নে, এখন দাঁত বন্ধ কর, ও-দৃশ্য যে আর দেখা যায় না বাবা।"

আমাদের আর কিছু বলিবার অথবা দেখিবার অবকাশ না দিয়া শ্রীমান ঊর্ধ্বশ্বাসে সিগারেট মুখে ছুট দিল—দুই পায়ে ধুলা ও শুষ্ক পাতা মাড়াইয়া সামনের পথটা দিয়া তীরের মত বেগে ধাবমান হইল।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি, পালাল যে?"

—"বলবেন না, একেবারে কাপুরুষ, রাজ্য ছেড়ে পলায়ন। এই উল্লুক, আস্তে যা, আলথাল্লায় পা বেধে আছাড় খেয়ে মরবি যে—"

এই উপদেশেও গতি শ্লথ করিবার মত আশ্বাস ছেলেটা প্রাপ্ত হইল না। শুধু ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিয়া লইল যে, আমাদের ও তার মধ্যে ব্যবধানটা যথেষ্ট দীর্ঘ ও নিরাপদ করা হইয়াছে কিনা।

ছেলেমানুষীতে পাইয়া বসিল, কেমন যেন একটা অনাবিল আমোদ পাইতেছিলাম।

চেঁচাইয়া আশ্বাস প্রেরণ করিলাম—"এই, সিগারেট ফেরৎ দিতে হবে না, ওটা তোকেই দিয়ে দিয়েছি—এখন একটু আস্তে যা বাবা—"

অভ্যাস ছিল না, তাই শেষের শব্দটায় দুই কাজই পাইয়া গেলাম, অর্থাৎ 'বাবা' বলিয়া দম ছাড়িয়া দম লইলাম।

শরৎবাবুর হো হো হাসি অট্ট হইতে অট্টতর হইল। চাক্ষুষ অবশ্য দেখিতে পাই নাই, তবু ঠিক জানি এ হাসিতে পাখীরা আচমকা গাছ ছাড়িয়া উড়িয়া ডাল বদলাইয়া বসিয়াছে, গর্তে নিদ্রিত সাপের কুণ্ডলী ক্ষণেকের জন্য শিথিল হইয়া আবার স্তিমিত হইয়াছে এবং গুহাভ্যন্তরে বিশ্রাম-সুখে লম্বমান শার্দুল থাবার উপাধান হইতে ঘাড়টা তুলিয়া আবার যথাস্থানে রক্ষা করিয়াছে। বাবা, মানুষের হাসি এই রকম হয়, শুনিয়াও বিশ্বাস হয় না।

কহিলাম—"আসুন, হারমাজাদাকে দৌড়ে গিয়ে ধরি।"

শরৎবাবু অতটা রাজী ছিলেন না, তাই আর রেসের দৌড় দেখিতে ও দেখাইতে পারিলাম না।

পথটা কিছুক্ষণ হয় চেহারা বদলাইয়াছে, কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হইয়া আবার ঢালু হইতেছে। ঢেউ-খেলানো পথ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, পাহাড়ের প্রায় পায়ের কাছাকাছি পৌছিয়াছি।

একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা পাইয়া গেলাম। ছেলেটা রাস্তার পাশে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়ারই গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সিগারেটটা তখনও শেষ হয় নাই, ধূমপান মহা আরামেই চলিতেছে।

ছনম্বর ঘোড়ার সোয়ার ভদ্রলোক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অদূরে পথিপার্শে অধুনা বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক দৃষ্টিপাতেই ভদ্রলোকের ফটোটি চোখে তুলিয়া আনিলাম। একটা মাফলারকে মাথার পাগড়ী করিয়া বন্ধন করা হইয়াছে, আলোয়ানটা মিলিটারী ব্যাজের মত বুকে ও পিঠে পৈতা হইয়া শেষের অংশটুকু কটিবন্ধের কাজে লাগিয়াছে, আর তিনি নিজে খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট একটি গোস্বামী হইয়া উপবিষ্ট আছেন। আড়চোখে ও সোজা চোখে দুইভাবেই গোস্বামীজীকে আবার দেখিয়া লইলাম।

বুঝিলাম যে, বিশ্রামপর্ব চলিতেছে। অশ্বারোহণে এই পথটুকু আসিতে

গোস্বামীর শরীরটা বোধ হয় নাড়া-খাওয়া দধি হইতে তক্রে মানে ঘোলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেখিলাম, একটু ঘায়েল হইয়াছেন। কিন্তু মাথার ও কোমরের ও-দুটো ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া একটু ঢিলা হইতে কি বাধা ছিল? কিন্তু তখনও জানি নাই যে, তিনি বাতের রোগী, গরমটা গোস্বামীর অসহ্য হইলেও স্বাস্থ্যকর।

ছেলেটাকে কহিলাম—"আচ্ছা ঘোড়া পেয়েছিস তো, হেঁটে এসে ধরতে পেলি। চলে তো, না ঠেলে নিতে হয়?"

গোঁসাইয়ের মুখেও হাসি খেলিয়া গেল। গোঁসাইকে পূর্বে না দেখিয়াই মূর্তিমান স্বার্থ বলিয়া জানিয়াছিলাম, এখন দেখিয়া জানিলাম যে, তিনি রসিকও বটে। ঘোড়াটার কান নড়িয়া উঠিল, হয়তো আমার অসম্মানজনক উক্তিটিকে কানের বাতাস দিয়া কর্ণপ্রবেশ পথ হইতে দূরে উড়াইয়া দিল। ঘাড় বাঁকাইয়া বক্তাকে মানে আমাকে একবার দেখিয়াও লইল। হাসিয়া উঠিবে না তো? না, ঘোড়াটা শরৎবাবুর অট্টহাসি বা গোঁসাইয়ের মৃদু হাসি কোনটাই দিল না। বাঁচা গেল।

ঘোড়ার কান নাড়া দেখিয়া ইচ্ছা হইল যে, ছেলেটার কানটাও টানিয়া একটু নাড়াইয়া দেই, কিন্তু সামলাইয়া গেলাম। গন্ধের ভয়ে পিছাইয়া আসিলাম—কে জানে, গন্ধটা যদি হাতে অক্ষয় হইয়া লাগিয়া থাকে। পাকা রং থাকিতে পারে, আর পাকা গন্ধ থাকিতে পারিবে না, এ কোন কাজের কথা নয়।

শরৎবাবুকে কহিলাম—"চলে আসুন, আবার সিগারেট চেয়ে বসবে। দেখছেন না, আস্ত শয়তান, কি রকম মিটিমিটি তাকাচ্ছে।"

ছেলেটাকে কহিলাম—"যা, আজ বেঁচে গেলি, সিগারেটের জন্য যে কান ধরে তোকে ওঠ-বস করাইনি, এ তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য জানবি। মনে রাখিস, ব্যাটা অকৃতজ্ঞ।"

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম গোস্বামীর মোটা মুখে মৃদু হাস্য ঝিলিক দিতেছে। ব্যাটা বকধার্মিক, চুপ করিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া আছেন, মুখের কাছে পাইলে দেখিতেছি কিছুই ছাড়েন না।

—"চলুন" বলিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছু একটা ঘটিয়া গেল বুঝিতে পারিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, শরৎবাবু ছোঁ মারিয়া ছেলেটার হাত হইতে গাছের ডালের লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া হস্তগত করিয়াছেন। ছেলেটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। ভাবখানা এই যে—"যান, ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম। চাইলেই হোত—"

কহিলাম—"সিগারেটের দাম এটা, বুঝলি? ঋণ থেকে মুক্ত হলি, নইলে নরকে যেতিস, কেউ ঠেকাতে পারত না। অমনিতেও যাবি, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

পাহাড়ে পা দিয়া মনের ছেলেমানুষী সরিয়া গেল।

কিন্তু আর এক রকমের চাঞ্চল্য মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। এখন আমি কোনদিক বাদ দিয়া কোনদিকে তাকাই। যে দিকেই তাকাই, দৃষ্টি আটকা পড়িয়া যাইতে চাহে। এতবড় পাথর, চোখ দিয়া বেষ্টন করিতেই যেন ক্লান্তি আসে। গভীর খাদ, তাকাইয়া দেখিতে মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয় নিম্ন হইতে অদৃশ্য কে যেন প্রবল আকর্ষণ করিতেছে। পাথর কাটিয়া সিঁড়ির মত পথ করা হইয়াছে, একধারে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ, উপরে উঠিতে লাগিলাম।

উপরে যতই উঠিতে লাগিলাম, পরিশ্রম ততই বাড়িতে লাগিল। শরৎবাবুর তো দেখিলাম রীতিমত শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়াছে। পাহাড়ী বাতাস জোরে জোরে টানিয়াও বুক ভরিতে চায় না, বাতাস হাল্‌কা হইয়া আসিতেছে। ঘন বাতাস টানিয়া এতদিন বাঁচার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি, পাহাড়ী বাতাসে তাই পর্যাপ্ত প্রাণ পাইতেছিলাম না।

শরৎবাবুর কষ্ট দেখিয়া পাষণ্ডেরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হইত। একেই তো উর্দ্ধে উঠা চিরকালই একটু শক্ত ব্যাপার, মাধ্যাকর্ষণ নিরন্তর নীচে টানিয়া রাখিতে চাহে; তদুপরি শরৎবাবু পালোয়ান হইলেও একটু স্থূলকায় ব্যক্তি। ভয় হইল, হার্টফেল হইয়া রাস্তায় শুইয়া পড়িবেন না তো! তখন এ লাশ লইয়া আমি কি করিব?

ভাবনাটা বাধা পাইল। শরৎবাবু আমার কাঁধে হাত রাখিয়া তাঁর দেহের গুরুভার যতটা পারিলেন আমার উপর চালান করিয়া দিলেন। আমি মানুষ, ভারবাহী প্রাণী নহি এবং ভুটিয়া কুলীও নহি। সুতরাং থামিয়া পড়িতে আমি অবশ্যই বাধ্য।

কাঁধ হইতে হাতটা সরাইয়া দিলাম, অর্থাৎ সরিয়া আসিতেই শরৎবাবুর হস্ত আমার স্কন্ধচ্যুত হইল।

কহিলাম—"করেন কি? আত্মনির্ভরশীল হন দেখি।"

কিন্তু আত্মনির্ভরশীল হইবার কোন ইচ্ছা, অথবা শক্তিও হইতে পারে, শরৎবাবুর ছিল না। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমারও তো তাঁর মত দুখানা ঠ্যাংই মাত্র সম্বল, আর দুখানা বেশী হইলে নয় কথা ছিল না। বন্ধুর বোঝা বইতে তখন ন্যায়তঃ আমি বাধ্য থাকিতাম।

শরৎবাবুর গায়ে মাংস বেশী, আমার গায়ে মাংস নাই বলিলেই চলে! বেশ, স্বীকার পাইলাম। কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে মাধ্যাকর্ষণের ট্যাক্স তো কম দিতে হয় না, তাঁর সমানই দিতে হইতেছে। মাধ্যাকর্ষণের বেলায় লঘুগুরু ভেদ নাই, এটা শরৎবাবুর জানা উচিৎ ছিল।

কহিলাম—"লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠুন।"

—"বাবা! প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে হয়," বলিয়া প্রাণধারণের যে-কষ্ট হইতেছে, তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের নমুনায় দেখাইয়া দিলেন।

পায়ের শব্দে সম্মুখে উপরের দিকে চাহিলাম। উপরের বাঁকটায় সাদা কালো এক জোড়া আদমীর আবির্ভাব হইল, ভীষণ বেগে নীচে নামিয়া আসিতেছে।

পোষাকে ও কোমরের পিস্তলে পরিচয় জানাইয়া দিল যে, পুলিশ কর্মচারী, সার্জেণ্ট ও হাবিলদার। অনুমানে জানিলাম, ফোর্টে বন্দী পৌছাইয়া দিয়া স্টেশনে চলিয়াছে, ফিরতি গাড়িতে রাজধানীর লোক রাজধানীতে যাইবে।

সাহেবটি মাংসপিণ্ডে-গড়া একটি বর্তুল মূর্তিবিশেষ। মুখটা হাঁড়ির মত

প্রকাণ্ড এবং একেবারে একটি নিখুঁত বর্তুল। দেশীটি লম্বায় ছ' ফুটের উপরেও কম করিয়া আরও ইঞ্চি চারেক, দেহের প্রস্থেও বড় কম যায় নাই। দুজনেই মাতালের মত টলিতে টলিতে নামিতেছিল, কিন্তু গতিটা দ্রুত। বুঝিলাম, মাধ্যাকর্ষণের স্রোতে নিজেদের ছাড়িয়া দিয়া কোনমতে দেহের হাল ঠিক রাখিয়া যাইতেছে—তাই গতি ঝড়ের মুখে পাল-তোলা নৌকার মত।

এই দুই দানব গায়ের উপর আসিয়া পড়িলে আমাদের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

নিজে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—"সরে দাঁড়ান, ধাক্কা লাগলে অবস্থাটা ভালো হবে না। এ-পাশে আসুন, ও-পাশে খাদ দেখতে পাচ্ছেন না।"

শরৎবাবু এ-পাশে সরিয়া আসিলেন, কহিলেন—"মদ খেয়েছে নাকি ? ও-রকম ক'রে টলতে টলতে দৌড়ে আসছে কেন ?"

মদ্যপান করিয়াছে কি না, আন্দাজে বলা শক্ত। তাই যাহা বলা যায়, তাহাই বলিলাম—"পতনের পথ কত সহজ দেখেছেন, হাত পা ছেড়ে দিলেই হ'ল। আর এদিকে আমাদের এক পা উঠতে একপো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।"

যুগল মূর্তি প্রায় কাছে আসিয়া পড়িল। ওদের নামার সুবিধাটায় কিছুক্ষণ আগে ঈর্ষা বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাছে আসিতে ভুল ভাঙ্গিল। মাধ্যাকর্ষণে প্রায় কাহিল করিয়া আনিয়াছে, ধাক্কা সামলাইতে হাল ঠিক রাখিতে দু'জনেরই প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সাদাটি তো প্রায় ব্যাদিত বদনে মানে হাঁ-করা মুখে নামিয়া আসিতেছে, শ্বাস নেওয়া ও ফেলা ছাড়া ও-মুখে এখন আর অন্য কোন কাজের অবস্থা নাই—সমতল ভূমিতে গেলে যদি বাক্য বাহির হয়। কালাটির অবস্থাও খারাপ, কিন্তু সঙ্গীটির মত অত নহে।

হাত কয়েক উপরে থাকিতেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কালা আদমী বলিল,—"বহুৎ আচ্ছা খানাপিনা, জায়গাভি আচ্ছা হ্যায়, আরাম সে রহগে।"

থামিবার যো ছিল না, বলিতে বলিতে প্রায় হাত দশেক নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

শরৎবাবু বলিলেন—"শালার কথা শোন! আমার যাচ্ছে প্রাণ বেরিয়ে, আর উনি এলেন খানাপিনার ব্যাখ্যান করতে। দেয় ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে।"

সত্যি একখানা ভারী পাথর এখান হইতে গড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেই হয়, তারপর ব্যস্, ঐ পাঁচ ছ'শো হাত গভীর খাদে জন্মের মত ঠাণ্ডা হইয়া থাকিবে। —এ পথে মৃত্যু এতই সুলভ।

খানিকক্ষণ যাবৎ কি রকম একটা শব্দ কানে আসিতেছিল, কোথায় যেন কে ভয়ানক গর্জন করিতেছে।

একটা পুলের কাছে আসিয়া গেলাম, নিম্ন দিয়া একটা ঝরণা চলিয়াছে। যেমন বেগ, তেমনি গর্জন, আশেপাশের সমস্ত পাহাড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কিসের সঙ্গে এই দুর্দান্ত পর্বতদুহিতার তুলনা করিব, ঠিক পাইতেছিলাম না। তুলনার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম,—একটা লোভ ক্ষণিকের জন্য মনের আকাশে ঝিলিক দিয়া মিলাইয়া গেল।

আচ্ছা, এ রকম কোন মেয়ে পাওয়া যায় না, যার মধ্যে এই পার্বত্য স্রোতস্বতীর মানবী প্রতিমূর্তি দেখা যাইবে—এমনই প্রাণবেগ, এমনই পাথর-টলানো দুর্দমনীয় গতি, এমনই অফুরন্ত উদ্বেল প্রাচুর্য! কিন্তু পাহাড়ের মত মানুষ কোথায়, তেমন মেয়ে পাওয়ার যার অধিকার আছে—স্থির অচঞ্চল থাকিয়া এ প্রাণ-প্রবাহকে যে বুকে ধরিতে পারে? জানি, নাই। তবু তো মানুষ লোভ করিতে পশ্চাদপদ হয় না। লোভ করিবার শক্তি আছে, অথচ পাইবার অধিকার নাই, একী অদ্ভুত অসহনীয় নিয়ম!

শরৎবাবু বাঁচিয়া গেলেন। ঝরণার জলে পা ডুবাইয়া, মুখ ধুইয়া, ঘাড়ে ও মাথার পিছনটায় জল দিয়া তিনি চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। এমন কি তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আঃ, শরীর জুড়িয়ে গেল। আর কোন ক্লান্তি নেই——"

জলে হাত দিয়া আমারও ঐ রকম একটা আরামের নিঃশ্বাস বাহির হইল, এত ঠাণ্ডা! বরফ-গলা জল, পাথর কাটিয়া আসিতেছে, নদী হইয়া পথের দুধারে অকৃপণ হাতে প্রাণের পানীয় পরিবেশন করিয়া যাইবে—. একখানি কল্যাণময়ী বধূমূর্তি চোখের সম্মুখে দেখা দিল। অথচ এ সাগরের অভিসারে বাহির হইয়াছে। এ এক অদ্ভুত অভিসারিকা—যে প্রেম একে আকর্ষণ করিয়া পিত্রালয় হইতে একাকী পথে বাহির করিল, তাহাতে সকলের জন্য কল্যাণ কেমন করিয়া স্থান পাইল?

মানুষের প্রেম-অভিসার এ রকম কল্যাণবাহী হয় না কেন? সে-প্রেম গোপন, একাকী পথচারী, দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় কি কারণে? মানুষের প্রেম বড় জোর গৃহের শান্ত প্রদীপশিখা হয়, নয় মশাল হইয়া জ্বলিয়া গৃহে আগুন ধরায়।

আমার সামনের এই অভিসারিকা পর্বতকন্যার এত প্রাণ, এত চাঞ্চল্য এবং এত প্রচণ্ড গতিবেগ—অথচ গায়ে হাত দিয়া দেখি এর সমস্ত শরীর কত শীতল, কোন তাপ-জ্বালা এর দেহে নাই। মানুষের দেহ-মনের গতিও যত, তাপ-জ্বালাও তত—প্রচণ্ড গতির সঙ্গে তেমনি প্রগাঢ় শান্ত শীতলতাকে এর মত বহন করিতে তো মানুষ পায় নাই।

ঝরণার হাত হইতে শরৎবাবুকে এক রকম ছিনাইয়া লইয়া অবশেষে আবার পথ ধরিলাম।

ফোর্ট কতদূর ধারণা ছিল না, তবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, পথ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। আর মিনিট কুড়ি পথ গেলেই বক্সার পোষ্ট অফিসঘর। সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই সামান্য একটু ঘটনা ঘটিয়া গেল, তার উল্লেখ থাকা দরকার। কারণ, পুলিশ কর্মচারীও মানুষ, শত হউক তারাও এ-দেশেরই লোক, এই কথার প্রমাণ এই ঘটনাতে পাওয়া যাইবে।

পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাইলাম। না দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম, ছ' নম্বর ঘোড়ার সওয়ার গোস্বামী প্রভু আসিতেছেন। কিন্তু

গোস্বামীর ঘোড়ার খুরের শব্দ তো এ রকম হওয়ার কথা নহে। রীতিমত আশঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। চাক্ষুষ দেখিবার জন্য ঘাড় ফিরাইলাম। যাক্ গোস্বামী নয়, দারোগা সাহেব ঘোড়ায় চাপিয়া আসিতেছেন।

গোস্বামীর জন্য দুশ্চিন্তাটা দূর হইল বটে, কিন্তু দারোগার উপর রাগ জন্মিয়া গেল। যাঁদের জন্য ঘোড়া, তাঁরা পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের পথ ভাঙ্গিতেছেন, আর উনি নবাবের মত—

চিন্তাটা শেষ করিতে পারিলাম না, অর্থাৎ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তাহা শরৎবাবুকে শুনাইবার ফুরসৎ পাইলাম না, দারোগাবাবু পাশে আসিয়া ঘোড়া হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাগ হইলেও মনে মনে এর অশ্ব ও অ হইতে অবতরণ-ভঙ্গীটির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না।

নামিয়াই কহিলেন,—"ওঁরা কেউ আর ঘোড়ায় চড়তে চান না, আপনার জন্য নিয়ে এলাম। নিন, উঠুন—"

—"আর কাউকে দিয়ে দিন, আমার ঘোড়ার দরকার নেই।"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাই বুঝিয়া নিলেন যে, আমি রাগ করিয়াছি। বলিলেন,—"বিশ্বাস করুন, কাউকে বঞ্চিত করে আনিনি। ওঁরা পায়ে হেঁটে দল বেঁধে আসছেন, ঘোড়ার চেয়ে তাতেই নাকি আরাম। কাজেই এটা চেপে এসেছি—আপনাকে ধরবার জন্য ছুটিয়ে এনেছি, ব্যাটার ঘাম বেরিয়ে গেছে," বলিয়া ঘর্মাক্ত বাহনটির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইলেন।

সুর আমার কি কারণে এত আন্তরিক ও নরম হইল, জানি না। বলিলাম,—"আমার জন্য এত কষ্ট করেছেন, সত্যই আমি খুসী হয়েছি। আমরা হেঁটেই যাব, তাতেই আরাম বেশী।"

পরে আসল কারণটি ব্যক্ত করিলাম,—"আর দেখছেন তো," বলিয়া ওদিকের ছ'সাতশত হাত গভীর খাদটার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

দারোগাবাবু এবার হাসিয়া ফেলিলেন, ভাবখানা এই যে, ছোঃ, এরা আবার বিপ্লবী, ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়াশুদ্ধ খাদে পড়িতে ভয় পায়।

কহিলাম,—"কেউ আর এখন ঘোড়ায় যাবে না, আপনিই এটা বাকীটুকু ব্যবহার করুন।"

—"যাবেন না? আচ্ছা। এটাকে খালি পিঠে যেতে দিয়ে লাভ নেই," বলিয়া লাফ দিয়া ঘোড়ায় চাপিলেন এবং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগাইয়া গেলেন।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপার কি?"

—"কিসের?"

—"পায়ে হেঁটে আসছেন, তবু ঘোড়া ছুঁলেন না যে ওঁরা?"

শরৎবাবু কহিলেন—"কে জানে?"

বুঝিলাম, শরৎবাবুর আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়াছে।

কহিলাম,—"আমি জানি।"

এ রকম উত্তর বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই, তাই ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জানেন?"

গম্ভীর হইয়া কহিলাম,—"বাল্য শিক্ষা পড়েননি?"

—"পড়িনি? কি যে বলেন। পিসিমার কাছে শুনেছি যে, এক বছরে তেরখানা বাল্যশিক্ষা ছিঁড়েছি।"

হাসিয়া ফেলিলাম, "বলেন কি, এতই?

—"তবে না তো কি—" বলিয়া কৈশোর-পাণ্ডিত্যে গর্বিত বোধ করিলেন।

তারপর প্রশ্ন করিলেন—"বাল্য-শিক্ষার কথা কি বলছিলেন?"

—"পড়েননি, 'ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল,' কিন্তু ইহারা আবার চড়িল না।"

শরৎবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বোধ হয় দৃশ্যটা কল্পনায় দেখিয়া অতীব মজা ও হাসির ব্যাপার বলিয়া তার প্রতীতি হইয়া থাকিবে।

আমি বাল্যশিক্ষায় যাহা জানিয়াছিলাম এবং শরৎবাবু কল্পনায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই ঘটিয়াছিল। তবে আমাদের ক্ষেত্রে নয়, আগের

দিন যে দল গিয়াছে, তাদের একজনের অভিজ্ঞতা এবম্প্রকারই হইয়াছিল। কাম্পে পৌছিয়া শুনিয়াছিলাম।

ভদ্রলোকের নাম বীরেন দাশগুপ্ত। দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে অধিক, তদুপরি জেলের খাওয়া খাইয়া আরও মেদপুষ্ট হইয়াছিলেন। বক্সাস্টেশনে থামিয়া তিনি একটা ঘোড়া দখল করেন।

বন্ধুদের বলিলেন,—"এটা আমার ঘোড়া, কেউ যেন আবার নিয়ে সরে না পড়ে। এই চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। যে নেবে তার দিব্যি—" বলিয়া জামার বুক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘোড়াটার ঘাড়ে লাগামের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?"

—"আসছি," বলিয়া প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে একটু দূরে গেলেন। পরে ভারমুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ঘোড়া ঠিক আছে, বে-দখল হয় নাই।

কহিলেন,—"না, তোমরা দেখছি সবাই ভদ্রলোক, সুযোগ পেয়েও পরস্বে হাত দেও না। হাসছ যে ?"

—"আপনি ঘোড়ায় চড়বেন—"

চটিয়া বীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—"এতে হাসির কি হল ? আমি ঘোড়ায় না চেপে ঘোড়াটা আমার উপর চাপবে ভেবেছিলে না কি ?"

—"আমরা তো সেই আশাতেই আছি"

বীরেনবাবু কহিলেন,—"বৃথা আশা তোমাদের। জান, আমার ঠাকুর্দা ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যেতেন ? আমি তাঁরই পৌত্র।"

অশ্বারোহণের উপযুক্ত সজ্জা করিয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু একা নিজের চেষ্টায় তিনি ঘোড়াটার পিঠে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিলেন না।

বলিলেন,—"দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছ কেন? একটু সাহায্য কর না।"

বন্ধুরা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া এই আড়াইমণি মাল ঘোড়ার পিঠে উঠাইয়া দিলেন। ঘোড়া আগাইয়া চলিল। পিছন হইতে বন্ধুদের হাসির শব্দ শুনিয়া অশ্বারোহী ঘাড় ফিরাইলেন, কিন্তু হাসির কারণটা অনুধাবন করিতে পারিলেন না।

পরে ঘাড় ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বসিয়া আছেন, আর সামনে থাকিয়া দড়ি ধরিয়া একটা ভূটিয়া ছেলে জীবটিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছিল—এই দৃশ্যটাই বন্ধুদের হাসির হেতু।

বীরেনবাবু চটিয়া ছেলেটাকে একটা ধমক দিলেন—"এই উল্লুক, দড়ি ছেড়ে দে বলছি। আমাকে পেয়েছিস কি শুনি?"

ছেলেটা ভয়ে দড়িটা খুলিয়া লইল।

বীরেনবাবু দুই হাতে লাগাম ধরিয়া দুই হাঁটুতে ঘোড়াটার কুক্ষিদেশে কষিয়া দুই গুঁতা দিলেন, অর্থাৎ ঘোড়াকে ঘোড়ার মত চলিবার নির্দেশ দিলেন। ঘোড়া এ আদেশ পালন করিল।

পিছন হইতে বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চীৎকার করিলেন,—"বীরেনদা, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।"

বীরেনবাবু নামিলেন না, কারণ তাঁর নামিবার মতন অবস্থা নয়।

তিনিও উত্তর দিলেন,—"খামাকা কেন পরিশ্রম করতে যাই, ভালো বুঝলে ওই নামিয়ে দেবে।"

তাহাই হইল। ঘোড়াটা ভালোই বুঝিল, ফলে বীরেনবাবু ধাবমান অশ্ব হইতে পথের উপর ছিটকাইয়া গিয়া পড়িলেন।

তখনও পাহাড়ী পথ শুরু হয় নাই, বনের পথের ধূলা সর্বাঙ্গে মাখিয়া বীরেনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জামা-কাপড় ঝাড়িবার চেষ্টাও করিলেন না। বন্ধুরা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং একসঙ্গে অনেকের হাত লাগিয়া গেল, ধূলা মার্জনা করিয়া বীরেনবাবুকে চলনসই করিতে।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—"লাগেনি তো ?"

বীরেনবাবু উত্তর করিলেন,—"লাগবে ? কেমন কায়দার উপর নাবলাম দেখলেন না !"

আবার বিস্মিত প্রশ্ন হইল,—"নাবলেন কোথায় ? আপনি তো ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন।"

বীরেনবাবু প্রতিবাদ করিলেন,

—"না পড়িনি, ঘোড়াই ফুরিয়ে গেল।"

উত্তর শুনিয়া বন্ধুরা হাসিয়া উঠিলেন।

ঘটনাস্থল বনের পথ বলিয়া তাঁহারা হাসিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দারোগাবাবু যেখানে আমাকে ঘোড়াব পিঠে অর্থাৎ হাতে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেখানে এ সব হাসিই শোকের কান্না হইয়া যাইত। ধাবন্ত ঘোড়ার পিঠে আসন টলিতে টলিতে অবশেষে পুচ্ছের উপর দিয়া পিছলাইয়া আরোহীর পতন ঘটিলে, সে-পতন পথের উপরই শেষ হইত না, আরও খানিকটা, এই পাঁচ ছ'শত হাত, গড়াইয়া নীচে ঐ খাদে গিয়া তবে সে পতন থামিতে পারিত।

ভাবিতেও গায়ে কণ্টক দেয়। যাক্, 'বুদ্ধির জোরে বাঁচিয়া গিয়াছি, বুদ্ধি করিয়াই তো ঘোড়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ও তো ঘোড়া প্রত্যাখ্যান নহে, আসলে মৃত্যুকেই ফিরাইয়া দিয়াছি। অত বড় বুদ্ধিমান চাণক্য ব্রাহ্মণ, তিনি কি আর না জানিয়াই বলিয়াছিলেন যে, শত হস্তেন বাজিনা। বাজিনার স্থলে অনেকে পাজিনা বলিয়া থাকেন, তাতেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না। বরং চাণক্যের তালিকাটি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হইবার সুযোগ পায়।

এত বুদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু একটা ক্ষোভ মনে তখন জাগিয়াছিল যে, যদি ঘোড়ায় চড়িতে জানিতাম। ঘোড়ায় চড়িতে পারি না, এটাকে আমি অক্ষমতা বলিয়াই মনে করি। এমন কি পৌরুষ যেন এই ত্রুটিতে একটু

ম্লানই হয়। অশ্বারোহী ছবিটির মধ্যে মানুষের পৌরুষ ও তেজ যত প্রকাশিত, তা তার কম মূর্তিতেই দেখা যায়।

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশে পোস্টঅফিস দেখা গেল। সামনে একটা শুকনো ঝরণার পাথর-নুড়ি বিছানো পথ, তার উপর একটা পুল। পুলের ডাহিনে পাহাড়টার উপরই ফোর্ট, তার পশ্চিম দিকটা গাছপালার ফাঁকে এখান হইতে বেশ দেখা যাইতেছে।

ঐ বক্সা দুর্গ। শেষটা তবে আসাই গেল।

কোমরের র‍্যাপারটা খুলিয়া লইলাম, মল্ল-কচ্ছ মুক্ত করিয়া দোদুল্যমান কোঁচাতে পরিবর্তন করিলাম এবং পাঞ্জাবীর গুটানো আস্তিনকে ঢিলা করিয়া দিলাম।

শরৎবাবুকে কহিলাম,—"নিন, কাপড়-জামা ঠিক করে ভদ্রলোক সেজে নিন।"

—"আপনি নিন। ভদ্রলোক আবার সেজে ভদ্রলোক হয় কেমনে? আমি ঠিক আছি।"

না, শরৎবাবুকে যত সরল মনে করিয়াছিলাম, তা নয়। ভিতরে প্যাঁচ যথেষ্টই আছে। যাক্, একজন কাপড়-জামা ঠিক করিয়া ভদ্রলোক সাজিলাম এবং আর একজন কাপড়-জামা ঠিক না করিয়াই ভদ্রলোক রহিয়া গেলেন। তারপর আমরা এই দুই মূর্তি অপরাহ্ণের শেষের দিকে দুর্গের তোরণদ্বারে আসিয়া থামিলাম।

ঢুকিবার মুখে একবার শুধু ভাবিলাম যে, এ যদি অভিমন্যুর চক্রব্যূহ না হয়, তবে বাঁচিয়া থাকিলে নির্গমন পথে বাহির হইতে একদিন পারিবই।

মনের কানে কানে মন্ত্র শুনাইলাম,—মাভৈঃ, ভয় নাই।

বকসাতে আসিয়া একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম, যেন কুয়ার ব্যাঙকে সমুদ্রে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থান, কাল পাত্র— সবগুলি মিলাইয়া এমনই একটা অবস্থা আমার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইল যে, এর সামান্যতম অংশকে চেতনা দিয়া বেষ্টন বা আয়ত্ত করিতেই মন হাঁপাইয়া উঠিল, সেই যাকে বলে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম, ভদ্র ভাষায়—হতভম্ব অথবা হতবুদ্ধি হওয়া।

এতদিন ছিলাম জেলে, বড়জোর দশবারো জনে মিলিয়া বাসস্থানকে নরক বানাইয়া গুলজার করিবার চেষ্টাই শুধু করিয়াছি। যেন ছোট্ট একটি পরিবারের সীমাবদ্ধ ছোট্ট ডোবায় সাঁতার কাটিয়াছি, ঐটুকু জলেই হাবুডুবু পর্যন্ত খাইতে অসুবিধা বোধ করি নাই, এমনই ছিলাম।

কিন্তু এতো তা নয়। এখানে দেখি ইতিমধ্যেই শ'দেড়েক লোক হাজির রহিয়াছে এবং এখনও লোক আনিয়া সংখ্যা বাড়ানোই চলিতেছে। স্কুলে থাকিতে অঙ্ক কষিতে হইত—চৌবাচ্চার একটা পাইপ দিয়া জল আসে এবং আর একটা পাইপ দিয়া জল নিঃসরণ হয়। কিন্তু এখানে ভিতরে ঢুকিবার পাইপটাই আছে, বাহির হইবার পাইপটার কোন পাত্তাই পাইতেছি না। এরকম অঙ্ক যে জীবনে কষিতে হইবে, কই, তাতো স্কুলে বা কলেজে কোন শিক্ষকই শাসাইয়া দেয় নাই! পুরা জ্ঞান বোধ হয় কোন শিক্ষকই দেন না, কিছুটা হাতে রাখিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অভ্যাস, অর্থাৎ ঠেকিয়া শিখিবার জন্যই আমাদের তাঁহারা অর্ধশিক্ষিত করিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

বাঙলাদেশের এমন জেলা নাই যেখান হইতে এই বকসা দুর্গে লোককে টানিয়া আনা না হইয়াছে। বিমূঢ় হইয়াই গেলাম, দেশে এত বিপ্লবীও ছিল! গোপনে গোপনে বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা কী ভয়ানকভাবেই না প্রদেশের জেলায় জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, একেবারে সর্বনাশের জালটিই ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল! আমরা যে এতখানি আগাইয়া গিয়াছিলাম, দেখিতেছি সে খবরটা আমরা নিজেরাই জানতাম না। ঠাট্টা

নয়, সত্যিই নিজেদের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। নিজের চেহারা নিজের চোখে দেখিতে হইলে আয়নার আবশ্যক করে, সেই আয়নাটা এতদিনে পাইয়া গেলাম। আমাদের সম্বন্ধে ইংরেজের বিভীষিকাই সেই আয়না, তাতে আমাদের যে প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত দেখিলাম, তাহা প্রকৃতই আমাদের আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশ্লাঘা বর্ধিত করিয়া দিল এবং তাহা আমার কাছে একটুও অযথা বা অযৌক্তিক বোধ হইল না। নিজের মূল্য নির্ধারণের বহু উপায়ই হয়তো আছে। কিন্তু অপরের ভয়-ভীতিও একটি প্রামাণ্য নিকষ-পাথর, যাতে আমরা আসল কি মেকি তাহা বেশ কষিয়া লওয়া চলে—ইহাই আমার বিশ্বাস।

১৯০৫ সালে একদিন বাঙলার মাটিতে ফাটল দেখা দিয়াছিল, সে ভাঙ্গা ফাটল অবশ্য জোড়া লাগিয়া আবার সেই আস্ত বাঙলাই হইল। কিন্তু মাঝখান হইতে একটা 'কিন্তু' জন্ম লইল, সেই ফাটলের পথে বাঙলার মাটির গভীর গহ্বর হইতে একটা সাপ বাহির হইয়া আসিল দাঁতে বিষ ও ছোবল লইয়া। সে সাপ কোন লাঠিতেই মরিল না,—অবশ্য লাঠিও তখন পর্যন্ত ভাঙ্গে নাই, কিংবা গর্তে ফিরিয়া গিয়া কুণ্ডলীশয্যায় আবার ঘুমাইয়াও পড়িল না। সেই নাগিনীর ফনার ছত্রছায়ায় যে ইতিমধ্যে এতগুলি বিষাক্ত শিশু সাপ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে ইহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল! সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, কি বিষ-স্তন্যে কোন্-নাগমাতা এদের পালন করিয়াছে, তা কি এরা জানে! অধিকাংশ বন্দীই একে অপরের অপরিচিত, কিন্তু গোত্রে এদের মিল আছে, একই বিষবন্ধনে ইহারা গ্রথিত। তাই বন্ধনরজ্জুর একস্থানে টান পড়িলে সর্বত্রই আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়। তাই একই বেড়াজালে জড়াইয়া ইহাদিগকে বন্দি-নিবাসের ডাঙ্গায় টানিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। গোপনে অন্ধকারে যাহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছি, আজ প্রকাশ্যে তাহারা একত্রিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাটা যে এত বৃহৎ ইহা এমনভাবে জানিবার বা অনুমান করিবার তেমন সুযোগ আমরা পূর্বে পাই নাই।

আমাদের এই সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত চার হাজার অবধি উঠিয়াছিল। আর যদি সর্বসাকুল্যে ধরা যায়, অর্থাৎ যাহাদের জেলে না আনিয়া লাল সবুজ ইত্যাদি কার্ড দিয়া মার্কা মারিয়া বাহিরে চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাটা যোগ করিলে আমরা প্রায় লাখ খানেকের কাছে গিয়া পৌঁছিতাম। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বকসা গিয়া দেখিলাম, বিপ্লবীদের প্রায় পনর-আনাই বাঙাল। বাঙলার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই সংখ্যানুপাতই লক্ষিত হইবে। বাঙলার বিপ্লবীদের প্রায় পনর-আনাই কেন পূর্ব বাঙালা হইতে আসিল, ইহার কারণ বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকের হাতে ছাড়িয়া দিলাম। আমি কেবল একটা তথ্যেরই ইঙ্গিত প্রসঙ্গত করিয়া গেলাম।

স্থান, কাল, পাত্র লইয়াই নাকি ইতিহাস। অতএব স্থান সম্বন্ধে কিছু বলা অবশ্যই উচিত। স্থানশূন্য ঘটনা আর বৃন্তহীন পুষ্প প্রায় একই গোছের ব্যাপার। স্থানটিই বোঁটার মত ঘটনা ও ইতিহাসকে ধারণ করিয়া থাকে। আর, সময় ও স্থান যে হরগৌরীর ন্যায় নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত, একথা শুধু দার্শনিকেই নয় বৈজ্ঞানিকেরাও বলিয়া থাকেন।

প্রথমেই কালের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গান্ধীজীর আইন-অমান্যের কাল সেটা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের তামাম আকাশ সেদিন আইন-অমান্যের ঘন মেঘে আবৃত। আর সে-আকাশের পূর্বদিগন্তে মাঝে মাঝে বিপ্লবী বিদ্যুতের খাড়ার ঝিলিক। এক কথায়, বাঙলার আকাশে সেদিন মেঘ-বিদ্যুৎ-ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর প্রকাশ। এই দিনই আমাদিগকে বক্সাদুর্গে আনিয়া মজুত করা হইয়াছিল।

অতঃপর স্থানের ক্ষেত্রে আসা যাইতেছে। তিনদিকে তিনটি পাহাড়, মাঝখানে এই বক্সা দুর্গ পাথরে তৈরী। পূবে ও পশ্চিমে তিনটি ঝরণা। বাঙলা ও ভূটানের সীমান্তে ঘাঁটি রক্ষার জন্য স্থান-নির্বাচন ভালোই হইয়াছে। কিন্তু মন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। দূর হইতে যে হিমালয় দেখিয়াছিলাম, সে হিমালয়

কোথায় ? শিখরের পর শিখরশ্রেণী লইয়া যে হিমালয় চোখের সামনে ধরা দিয়াছিল, সে হিমালয় আড়াল হইয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব তিন দিকের তিনটি পাহাড় দৃষ্টির পথ রোধ করিয়া দুর্লঘ্য নিষেধের তর্জনীর মত খাড়া হইয়া রহিল।

এক খোলা ছিল দক্ষিণের দিকটা। এদিকে চোখের দৃষ্টি আকাশের শেষ সীমান্ত অবধি বাধাহীন মুক্তি পাইত। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইতাম—অসীম আকাশের তলে আমাদের বাঙলাদেশ। ভালোই হইয়াছে, তিনদিকে দৃষ্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশের দিকে দৃষ্টি খোলা পাওয়া গেল। এতদিন ম্যাপে বাঙলাদেশ দেখিয়াছি, কিন্তু আজ বাঙলার শিয়রে দাঁড়াইয়া সমগ্র বাঙলাকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া সবটা একই সময় দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিগ্বলয়ে যেখানে আকাশ ও মাটি মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে বাকী বাঙলা নেপথ্যেই অপেক্ষা করিতেছে, এ বোধ চেতনায় সব সময়ই থাকিত।

দক্ষিণের বিস্তীর্ণ প্রান্তর নানা রংয়ের ছবির পর ছবি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিত। এত রকম রংয়ের খেলা সেখানে দেখিতাম যে, চোখ ক্লান্তবোধ করিবার অবসরই পাইত না। মঝে মাঝে সেখানে একটা নীলের প্রগাঢ় ছায়া এমনভাবে পড়িত যে, প্রান্তর বলিয়া চেনা যাইত না। অনেক সময় অনেকের ভুলও হইত। ভুলের একটা ঘটনা বলিতেছি।—

ভোর হইয়াছে, কিন্তু কাক ডাকিতেছে না। কারণ বকসাতে কোনদিন কাক দেখি নাই, অতএব তার ডাকও শুনি নাই। কাক ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া পাখীর অভাব ছিল না, আকাশের আলোর অভ্যর্থনা তারাই তারস্বরে করিতেছিল। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে দিন বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আকাশে সূর্য দেখা যাইতেছিল না, পূবের পাহাড়টা ভোরের সূর্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা ডিঙ্গাইয়া আসিতে প্রায় আটটা বাজাইয়া ফেলিবে।

নীচে বাথরুমে তখন বেশ ভীড়। যিনি একবার প্রবেশ করেন, সহজে বাহির হইতে চান না; দাঁতন, মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদির ফাঁকে সঙ্গীত-চর্চাও অনেকেই করিতেছিলেন। বরাবর দেখিয়াছি বাথরুমেই আমাদের গানের গলা বেশ খুলিয়া যায়, বিশেষ করিয়া শীতকালে। ভূটিয়া কুলীরা পিঠে দুধের টিন, মাছ, আলুর বস্তা ইত্যাদি লইয়া দুর্গের পশ্চিম খিড়কীর দরজার পথে বাথরুমের গা ঘেঁষিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে, রান্নাঘরের সামনে মাল নামাইয়া রাখিতেছে, বাবুরাও দাঁতন হাতে টাওয়েল কাঁধে আশেপাশে ঘুরিতেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাঁদের রুচি ও আকর্ষণ তাঁরা রান্নাঘরকে বাঁয়ে ও বাথরুমকে ডাইনে রক্ষা করিয়া আরও একটু দক্ষিণে নামিয়া গিয়া এবং ছ'নম্বর ব্যারাককে আরও নীচে সম্মুখভাগে রক্ষা করিয়া দৃষ্টির লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান আছেন—সম্মুখে বাঙলারই সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিন্তু প্রান্তর বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। দীর্ঘ বন ও তার কিনারা হইতে সুরু হওয়া বিস্তৃত ভূভাগ কি এক রকম রংয়ে একাকার হইয়া গিয়াছে। এমনকি দূরের চা-বাগানের বাড়িগুলি পর্যন্ত ঐ রংয়ে ডুব মারিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সমস্তটা ছবির উপর প্রগাঢ় একটা নীলের ছোপ লাগিয়াছে।

বীরেনদা (চাটার্জি) কিছুক্ষণ ভূটিয়াদের সঙ্গে তাঁর স্বরচিত ভূটিয়া ভাষায় অনর্গল আলাপে ভূটিয়া বাহিনীকে অবাক ও বাবু বাহিনীকে হাস্যমুখর করিয়া সবেমাত্র সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল চট্টগ্রামের অল্পবয়স্ক একটি ছেলে, নাম শশাঙ্ক। গতকালই তারা ক্যাম্পে আসিয়াছে। এই তাদের বক্সাতে প্রথম ভোর।

বীরেনদা শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"বে অফ বেঙ্গল।"

ছেলেটি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লেন?"

—"বঙ্গোপসাগর দেখা যাচ্ছে।"

—"বঙ্গোপসাগর? এখান থেকে?"

—"কম উঁচুতে তো উঠিনি। দূরবীন হলে আরও পরিষ্কার বোঝা যেত, ঢেউ পর্যন্ত দেখতে পারতে।"

শশাঙ্ক অবাক হইয়া কহিল—"বে-অব-বেঙ্গলের কোন সাইড এটা ? চাঁটগা, না মেদিনীপুর ?"

বীরেনদা কহিলেন, "না, চাঁটগার দিক নয়, এটা ডায়মণ্ডহারবারের সাইড।"

শশাঙ্ক দৌড়াইয়া উপরে উঠিয়া গেল, বন্ধুদের ডাকিয়া আনিল সাগর দেখাইবার জন্য। শশাঙ্ক চলিয়া যাইতেই আশেপাশের যাঁরা কোনমতে এতক্ষণ হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা চাপা হাসিকে বাঁধমুক্ত করিয়া দিলেন।

ক্ষিতীশ ব্যানার্জী মোটা ভুঁড়ি ও মোটা গোঁফ লইয়া আগাইয়া আসিলেন, মহারাজকে (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী) কহিলেন—"শুনলেন কথা ? জিওগ্রাফি শেখাচ্ছেন।"

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"পট্টিপাট্টা কমিটির প্রেসিডেণ্ট যে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পট্টিপাট্টা কমিটির সেক্রেটারী নৃপেন মজুমদার ও তাঁর সহযোগীদের মুখে মুখে প্রচারিত বুলেটিনে সংবাদটা ব্যারাকে ব্যারাকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। শশাঙ্ক দক্ষিণের প্রান্তরে নীল রং দেখিয়া বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় বীরেনদাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, এজন্য বেচারা কয়েকদিন লজ্জিত হইয়াই ছিল।

প্রান্তরে যে শুধু নীল রংয়েরই খেলা হইত, তা নয়। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যত রং আছে, একে একে সবগুলিই সে সারাদিনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ ভূভাগের উপর বুলাইয়া দিত। সবচেয়ে ভালো লাগিত, যখন সারি সারি ঢেউয়ের মত মেঘ স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়া আসিত নানারংয়ের পোষাক পরিয়া। সে মেঘকে দেশে থাকিতে উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বহু ঊর্ধ্বে আকাশে দেখিতে হইত, সেই মেঘেরাই আমাদের গা ঠেলিয়া চলিয়াছে, প্রথমটা তো রোমাঞ্চই লাগিয়া গিয়াছিল।

স্থান সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বকসাতে বৃষ্টির কোন

ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না, যখন খুশী তখনই নামিয়া আসিত। বর্ষাকালে তো বর্ষণের আর বিশ্রামই ছিল না, সমস্ত পাহাড় ও তার বনভূমি দিনরাত্র ধারাস্নানে ভিজিয়া সিক্ত হইত। ঝরণার চীৎকার ও গর্জন ব্যারাক হইতেই তখন স্পষ্ট শোনা যাইত। এখানে এত মেঘ, এত বর্ষণ—কতবার ভাবিয়াছি যে, এত অপব্যয় ও অপচয় এখানে, অথচ মরুভূমি পিপাসায় দগ্ধ হইয়া মরিলেও এক ফোঁটা জল পায় না। বিশ্বপ্রকৃতি যে স্বভাবে বেহিসেবী, এ সম্বন্ধে আর আমাদের মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

অধুনা পাত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে। প্রথমেই বকসা ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টের বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। যদিও মিঃ ফিনী দুর্গের কমাণ্ডাণ্ট, জাতে কিন্তু তিনি মিলিটারী নন। বাঙলা পুলিশের পদস্থ কর্মচারী, ইঁহার গুণবত্তা ও দক্ষতায় বাঙলা সরকার আস্থা রাখিতেন, বকসা ক্যাম্প খোলার ভার দিয়া তাঁকে পাঠানো হয় এবং প্রথম বছরদেড়েক মিঃ ফিনীই ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টও ছিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হউন যে, পুলিশ কর্মচারী ফিনী সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন একজন সাহেব আই সি এস দুর্গের সহকারী কমাণ্ডাণ্টরূপে। ইহা হইতেই ফিনী সাহেবের দক্ষতা অনুমান আপনারা করিয়া লইতে পারিবেন। বয়সও তেমন বেশী নহে, সাতাশ-আটাশ হইবে। এক কথায় ফিনী সাহেব ছিলেন আস্ত একটি ঘুঘু এবং তেমনি মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ।

গেটেই অর্থাৎ ক্যাম্পের অফিসেই সাহেবের একটু পরিচয় পাইয়া গেলাম। তখনও ক্যাম্পের ভিতর আমরা ঢুকিতে পারি নাই, কুলীরা মালপত্র নামাইয়া রাখিয়াছে, আমরা অফিসের ব্যারাকের বারান্দায় একে একে চৌদ্দজনই আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছি, উত্তরদিকের গেট দিয়া দুইটি বৃহদাকার বাদামী রংয়ের কুকুর আসিয়া ক্যাম্পের আস্তানার মধ্যে প্রবেশ করিল। সিপাই শান্ত্রী ও অফিসের বাবুদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। বুঝিলাম যে, কুকুরের প্রভু পশ্চাতে আসিতেছেন এবং তিনি ইহাদেরও প্রভু। ছড়ি হাতে, পাইপ মুখে,

টুপি মাথায় ফিনী সাহেব প্রবেশ করিলেন, পিছনে ফাইল বগলে সাহেবের গুর্খা বেয়ারা। সাহেব গট্‌গট করিয়া বারান্দা ধরিয়া আগাইয়া গেলেন, যাইবার পথে একবার অপাঙ্গের তির্যক দৃষ্টিতে আমাদিগকে ছুঁইয়া গেলেন। একেবারে শেষ প্রান্তে পূবের কামরায় গিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন এবং অদৃশ্য হইলেন। লোকজনের হাবভাব এবং প্রভুর গাম্ভীর্য দর্শনে আমরাও বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম। ঐ যাকে বলে ঘাবড়াইয়া যাওয়া, তাই।

শরৎবাবু ফেউয়ের মত অথবা জোঁকের মত আমার সঙ্গে লাগিয়াই থাকিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাটাটা কে?"

ভাষা শুনিয়া পুলকিত হইলাম। কহিলাম, "আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে?"

এমন সময় বেঁটে খাটো এক ভদ্রলোক এক গাল সাদাকালো দাড়ি লইয়া পাশের একটা ঘর হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন এবং আমাদের সম্মুখ দিয়া সাহেবের কামরার অভিমুখে হেলিতে দুলিতে আগাইয়া চলিলেন।

ডাকিয়া কহিলাম—"মশায়, সাহেবটি কে?"

মহাশয় থামিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তর দিলেন—"থাকলেই চিনতে পারবেন।" বলিয়া চোখটাকে কুৎ-কুৎ করিয়া নাচাইয়া লইলেন।

যেটুকু ঘাই দিলেন, তাতেই বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি গভীর জলের মৎস। এ অনুমান পরে নানাভাবেই সমর্থিত হইয়াছিল।

রসিকতাকে আমল না দিয়াই বলিলাম—"কমাণ্ডাণ্ট বুঝি?"

—"চিনতে পেরেছেন দেখছি। হাঁ, কমাণ্ডাণ্ট মিঃ ফিনী।"

—"কর্নেল?"

চোখের দৃষ্টিটাকে স্থির রাখিয়া ভদ্রলোক তাঁর ভাঙ্গা গলায় বলিলেন,—"কর্ণেল কি বলছেন, চৌদ্দ পুরুষে কেউ মিলিটারীতে যায়নি। পাদ্রীর পুত্র" বলিয়া তিনি আগাইয়া গেলেন।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কেমন বুঝছেন?"

শরৎবাবু দার্শনিক ঔদাসীন্যে জবাব দিলেন—"শালগ্রামের আবার শোয়া-বসা।" অর্থাৎ, আমাদের আবার ব্যাপার অব্যাপার কি, সর্বাবস্থাই সমান।

—"যিনি গেলেন তাঁকে কেমন মনে হোল ?"

—"কাকে ?"

—"ঐ দাড়কে।"

শরৎবাবু ভাবিতে সময় না লইয়াই সুচিন্তিত অভিমত দিলেন—"আস্ত একটি শয়তান।"

আমি সংশোধন করিয়া বলিলাম—"না, মহর্ষি ব্যক্তি।"

পরে কিন্তু ক্যাম্পে ইনি এই নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। জাতে ব্রাহ্ম, তদুপরি একগাল দাড়ি, তাই আমরা বলিতাম—মহর্ষি জগদীশচন্দ্র (কর)। স্বভাবটিও প্রায় ঋষিতুল্য ছিল। পূর্বে শিয়ালদহ পুলিশের ডেপুটি সুপার ছিলেন, বক্সাতে সাহেবের অন্যতম এসিস্ট্যাণ্ট ও দক্ষিণ হস্তরূপে তিনি আগমন করেন। ক্যাম্পে ঢুকিলে তিনি আকণ্ঠ আহার না করিয়া কোনদিন বাহির হইতেন না। খাদ্যে তাঁর আসক্তিটা নির্বিকারই ছিল, কোনদিনই তা বিকারপ্রাপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আর বৃদ্ধির কথা তো উঠেই না, কারণ আসক্তিটা তিনি তুঙ্গেই উঠাইয়া লইয়াছিলেন, উন্নতির আর অবকাশ ছিল না। ভালো মাছ, ফল, তরিতরকারী আসিলে মহর্ষি তাঁর বালক পুত্রদের পাঠাইতেন, তাহারা আমাদের ম্যানেজারের হাতে কখনও একটুকুরা চিঠি দিত, অথবা কানে কানে বক্তব্য পেশ করিত। যাইবার সময় মাছের মুড়া, পাঁঠার ঠ্যাং, ফলমূল তরিতরকারী লইয়া হৃষ্টচিত্তে কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করিত। শুধু কি কেবল খাদ্যদ্রব্য ? তেল, সাবান, জামা, কাপড় অর্থাৎ সংসারী মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কোন বস্তুতেই মহর্ষির অনাসক্তি ছিল না। ঐ একই পদ্ধতিতে তাহা তিনি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন।

বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, মহর্ষি, আমাদের গার্ডিয়ান নিস্‌পেক্টর কয়টি, বেয়ারা ইত্যাদিতে

পরিবেষ্টিত হইয়া পাদ্রীর তনয় বক্সাফোর্টের কমাণ্ডাণ্ট আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন।

পাইপটা মুখ হইতে সরাইয়া তিনি হাতে লইলেন এবং মহর্ষির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"জগদীশবাবু, এদের ভিতরে পাঠিয়ে দিন। মালপত্র পরে সার্চ করা যাবে।"

মহর্ষি কহিলেন—"এঁরা তো চোদ্দজন, কোন নম্বরে পাঠাব ?"

সাহেব জবাব দিলেন—"পাঁচ নম্বরেই পাঠিয়ে দিন।"

জেলে কোন নূতন আগন্তুক আসিলে অথবা আমরা এক জেল হইতে অন্য জেলে বদলী হইলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া দায়মুক্ত হইতেন। জেলের বন্ধুরাই কে কোথায় থাকিবে তার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ফলে কাহাকেও ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত অসুবিধায় ছটফট করিতে হইত না, আপন আপন বন্ধুদের বা চেনা লোকের পাশে থাকিবার সুযোগ সকলেই পাইত। কিন্তু এখানে দেখিতেছি বিপরীত ব্যবস্থা।

সুতরাং সবিনয় নিবেদন করিলাম, "আমাদের ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন, কে কোন নম্বরে থাকবেন, আমরাই ঠিক করে নেব।"

সাহেব বলিলেন—"নো, তা হবে না। কে কোন সীটে থাকবে, আমিই ঠিক করে দেই।"

বেশ, তাই সই,—হুজুরের যেমন আজ্ঞা। একবার ভিতরে যাই তো, তারপর আমরাও আছি, আর হুজুরের ঠিক করাও আছে। বলা বাহুল্য কিছুদিনের মধ্যে সাহেবের সমস্ত ঠিক করা ওলট পালট করিয়া আমরা আমাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলাম।

ফিনী সাহেব এর পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের লইয়া কারবার করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, এ গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ তিনি বক্সা ফোর্টের কমাণ্ডাণ্টরূপে নিজেকে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

বলিয়াই প্রথমটা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমাদের প্রথম অনুরোধের উত্তরে তিনি সাফ জবাব দিয়া বসিলেন,—"নো, তা হইবে না।"

এই নো-কে ইয়েস করিতে আমাদেরও কিছু তেলনুন খরচ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ, ফিনী সাহেবকেও ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল এবং তাঁকে আমরা ঠিক করিয়াই আনিয়াছিলাম।

ফিনী সাহেবের ঠেকিয়া শিক্ষার অভিজ্ঞতা বলিতে গেলে প্রায় ক্যাম্প খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। আরম্ভটা এইরূপ—

দিন পনর আগে বন্দীদের প্রথম দল প্রেসিডেন্সী জেল হইতে এখানে চালান হইয়া আসেন। শ্রান্ত দেহে ঘর্মাক্ত কলেবরে এই দল ফোর্টে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুপুরের রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনার কথা থাক, কিন্তু কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি সমস্যা হইতে মুক্ত করিবার জন্যও কেহ আগাইয়া আসিল না। পাহাড় ভাঙ্গিয়া সাত মাইল পথ আসিতে সকলেরই অবস্থা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বাবুরা অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কেরানী গোছের এক ভদ্রলোক বাহির হইতে আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং ভিতরের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। একজন তাঁকে ডাকিয়া থামাইলেন—"শুনুন তো।"

ভদ্রলোক ফিরিয়া তাকাইলেন, বলিলেন—"বলুন।"

—"আপনি অফিসের লোক?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। বক্তা পুনরায় বলিলেন, "আমাদের কি করবেন, সত্বর করে ফেলতে বলুন। আমরা আর দাঁড়াতে পারছিনে।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"আপনারা সাহেবের কাছে যান।"

—"কোন্ সাহেব?"

উত্তর হইল, "ফোর্টের কমাণ্ডাণ্ট।"

কমাণ্ডাণ্ট শব্দটা প্রায় কামানের আওয়াজের মত শুনাইল। ফোর্ট, কমাণ্ডাণ্ট, সিপাইশাস্ত্রী সব মিলিয়া অবস্থাটা ঘোরালো হইয়া উঠিল। দুপুরের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া সকলেই পলকের জন্য একবার বিভীষিকা দেখিয়া লইল।

ভূপতিদা (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী) সিগারেট মুখে এই প্রশ্নোত্তর নীরবে শুনিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাপুরুষটি আছেন কোন ঘরে?"

বচনের ভঙ্গী ও উচ্চারণে ভদ্রলোক ঘাড় ফিরাইলেন। অর্থাৎ "কে বট হে" —স্টাইলে বেঁটেখাটো বক্তাটিকে একবার আপাদমস্তক চাক্ষুষ সার্ভে করিয়া লইলেন। পরে চোখের ইঙ্গিতে ব্যারাকের শেষপ্রান্তের ঘরটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ যে আর্দালী বসে আছে, ঐ ঘর।"

—"এসহে, সাহেবের সঙ্গ করে আসা যাক," বলিয়া ভূপতিদা আগাইয়া চলিলেন, জন তিনেক তাঁর সঙ্গ লইলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখা গেল, লালমুখো এক সাহেব মুখে পাইপ এবং হাতে একটা লালনীল পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছেন। পায়ের শব্দে তিনি ঘাড় তুলিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিদা বলিলেন, "গুড্ আফটারনুন।"

সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে অস্ফুট 'টান্থন' কোনমতে সাহেবের কণ্ঠনালী হইতে নাসাপথে নির্গত হইল, ভালো করিয়া শোনাও গেল না। মনে হইল, চিড়বিড় করিয়া বোধ হয় একটা অশ্রাব্য গালিই উচ্চারণ করিলেন।

কোন ভদ্রতা নাই, বসিবার জন্য অনুরোধ নাই, এক কথায় সাহেবটি নির্জলা একটি চাষা। তিনখানা চেয়ার ছিল, ভূপতিদা সঙ্গীদের বলিলেন, "বসে পড়।" তিনজন তিনখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, সাহেব চুপ করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।

দেখা তাঁর আরও একটু বাকী ছিল। ভূপতিদা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন, তবু আর্দালী ডাকিয়া আর একখানি 'কুরসী' আনিবার কথা পর্যন্ত তিনি বলিলেন না। তখন ভূপতি মজুমদার সাহেবের টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং বাম পায়ের উপর দক্ষিণ পদ তুলিয়া হাফ-পদ্মাসন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মিনিটখানেকের মধ্যে এইটুকু ঘটিয়া গেল। সাহেব এতটার জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না। লালমুখ আরও লাল হইল, চোখ হইতে রোষাগ্নি নির্গত হইল, নাসারন্ধ্র বুলডগের মত স্ফীত হইল এবং মুখ হইতে পাইপটা ডান হাতে স্থান লাভ করিল।

অতঃপর সাহেব আওয়াজ ছাড়িলেন, "টেবিলে বসলে যে ?"

পদ্মাসনে আসীন ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "কারণ ঘরে বসবার মত আর চেয়ার নেই।"

—"তাই বলে তুমি টেবিলে উঠে বসবে ?"

উত্তর হইল, "তবে কি তোমাকে খুশী করবার জন্য ঘোড়ার মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকব ?"

সাহেবের ধৈর্য এতক্ষণে চ্যুত হইল। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া চাপাকণ্ঠে গর্জন করিলেন,—"জান, আমি ফোর্টের কমাণ্ডাণ্ট ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর হইল—"Oh you are the little Czar of this Buxa Fort ?" যেন সংবাদ শুনিয়া ভূপতিদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া গিয়াছেন, এমনি গদগদ কণ্ঠ।

উত্তর শুনিয়া সাহেব প্রায় ক্যাবলার মত হইয়া গেলেন। তাঁকে সামলাইয়া লইবার সুযোগ না দিয়াই ভূপতিদা কহিলেন—"লুক হিয়ার, শোন, তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট করবার মত মেজাজ বা অবস্থা কোনটাই আপাততঃ আমাদের নেই। আমাদের এখন ভেতরে পাঠিয়ে দেও। আমরা অতিশয় শ্রান্ত, আমাদের বিশ্রাম দরকার। তোমার আইনকানুনের হাঙ্গামাগুলো তুমি পরে কর, ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে পরে বোঝাপড়াও তুমি করতে পার। কিন্তু এখন ভালো মানুষের মত আমাদের ভিতরে পাঠাবার কষ্টটুকু তুমি স্বীকার কর।"

একটির পর একটি এই রকমের এবং আরও অন্যান্য রকমের অনেকগুলি ঢেউয়ের ধাক্কায় বকসা ফোর্টের কমাণ্ডাণ্ট সাহেবের মেজাজ, ঔদ্ধত্য ও বজ্জাতির রুক্ষ কাঠিন্যটুকু মসৃণ করিয়া লওয়ার পর তবে ক্যাম্পের বন্দিদের সঙ্গে কমাণ্ডাণ্টের একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকজনের সঙ্গে তো তাঁর বন্ধুত্ব পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল!

নিজের কথা বলা নাকি রুচি-বিগর্হিত।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, আমার কথা আমি যদি না বলি, তবে এমন কোন বান্ধব আছে যে, আমাদের মত রামা-শ্যামাদের কথা বলিবার জন্য আগাইয়া আসিবে? বেশ, তর্কের খাতিরে ধরিয়া নিলাম যে, আমাদের ঢাক পিটিবার মত লোকের অভাব হইবে না। তবে আবার জিজ্ঞাসা করি যে, আমার কথা আমি যেমন মমতা ও আন্তরিকতা লইয়া বলিব, অর্থাৎ আমার জন্য আমার যে-মায়া ও পক্ষপাতিত্ব আছে, তাহা অপরের কাছে প্রত্যাশা করা যায় কি? যায় না। অতএব, নিজের কথা নিজেরই বলিতে হয়।

ব্যাকরণেও এই ব্যবহারের সমর্থন আছে। পুরুষ-বিচারে ব্যাকরণে আমাকে মানে নিজেকে দেওয়া হইয়াছে 'উত্তম পুরুষ'-এর আসন, সম্মুখে উপস্থিত আছেন বলিয়াই তোমাদের মানে আপনাদের দেওয়া হইয়াছে 'মধ্যম পুরুষ'-এর আসন, আর বাদবাকী যাবতীয়কে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে একেবারে থার্ড ক্লাশে অর্থাৎ "তৃতীয় পুরুষ"-এর পংক্তিতে। এখন, পুরুষ বা পাত্র সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যদি নিজেকেই বাদ্ দিতে হয়, তবে যে পুরুষের মধ্যে সেরা পুরুষ সেই "উত্তম পুরুষ" টিই বাদ পড়িয়া যায়। ইহারই অন্য নাম শিবহীন যজ্ঞ।

শুধু ব্যাকরণ কেন? ধর্মশাস্ত্রতো আদর্শ আচরণের অভিধান ও বিধান একাধারে। গীতা ধর্মশাস্ত্র, ইহা নিশ্চয় আপনারা মানিয়া থাকেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন? তিনি খোলাখুলিই বলিয়াছেন, "শোন অর্জুন!

পৃথিবীতে প্রত্যেকেই নিজেকে 'আমি' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আসলে কিন্তু প্রত্যেক ব্যাটাই এক একটি নকল আমি। সৃষ্টিতে আসল 'আমি' হইলাম একমাত্র আমি। আমি তোমাদের ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ নই, আমি একেবারে পুরুষোত্তম।"

গীতা ছাড়িয়া উপনিষদে আসুন, দেখিতে পাইবেন যে, ঋষিরা গীতার বক্তাকেও প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কোন চক্ষুলজ্জারই ধার না ধারিয়া ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন—শৃন্বন্তু, অহং ব্রহ্মাস্মি। অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর' বলিয়া 'আমিকে' একেবারে তুঙ্গে বা তুরীয়ে তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

এখন ঈশ্বরের ব্যবহারের খবর লওয়া যাক। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,—"এই সৃষ্টি আমার, আমিই ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি এবং আমিই ইহাকে বিনাশ করি।" অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁর অহঙ্কার তৃপ্ত হইয়াছে, তাই তিনি সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করিয়া আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন—"আমি ঈশ্বর, আমার ঐশ্বর্য দেখ।"

দেখা গেল, এই আমির আত্মশ্লাঘা হইতে কেহই রেহাই পান নাই। খোঁজ লইলেই জানিতে পারিবেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি যত বড়, তিনি তত বড় আমি। জগৎটাই তো এই আমির আত্ম-প্রচারের একটি প্রকাণ্ড কীর্তনশালা ও আসর। এই আসরে মহাজন যেন গত সঃ পন্থা বলিয়া আমরাও যদি গলা খুলিয়া আমাদের কথা খানিকটা বলিয়া যাই, তাহাতে মহাভারত নিশ্চয় অশুদ্ধ হইতে পারে না।

আমার নিজের কথা একটি স্থানে বলার আবশ্যক হইবে বলিয়াই এত বড় একটা ভূমিকা ফাঁদিয়া লইয়াছি।—

কমাণ্ডাণ্ট ফিনী সাহেবকে কিছুদিনের মধ্যেই স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা একরূপ চলনসই করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু নিজেদের চলনসই করিয়া লইতে বেশ খানিকটা সময় আমাদের লাগিয়াছিল।

অবস্থা স্বাভাবিক হইবার অন্তরায় ছিল সেই চিরন্তন কারণ, অর্থাৎ

দলাদলি। বক্সার বিপ্লবীদের মোটামুটি তিনটি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যুগান্তর, অনুশীলন, আর বাদবাকী। এই বাদবাকী বা তৃতীয় দলের অধিকাংশই মূলতঃ পূর্বোক্ত দুইটি দলেরই লোক ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িবার বছরখানেক পূর্বে মতবিরোধ হেতু যুগান্তর ও অনুশীলন ঘাটি হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া আসেন। বক্সাক্যাম্পে এই দলটিকে বলা হইত থার্ড পার্টি। ক্যাম্পের পরিচালনার জন্য বন্দীদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কি হইবে, ইহাই ছিল সমস্যা। ক্যাম্পের কর্তৃত্ব কোন পক্ষের হাতে থাকিবে, এই ভাবেও ব্যাপারটাকে দেখা চলে। যুগান্তর ও অনুশীলনের কলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় বনেদী বলিলেই চলে। দুইয়ের গোপন দড়ি টানাটানিতে ক্যাম্পের ম্যানেজারের দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষের জন চারেকের উপর গিয়া সাময়িক-ভাবে ন্যস্ত হয়। তখন পর্যন্ত একত্রই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ভাষায়—তখন পর্যন্ত একটি 'চৌকা' বা 'কিচেন' ছিল। বড় দুই পক্ষের এই ব্যবস্থা মনঃপুত ছিল না, আর তৃতীয় পক্ষ মাঝে থাকিয়া মজা দেখিতেছিল। এই সময়ে সেই ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ আমি বক্সাতে আবির্ভূত হই।

নেতাদের প্রায় সকলকেই আমি চিনিতাম। বন্ধুদের নিকট ব্যাপারটা শুনিয়া লইলাম। তিনপক্ষের কর্তাদের মধ্যে জোর শলা পরামর্শ চলিতে লাগিল। আমি বন্ধুদের পরামর্শ দিলাম হাঁড়ি ভাগ করিয়া ফেল। পরামর্শটি অবশেষে তাঁহারাও সমীচীন বোধ করিলেন। ফলে, ক্যাম্পে সঙ্কট দেখা দিল এবং গোপন দলাদলির ঠেলায় রান্নাঘরে একদিন উনুন জ্বলিল না। বন্দীরা উপবাসেই রহিলেন। টিফিনের যে রুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদি ছিল, তাহা লুঠ হইয়া গেল। এই অবস্থায় ক্যাম্পের প্রথম সাধারণ সভা আহুত হইল।

যাহা জুটিল খাইয়া লইয়া দিবানিদ্রা দিলাম। যখন জাগিলাম, তখন ঘরশূন্য। বুঝিলাম, সকলে সভায় গিয়াছেন। এমন উত্তেজনা-পূর্ণ সভাটির প্রথম হইতেই যোগ দিতে পারিলাম না ভাবিয়া একটা লোকসান বা ক্ষতির ব্যথাই মনে মনে বোধ করিলাম।

সভা বসিয়াছিল তিন নম্বরের ‘এ’ ব্যারাকে। বারান্দা ধরিয়া আগাইতে আগাইতে দেখিলাম যে, ঘরটি একেবারে ঠাসা হইয়া আছে। কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি না, তখনও বুঝিতে পারিলাম না। যেখানে সভাপতির আসন থাকিবার কথা, সেই দরজা পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম এবং খোলা দরজা দিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম,—কোথায় গিয়া এখন স্থান লই বা দাঁড়াই। কিভাবে ঢুকিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারিব না, তবে প্রায় সকলের দৃষ্টিই আমার উপর যুগপৎ নিপতিত হইয়াছে, ইহা টের পাইলাম।

ডাহিনে তাকাইয়া দেখিলাম, কয়েকখানা লোহার খাটিয়া একত্রিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। তদুপরি নেতারা স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। মধুদা (সুরেন ঘোষ), প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলি), মহারাজ (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী), ভূপেনবাবু (দত্ত), অরুণবাবু (গুহ), যতীনবাবু (ভট্টাচার্য), জীবনবাবু (চ্যাটার্জী) প্রমুখ নেতৃবর্গ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদের পাশেই একটি ডেক-চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম আমার বন্ধুবর পঞ্চাননবাবুকে (চক্রবর্তী) এবং তাঁহারই পাশে একটি চেয়ারে আসন লইয়া অবস্থিত ভূপতিদা (মজুমদার)। চক্ষু ঘুরাইয়া একটু বাঁয়ে আসিতেই নজরে পড়িল যে বিরাট দেহ লইয়া রবিবাবু (সেন) চেয়ারে উপবিষ্ট, তাঁর পাশের চেয়ারে দীর্ঘকায় ও দীর্ঘনাসা রেজাক সাহেব এবং তাঁর পাশের চেয়ারে কালী সেন মহাশয়। ঘরে ঢুকিয়া এটুকু দেখিয়া লইতে আমার দু-তিন সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে নাই। দরজার ঠিক বাঁ পাশেই দেয়াল ঘেঁষিয়া সভাপতির চেয়ার, কিন্তু শূন্য।

এমন সময় অর্থাৎ আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া থামিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূপতিদার গলা শুনিতে পাইলাম, তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বলিতেছেন—“আমি প্রস্তাব করি যে, আজকের সভায় অমলেন্দু দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।”

মধুদার পাশেই প্রতুলবাবু উপবিষ্ট ছিলেন, উপবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি জানাইলেন—“আমি এ-প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।”

অমলেন্দু নামটা আমার, কাজেই আমাকেই যে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কেন? ব্যাপার কি? ইত্যাদি একদল প্রশ্ন মগজের মধ্যে কিলবিল করিয়া উঠিল। বাঙলার বিপ্লবীদের যাঁহারা নেতা চালক ও বাহক তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সভায় উপস্থিত রহিয়াছেন, তত্রাচ আমার সভাপতি হইতে হইবে কেন? আজ হয়তো মতবিরোধ রহিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ ষোল সতের বছর যাঁহাদের দ্বারা চালিত হইয়াছি, তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে আমি সভাপতি? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগিতে ও আমার সিদ্ধান্ত করিতে আমি বড় জোর পাঁচ ছয় সেকেণ্ড সময় লইয়াছিলাম।

তারপর গিয়া সভাপতির চেয়ারে স্থান লইলাম, অর্থাৎ তাহা অলঙ্কৃত করিলাম। আমি যেভাবে ঢুকিয়াছি এবং সভাপতির আসনে গিয়া বসিয়াছি, তাহাতে মনে হইতে পারিত যে, সভাপতির আসন আমারই জন্য ঠিক করা ছিল, আমি সভায় প্রবেশ করিয়া তাই সেই নির্দিষ্ট চেয়ারে সোজা গিয়া আসন লইয়াছি।

আমি আসিয়াছিলাম মজা দেখিতে, শেষে আমাকেই হইতে হইল সেই সভার সভাপতি। বরাতে যদি পাওয়ানা থাকে, তাহা আটকায় কার সাধ্য। হিন্দীতে আছে, তিনি যখন দেতা হ্যায়, তখন নাকি ছপ্পর ফুঁড়কেই দেতা হ্যায়।

ব্যাপারটা এই, মধুদা, প্রতুলবাবু, মহারাজ প্রমুখ নেতাদের নাম একে একে প্রস্তাব করা হয় এবং একে একে সকলেই সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এই রকম মারাত্মক সভার মারাত্মক পরিণতির দায়িত্ব লইতে কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময়ে মূর্তিমান সেই উত্তম পুরুষের প্রবেশ এবং সভার সিংহাসন লাভ। ভূপতিদাই শ্বেত-হস্তীর কাজ করিলেন, প্রস্তাবের শুঁড়ে তুলিয়া উত্তম পুরুষটিকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। চেয়ারে বসিয়া স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে নিজেকে মনে মনে কবিতা শুনাইলাম—কি কুক্ষণে শূর্পনখা আইলি এ ঘোর দন্তক অরণ্যে?

আমার চেহারাটার একটু বর্ণনা দেই। এতক্ষণই যখন ধৈর্য ধরিয়াছেন, তখন বাকীটুকু বোঝার উপর শাকের আঁটি বই তো নয়। পরিধানে আমার লুঙ্গি, শুনিয়া হাস্য করিবেন না। কারণ লুঙ্গির পরিচয় দিলে ঈর্ষার উদ্রেক হইতে পরে। টেনবাবু সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আগমন করিয়াছেন, সঙ্গে আনিয়াছেন অতি দামী একজোড়া সিল্কের লুঙ্গি। তার একখানা হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং তাহাই ছিল আমার পরিধানে। গায়ে? বলিতেছি। গায়ে ছিল একটি হাফসার্ট। কিসের? লুঙ্গির সঙ্গে আভিজাত্যে পাল্লা দিয়া সেটি ছিল বহরমপুরী মটকার। পরিচ্ছদের পরে আমার চেহারার অর্থাৎ রূপের বর্ণনা চাহিবেন? ওটা আমাকে মাপ করিতে হইবে। নিজের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া লজ্জায় হয়তো আমি কমাইয়া বলিতে পারি। সে বিপদে আমি নিমজ্জিত হইতে রাজী নহি। তবে আপনাদের অনুমানের জন্য একটু সাহায্য করিতেছি। একমাথা চুল, ব্যাকব্রাশ করা। আর গাল-ভাঙ্গা বদন চন্দ্রিমা। সর্বশেষে, মোটা নাসিকার দুই পাশের চোখ দুইটি একেবারে জবা ফুলের মত লাল। অপরিচিত লোকের প্রথমেই আমার সম্বন্ধে ধারণা হইত যে, আমি মদ্যপ, নয় তো আমি বেশ প্রচুর পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকি। আসলে আমার চোখের উহাই ছিল স্বাভাবিক বর্ণ, নেশায় বা ক্রোধে উহা রক্তরঞ্জিত হয় নাই। চোখের এই অস্বাভাবিক রক্তিমার জন্য ছোটকাল হইতেই নানাজনের নানা কথা শুনিয়া বেশ খানিকটা মনমরা হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যেদিন মহাভারতে পাঠ করিলাম যে, কৃষ্ণার্জুন উভয়েরই চোখের রং লাল ছিল, সেদিন জীবনে যে কী আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা আর কহতব্য নহে।—এহেন রূপ লইয়াই উত্তম পুরুষ সভাপতির আসন দখল করিয়া প্রায় ঘণ্টা তিনেক সভার পতিত্ব পালন করিয়াছিল।

সভার ফলাফল যাহা হইবার তাহাই হইল। হট্টগোলের মধ্যে সভাটি শেষ হইতে পাইত; কিন্তু সভাপতি মহাশয় সেদিন এমন কৃতিত্বের পরিচয়

দিয়াছিলেন যে, হট্টগোল বাদ দিয়া হট্টগোলের সব ফলটুকুই পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক তো চটিয়া গিয়াই বলিলেন—"ওরকম ভাবে আপনি চোক পাকাবেন না।" সভাপতি উত্তর দিলেন—"Sit down। বসে পড়ুন, আমার চোখের দৃষ্টিই ওরকম।" আর এক ব্যক্তি হুঙ্কার দিলেন—"সভাপতির বিরুদ্ধে সেন্সর মোশন আনতে চাই।" সভাপতি উত্তর দিলেন—"আপনাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে, এখন বসে পড়ুন।" এই সময়ে অনুশীলন পার্টির অন্যতম নেতা রবিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি বলি কি—" তিনি শেষ করিবার সুযোগ পাইলেন না, সভাপতি বলিলেন—"Please sit down. আপনি কি বলেন পরে শোনা যাইবে।" রবিবাবুকে বসিতে বলিবার কারণ এই যে, তাঁর পূর্বে কালী সেন ও আব্দুর রেজাক খান বহুক্ষণ যাবত দণ্ডায়মান ছিলেন কিছু বলিবার জন্য। রবিবাবুকে বসাইয়া দিতেই এক কোণা হইতে মন্তব্য আসিল—"ব্যাটা মুসলিনী।" শুনিয়া উত্তম পুরুষটি বড়ই পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইল, কারণ তুলনাটার মধ্যে সভাপতি আত্মমর্যাদায় যেন আরামের সুড়সুড়িই বোধ করিলেন। আধ ঘণ্টা এইভাবে দক্ষযজ্ঞ চলিল—একদিকে সভাপতি, অন্যদিকে সভা মানে সদস্যগণ।

সভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতঃপর সভাপতি যাহা বলিলেন, তার সার মর্ম এই: নিরর্থক আলোচনার প্রয়োজন নাই। নেতৃবর্গ যদি নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া মীমাংসায় উপনীত হন, তবে ভালো। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই সভা ডাকার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। অতএব, নেতৃবর্গের নিকট হইতে এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য শোনা যাইতে পারে, অবশ্য বক্তব্য যদি থাকে।

নেতৃবর্গ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। সুরেনবাবু, প্রতুলবাবু, পঞ্চাননবাবু প্রভৃতিকে একে একে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা বুদ্ধিমান, তাই নীরবেই রহিয়া গেলেন। সভা শান্ত, অর্থাৎ দম বন্ধ করিয়া সদস্যগণ

অধুনা কুম্ভকের সীমানায় আসিয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে সভার নীরবতা ভঙ্গ করিরা রবিবাবু আবার দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন—

—"সভাপতি মহাশয় ?"

—"বলুন।"

—"যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁহারা বাদে অপর কেহ যদি ভার নিতে প্রস্তুত হয় ?"

—"তেমন কেহ আছেন কি ?"

—"আমি আছি," বলিয়া রবিবাবুর পিছনে বেঁটে খাটো একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, দক্ষিণ কলিকাতার বিভূতি গাঙ্গুলী, মাষ্টার বা ম্যাষ্টর বলিয়া তিনি ক্যাম্পে পরিচিত। এতটুকু যন্ত্র হইতে এত শব্দ হয়, ইহার মত মানুষকে দেখিয়াই কবি লিখিতে পারিয়াছিলেন।

—"আপনি আছেন, তা ঠিক। কিন্তু কি অর্থে আছেন ?" সভাপতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল।

মাষ্টার একটু তোতলা, তাই উত্তরের আরম্ভতেই আটকাইয়া গেলেন, বাধা হইতে জিভটাকে মুক্ত করিয়া শেষে কহিলেন, "আপনার প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

—"প্রশ্নটি একটু কঠিন বটে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, বর্তমান সমস্যায় বা অবস্থায় আপনি কি করতে চাইছেন ?"

—"আমি ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির ভার নিতে রাজি আছি।"

—"একা আপনি ?"

প্রশ্নটির মধ্যে কি ছিল জানি না, সভায় মৃদু হাসি খেলিয়া গেল, যেন ধানের ক্ষেতে ঢেউ লাগিয়াছে।

মাষ্টার বলিলেন, "আমি আর আমার কয়েক বন্ধু।"

—"বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাঁদের মত নিয়েছেন ?"

—"না, এখন পর্যন্ত নেইনি। তাঁরা আমি বল্লেই রাজী হবেন।"

সভাপতি বলিলেন, "আপনি বসুন।"

ইহাতে একদল ঘোর কলরব করিয়া উঠিলেন। সভা শান্ত করিতে সভাপতি পূর্ব্ববৎ পদ্ধতি প্রয়োগ করিলেন, পূর্ব্ববৎ 'ব্যাটা মুসোলিনী' মন্তব্য পূর্বাপেক্ষা একটু উচ্চ গলায় নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু সভা শান্ত হইতে বাধ্য হইল।

সভাপতি বলিলেন—"মধুদা, আপনি ক্যাম্পের ভার নিতে রাজী আছেন?"

তিনি বলিলেন—"না, সকলের ভার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

—"প্রতুলবাবু, আপনি?"

তিনি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন —"না।"

—"পঞ্চানন বাবু, আপনি?"

তিনি আরও সংক্ষিপ্ত হইলেন, অর্থাৎ বাক্যের সাহায্য না লইয়া ডেক চেয়ারে বসিয়াই মাথা নাড়িয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি ঘোষণা করিলেন,—"সভার কাজ শেষ হইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইল।" বলিয়া চেয়ার ত্যাগ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা তুমুল হৈ-চৈ উঠিল। তার বারো-আনা বক্তব্য ও মন্তব্য সভাপতি ও তাঁর আচরণ সম্বন্ধে। একমাথা চুল, ভাঙ্গা গাল, রক্তচক্ষু বর্মী লুঙ্গি ও মটকার হাফসার্ট লইয়া স্যাণ্ডাল পায়ে উত্তম-পুরুষ মানে আমি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম। গুরুজনদের দৃষ্টি আড়াল করিয়া সিগারেট ধরাইয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে বারান্দা ধরিয়া আগাইয়া গেলাম এবং পাশের তিন নম্বর 'বি' ব্যারাকের প্রথম দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া নিজের সীটে গিয়া আসন লইলাম। জানি, এখনই মধুলোভী মৌমাছির দল আমার সন্ধানে আসিল বলিয়া।

ভিড় ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই, ভূপতিদা আমার সীটে আসিয়া এমন-ভাবে আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন যে, আমি যেন একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি। সেনাপতি নির্বাচনের সমস্ত প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ

করিয়া লইয়া ভূপতিদা এক সময়ে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা দিলেন মধুদা। তিনি আসিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া গেলেন। সর্বশেষে আসিলেন স্বয়ং রবিবাবু। তিনি ঘোরপ্যাচের ধার ধারেন না, যাহা বলেন তাহা স্পষ্ট, শ্রোতা বা বক্তা কারো ভুল বুঝিবার বা বুঝাইবার অবকাশ থাকে না। বলিলেন—"আমাকে বসিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তবু তোমার সভাপতিত্বের প্রশংসা না করে পারলাম না।" বলিয়া প্রশংসাটি পিঠে চাপড় দিয়া হাতে হাতে তখনই বুঝাইয়া দিলেন, বিরাট পুরুষের বিরাট থাবায় আমার ক্ষীণকায় দেহের মেরুদণ্ডটি মড় মড় করিয়া উঠিল। দমবন্ধ করিয়া ফাঁড়াটা কোন মতে সে-যাত্রা কাটাইয়া দিলাম।

মোট কথা, আমার কাছে এতটা বা ইহা প্রত্যাশা করে নাই বলিয়াই সেদিন নেতৃবর্গ আমাকে একটু প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার স্বভাব ও শক্তি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ছিলাম, আমার সীমা আমি জানিতাম, তাই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া যাইতে আমার একটুও সময় লাগিল না। নেতা বা চালক আমি নই, ইহা আমি জানিতাম, তাই প্রশংসা বা লোভে আমাকে অব্যাপারে কোনদিন আকৃষ্ট হইতে হয় নাই সেবারকার দীর্ঘ আট বৎসর জেল জীবনের মধ্যে।

পরের দিন সূর্য যথানিয়মে উদিত হইল। ফিণী সাহেব অফিসে আসিতেই ভূপতিদা জন ষাটের একটি তালিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং এই ষাট জনের প্রতিনিধি হিসাবে একটা আলাদা চৌকা বা রান্নাঘর আদায় করিলেন। ইহাই হইল দুই নম্বর চৌকা বা যুগান্তর-কিচেন। ভূপতিদা হইলেন তাহার প্রথম ম্যানেজার।

অতঃপর পঞ্চাননবাবু ঐ একই পদ্ধতিতে ফিণী সাহেবের নিকট জন পঞ্চাশেকের জন্য একটি রান্নাঘর আদায় করিলেন, ইহাই হইল তিন নম্বর চৌকা বা থার্ডপার্টি-কিচেন।

বাদ বাকী জন পঁয়তাল্লিশের ভার লইয়া এক নম্বর রান্নাঘর, ইহাই হইল অনুশীলন-কিচেন, ক্ষিতীশ ব্যানার্জী হইলেন ইহার প্রথম ম্যানেজার। হাঁড়ি ভাগ সুসম্পন্ন হইল।

দেশবিভাগ অর্থাৎ হাঁড়িভাগের পরবর্তী প্রতিক্রিয়াটিও সুসম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইল না, অর্থাৎ লোক বিনিময়। প্রত্যেক কিচেনের বা দলের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাক বণ্টন হইল। লোহার খাটিয়া, বিছানাপত্তর, টেবিল-চেয়ার লইয়া যে যাঁহার নির্দিষ্ট ব্যারাকে আসিয়া স্থান লইলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ক্যাম্পে আভ্যন্তরিক বিলিব্যবস্থা এত পাকাপোক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, কে বলিবে যে হাঁড়ি ভাগ হইয়াছে। গানবাজনা, খেলাধূলা, আলাপ-আলোচনা, থিয়েটার যাত্রা ইত্যাদিতে ক্যাম্পটি জমজমাট হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে এমন বন্ধুত্বও বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল, দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইহারা বিভিন্ন পার্টির মেম্বর। সে-বন্ধুত্ব কয়েকটি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বেই পরিণত হইয়াছে। হাঁড়ি ভাগ করিয়া খারাপ হয় নাই, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল এবং হাঁড়িভাগে উত্তম পুরুষের যে অংশটুকু ছিল, তার জন্য আর আমার লজ্জিত হইবার কোন কারণই রহিল না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সাধু আগে কোঠি পাকড়াও, তারপর সহরের আড়ং দেখিতে বাহির হও। অর্থাৎ বাসা ঠিক করিয়া তারপর অন্য কাজে হাত দিতে তিনি বলিয়াছিলেন। সেই উপদেশটাই এ-ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম। যার যেথা স্থান সেটুকু আগে ঠিক করিতে ও দিতে হয়। তারপর স্বস্থানে বা স্বাভাবিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের মনও হাত-পা মেলিবার অবকাশ পায়। নতুবা কেবল সংঘর্ষ, কেবল কলহ ইত্যাদিতে জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। হাঁড়িভাগ করিয়া বক্সার বন্দিরা স্বাভাবিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ক্যাম্পের বন্দিদের নিজেদের মধ্যেকার প্রাত্যহিক জীবনে শান্তি ও আনন্দও অব্যাহত হইল।

প্রকাণ্ড গেটটা খুলিয়া ক্যাম্পে ঢুকিলে প্রথমেই তিন নম্বর ব্যারাক। ব্যারাকের সামনেই দক্ষিণে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, পাহাড় চাঁছিয়া সমতলক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছে। এখানেই ভোরে সন্ধ্যায় বন্দীদের হাঁটাচলা, আড্ডা, ব্যাডমিণ্টন, ভলি, প্যারেড, পতাকা-অভিবাদন ইত্যাদি চলিত। এই ছোট্ট ও প্রশস্ত স্থানটির পূর্ব সীমান্তে একটি প্রকাণ্ড ঘর, কাঠের প্লাটফর্মের উপর অবস্থিত। ইহাই ছিল আমাদের কমনরুম। পশ্চিমের একদিক হইতে পাথর কাটিয়া বানানো সিঁড়ী বা রাস্তা নামিয়া গিয়াছে। হাত পনর নীচে নামিলে ডাহিনে চার নম্বরের দুইটি ব্যারাক। মাঠটির দক্ষিণ প্রান্ত হইতেও অনুরূপ আর একটি রাস্তা নামিয়া বাঁয়ে হাসপাতাল ও ডাহিনে ছয়-নম্বরের ব্যারাক দুইটির সম্মুখে গিয়া পৌছিয়াছে। পৌছিয়াই শেষ হয় নাই, অতঃপর ডাহিনে মোড় লইয়া পশ্চিম প্রান্ত হইতে আগত রাস্তাটির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের পশ্চিমভাগে পাঁচনম্বর ব্যারাকের দুইটি ঘর এবং পূর্বভাগের বিস্তৃত স্থানে তিন চৌকার রান্নাঘর, খাবার ঘর, টিফিন ঘর, গুদাম ঘর ইত্যাদি।

ক্যাম্পের চৌহদ্দীর এখানেই শেষ নহে। হাসপাতাল ও ছয় নম্বর ব্যারাকের মধ্য দিয়া রাস্তাটা দক্ষিণে আরও নামিয়া গিয়া একটি বাগানে শেষ হইয়াছে, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল আমবাগান। তারপর গভীর খাদ, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত, ছাড়িয়া দিলেও মানুষের পক্ষে এ-পথে পলায়ন সম্ভব নহে। এইস্থানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণে বাঙলার প্রান্তর, পশ্চিমে হিমালয়ের গিরিশিখরের অভ্যন্তরে সূর্যের অস্তগমন ইত্যাদি দৃশ্যগুলি দেখিবার সবচেয়ে বেশী সুবিধা পাওয়া যাইত।

উপরে তিননম্বর ব্যারাকের সম্মুখভাগের এই ছোট্ট মাঠের দক্ষিণ সীমানায় দুইটি প্রকাণ্ড পোস্ট, তাহার মাথায় তেমনি দুইটা প্রকাণ্ড পেট্রোম্যাক্স সন্ধ্যার সময় জ্বালাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং সারারাত্র সমস্ত স্থানটুকু

তাহাতে আলোকিত থাকিত। অন্যান্য স্থানেও আলোর অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ভোর হইলে বাতিওয়ালা ছেলে তিনটি আসিয়া এগুলি নামাইয়া লইয়া যাইত।

এই ক্ষেত্রটুকুর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেতে একটি রবার বৃক্ষ। বৃক্ষটিকে বটগাছ বলিয়াই জানিয়াছিলাম, কিন্তু জ্ঞানী লোকের অভাব ছিল না, তাঁহারা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রয়োগ করিলে চক্ষু খুলিয়া গেল এবং জানিতে পারিলাম যে, এ বটবৃক্ষ নহে, রবার গাছ। কি ঠকানই এতদিন ঠকাইয়াছে, আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বটবংশের মর্যাদা আদায় করিয়া লইয়াছে।

এই গাছটার সঙ্গে আমাদের অনেকগুলি দিনরাত্রির বহু স্মৃতি আলো-অন্ধকারের মত জড়াইয়া আছে। এই গাছেই টেনাবাবুর প্রকাণ্ড মোরগ দুইটি ভোরে খাঁচা খোলা পাইয়াই উড়িয়া আসিয়া চড়িয়া বসিত! একটি উঁচু ডালে রঙীন ও দীর্ঘ লেজ ঝুলাইয়া সারাদিনমান কাটাইয়া দিত, সন্ধ্যায় অনেক সাধ্যসাধনা ও কৌশলের আশ্রয় লইয়া তবে তাহাদিকে নামাইয়া আনিতে হইত। রঙীন মোরগ দুইটিকে গাছের ডালে ময়ূর বলিয়া ভ্রম হইত। এ গাছ হইতে একদিন জ্যোছনারাত্রে সতীশবাবুর প্রায় ঘাড়ের উপর ভূত লাফাইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

নীচে পাঁচনম্বর ব্যারাকে সন্ধ্যার পরে জলসাগোছের একটা অনুষ্ঠান চলিতেছিল, সকলেই সেখানে গিয়া জমায়েৎ হইয়াছেন। রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমা। সারা আকাশ জ্যোছনায় ভাসিয়া গিয়াছে, অথচ আমাদের আকাশে চাঁদ ছিল না, কারণ পূবের পাহাড়টা তাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুবের পাহাড়টার মাথা আলোকিত হইয়া উঠিল, বুঝা গেল চাঁদ অনেকটা আগাইয়াছে। বন্ধুবর কালীপদ (গুহরায়) এতটা ধৈর্য ধরিবার জন্য রাজী ছিলেন না। পাহাড়ের ওধারে যে-চাঁদ আসিয়া গিয়াছে, তাহাকে আগাইয়া অভ্যর্থনা করিবার কবি-প্রেরণা তাঁকে পাইয়া বসিল। কেডস্ পায়েই তিনি রবার গাছে চড়িয়া বসিলেন। হাত চৌদ্দ-পনর উঁচু ডালকে ঘোড়া বানাইয়া তিনি উপবিষ্ট হইলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপেক্ষায় ফল ফলিল, পাহাড়ের ঠিক চূড়ায় আসিয়া শশিকলা নয় একেবারে পূর্ণচন্দ্র স্থান লইল। কবিবর উপবিষ্ট আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হয়তো উদ্দেশ্য ছিল চাঁদকে দুইহাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার। কিন্তু অভ্যর্থনা আর জানানো হইল না। একে কবির শরীরে ছিল ওজন, দুইয়ে ছিল মাধ্যাকর্ষণ, তৃতীয়ে ছিল না পূর্বপুরুষদের মানে শাখা-মৃগদের দক্ষতা, তাই গাছের শাখাকে পায়ের তলার মাটির পৃথিবীর মত ব্যবহার করা গেল না। ফলে, ডাল ভাঙ্গিল এবং সেই ভাঙ্গা ডালের ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি সশব্দে ও সবেগে নীচে নামিয়া আসিলেন।

ঘটনার এমনি চক্রান্ত, সতীশবাবু ঠিক তখনই নীচের ব্যারাক হইতে পাহাড় ভাঙ্গিয়া উপরে গাছের তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পড়বি তো পড় একেবারে তার সম্মুখে। স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন ছিল, তার মধ্যেই যতটুকু দেখিবার সতীশবাবু দেখিয়া লইলেন। এই আচমকা দর্শন ও ঘটনার ধাক্কায় ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করিলেন, মুখ হইতে গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজও নির্গত হইতে লাগিল এবং তাঁর সমস্ত শরীরটায় বংশপত্রের কম্পন সঞ্চারিত হইল।

এদিকে কালিপদবাবু ডাল ভাঙ্গিয়া ডালশুদ্ধ নীচে নামিয়া দুই হাত থাবার মত মাটিতে পাতিয়া ধাক্কাটা সামলাইতেছিলেন। ভাগ্যবশতঃ তিনি অক্ষতই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সতীশবাবুর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

ওদিকে নীচে পথে লোকজনের গলা শোনা যাইতেছে, জলসা ভাঙ্গিয়াছে, তাই একে একে সকলে ফিরিতেছেন। সঙ্গীন কিছু ঘটিবার আগেই অসহায় সতীশবাবুকে রবারগাছ তলায় একা 'ফেলিয়া কালীপদবাবু রুদ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন এবং ব্যারাকে গিয়া আত্মগোপন করিলেন।

পিছনে যাঁরা আসিতেছিলেন, তাঁরা উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশবাবুকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন।

ডাক্তার গুরুগোবিন্দ কহিলেন, "কাজ্যড়া কিরে মশায়।" এটি ছিল

ডাক্তার গুরুগোবিন্দের পেটেন্ট বুলি, ঘটনাস্থল বা কোনস্থলে প্রবেশের মুখে এই মন্ত্রটি তিনি উচ্চারণ করিতেন। মন্ত্রের অর্থ—"ব্যাপারটা কি শুনি?"

আর একটু আগাইয়া আসিয়া ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন,—"একি, এখানে এরকম করে দাঁড়িয়ে আছেন যে?"

সতীশবাবু বহুকণ্ঠের আশ্বাসে শ্বাস ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন—"ভূত।"

—"ভূত? কি বলছেন?"

—"ঠিকই বলছি।"

ডাক্তার গুরুগোবিন্দই আবার প্রশ্ন কলিলেন—"আরে মশাই খুলে বলুন না, আপমি ভূত দেখেছেন?"

—"হাঁ।"

—"কোথায়?"

সতীশবাবু সম্মুখে পতিত ডালটা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার গুরুগোবিন্দ হাসিয়া আশ্বাসের সুরে বলিলেন, "ওটাতো গাছের ডাল।"

সতীশবাবু কহিলেন, "জানি। ওটা চেপেই তো ঝপাৎ করে উপর থেকে নামল।"

শ্রোতারা এতক্ষণে সত্যই একটু ভাবিত হইলেন, ব্যাপার একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে, কিছু একটা নিশ্চয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই কিছুটা কি?

এইসবে ডাক্তার গুরুগোবিন্দের মাথাটা খেলে ভালো। গোয়েন্দা কর্মচারীর মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতটা গেল কোনদিকে?"

—"তার আমি কি জানি। আমি ডালে চড়ে তাকে নাবতে দেখেছি, তারপরেই চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, দেখব কেমন করে?"

"আচ্ছা," বলিয়া ডাক্তার তিন নম্বর 'বি' ব্যারাকের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে, কে একজন চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। সীটটা কার, ডাক্তারের জানা ছিল। চাদর উঠাইয়া ধাক্কা দিতে

গিয়া হাতে কেডস্ ঠেকিয়া গেল। কালীপদবাবু দৌড়াইয়া আসিয়াই শয্যা লইয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে খেয়াল ছিল না, তাই জুতোটা আর খোলা হয় নাই।

ডাক্তার গোবিন্দ কহিলেন,—"আরে কাজ্যডা কিরে মশায়, জুতা পায়েই শুয়ে পড়েছেন। সতীশবাবু কি আর সাধে ভূত দেখেছেন।" বলিয়া কবিকে টানিয়া তুলিলেন। তখন দুই বন্ধুর হাসিতে ঘর ভরিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া সতীশবাবু যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন। জীবনে যদিও বা একবার ভূত দেখিবার সুযোগ আসিল, তাও এইভাবে মাটি হইয়া গেল। গোঁ গোঁ আওয়াজ, চক্ষুবন্ধ, বংশপত্রের কম্পন, মাঝখান হইতে ইহাই শুধু সার হইল। তাই চটিয়া গিয়া মন্তব্য করিলেন,—"চাঁদ দেখবার জন্য আবার গাছে ওঠা কেন, বাপের জন্মে শুনিনি। দুমিনিট দেরী করলেই তো হতো। যত সব ইয়ে—কবি না ভূত।"

তিননম্বর ব্যারাকের এই মাঠেই ভদ্রলোককে দেখি। পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক থাকে, যাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টিতেই তারা ধরা পড়ে। প্রথম দিনেই দেখিতে পাই যে, পরিধানে খদ্দরের হাফপ্যাণ্ট, গায়ে সবুজ রংয়ের গলাবন্ধ খদ্দরের কোট, পায়ে স্যাণ্ডাল, চোখে চশমা এক ভদ্রলোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পোষাকেই পরিচয় কিছু পাইয়া গেলাম। বয়স্ক ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছেন না। কে কি ভাবিবে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই আসে না। লোক কি বলিবে অর্থাৎ জনমতকে যিনি এত সহজে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য কারতে পারেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। রামকৃষ্ণদেবের প্রশ্নের উত্তরে যুবক নরেন্দ্র নাকি একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "লোক না পোক।" নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে সিংহপুরুষ হইবেন, তার ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যেই পাওয়া গিয়াছিল। নিজের ব্যক্তিত্বে কতখানি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে লোককে পোকার সামিল মনে হইতে পারে, আপনারাও

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমিও প্রথম দেখাতেই বুঝিয়া লইলাম যে, এই ভদ্রলোক শুধু লোক নহেন, তিনি বিশেষ লোক। দেহের সবল স্বাস্থ্য ও দৃঢ়গঠন দেখিয়া দ্বিতীয় আর একটি অনুমানে উপনীত হইলাম যে, প্রচুর প্রাণশক্তি লোকটির ভিতরে মজুত রহিয়াছে।

অনুমান ছাড়িয়া ভদ্রলোকের জাগতিক পরিচয় একটু দেওয়া যাইতেছে। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে, এম-এস-সি পরীক্ষা না দিয়া গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, বরিশালের তরুণ-সম্প্রদায়ের একজন নেতা বলিয়া গৃহীত হন, ডাকনাম রুণুবাবু, পোষাকী নাম শৈলেন দাশগুপ্ত। ১৯২৪ সালে সরকার তাঁহাকে বরিশাল হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন এবং বিদায়কালে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার মত অবাঞ্ছিত ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যেন বরিশালের ত্রিসীমানার মধ্যে পা না দেন, দিলে ভালো হইবে না। এক কথায়—Take care. ভদ্রলোক সেই হইতে কৃষ্ণনগরের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন।

বিকালের দিকে পঞ্চাননবাবু বলিলেন, "চল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবি। এক সঙ্গে কৃষ্ণনগর জেলে ছিলাম।"

পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে পাঁচনম্বর 'বি' ব্যারাকে গিয়া ঢুকিলাম। কোণার দিকে সীটে আগাইতে আগাইতে পঞ্চাননবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু, এই আমার বন্ধু অমলেন্দু।"

"আস্তে আজ্ঞা হোক," বলিয়া রুণুবাবু হাতের তকলী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপ্লবী নেতা মাথা না কাটিয়া সূতা কাটেন দেখিয়া বুঝিলাম যে, গন্ধীজীর নিকট মাথাটি ইনি আপাততঃ গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

সব চেয়ে আশ্চর্য হইলাম এ-বেলার পোষাক দেখিয়া। রুণুবাবু তাঁর রাজ-পরিচ্ছদে ছিলেন। একটা দামী এণ্ডির চাদরকে কাপড় বলিয়াই পরিধান করিয়াছেন, গায়ে হাত কাটা গেঞ্জি। নমস্কার বিনিময় করিয়া আসন লইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তামাক খান ?"

সিগারেটেই অভ্যস্ত ছিলাম, তবু বলিলাম,—"খাই।"

—"বেশ, বেশ। শুনে সুখী হলাম, এগিয়ে আছেন দেখছি। কোন ক্লাশ থেকে ?"

হাসিয়া কহিলাম, "বি-এ ক্লাশ থেকে।"

—"বড় লেটে আরম্ভ করেছেন। আমি মাইনর ক্লাশ থেকে।"

স্বহস্তে তামাক সাজিয়া হুঁকা আগাইয়া দিলেন, আমিও আমার স্ব-হস্ত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলাম।

আলাপ জমিয়া উঠিল এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি সেই আসরেই পত্তন হইয়া গেল। এমন কি একখানি গান, আসলে একটি ছত্র, পর্যন্ত তিনি গাহিয়া শুনাইলেন। ছত্রটি এই—"প্রভু! তুমি কত বড়, আমি কত ছোট, ভাবিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাই-ই।" ইহা তাঁহার পেটেণ্ট ও একচেটিয়া গান, অন্য কেহ গাহিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। গানখানি হইতেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন যে, রুণুবাবুরা ব্রাহ্ম। আমিও তাঁর "প্রভুর" দলে পড়িলাম, অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে 'প্রভু' বলিয়াই সম্বোধন করিতাম, বয়সের ব্যবধান লোপ করিয়া আমরা সমবয়সী সখা হইয়া উঠিলাম।

রুণুবাবুর টাইপের লোক চার হাজার বন্দীর মধ্যে আর একটি আমি দেখি নাই। সবল স্বাস্থ্য, ওস্তাদ খেলোয়াড় (বিশেষ করিয়া হকি), ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভা মিলিয়া যে-ব্যক্তিত্ব প্রস্তুত হইয়াছিল, দেশের বিপ্লব-আন্দোলনের নায়কত্ব করিবার সমস্ত সম্ভাবনাই তাতে মজুত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন কি একটি জিনিসের অভাব ছিল, তাই এত শক্তি তার যথোপযুক্ত কাজে লাগিল না। আমার অনেক সময়েই মনে হইয়াছে যে, বিধাতা একটি মহৎ আয়োজন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির কাছাকাছি আসিয়া কি ভাবিয়া অবশেষে যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে-শক্তি ও সম্ভাবনা লইয়া রুণুবাবু আসিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি নিজেও যে কেন সজাগ হইলেন না, ইহা আমার কাছে আজও প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। বিধাতার সৃষ্টিও যে অর্ধপথে অসমাপ্ত হয়, রুণুবাবু তার একটি দৃষ্টান্ত।

ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও যে না দেখিয়াছি, এমন নহে। যাকে গ্রাহের মধ্যে

আনি নাই, তেমন ক্ষুদ্র-শক্তি ব্যক্তিকেও সংসারে বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। পঙ্গুকে দিয়া গিরি লঙ্ঘন, বোবাকে মুখর করিয়া তোলা ইত্যাদির কথা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য যে, যার কাছে সকলেই আশা করে, সে ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ, যাকে দেখিয়া কোন আশাই জাগ্রত হয় না, সে-ই একদিন বহুর আশা তৃপ্ত করিতে আগাইয়া আসে। এর উত্তর খুঁজিতে গিয়া ইহাই আমার অবশেষে মনে হইয়াছে, শক্তি পাইলেই হয় না, তার ব্যবহার ও প্রয়োগ জানা চাই। ঠিক বুঝাইতে হয়ত পারিতেছি না। আমি বলিতে চাই, মানুষের সার্থকতা বা জীবনক্ষেত্রে সিদ্ধির জন্য বিধিদত্ত শক্তিই যথেষ্ট নহে, সাধনা ব্যতীত সর্বশক্তিই বন্ধ্যা হইয়া যায়। আবার সাধনার সাহায্যে ক্ষুদ্রশক্তিও বৃহৎ সিদ্ধিতে ফলবান হইয়া উঠে—ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যেমন বাতাসের আনুকূল্যে খাণ্ডবগ্রাসী দাবাগ্নিতে পরিণত হয়।

মোট কথা, আমরা প্রত্যেকেই বড় হইতে পারি, নিজ নিজ জীবনে সার্থক হইতে পারি, যদি আমরা একটু ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করি না, তাই সবই অসাধ্য ও অসম্ভব থাকিয়া যায়, যার শক্তি আছে, তারও সে-শক্তিতে মরিচা পড়িয়া যায়।

একটা বিষয়ে প্রভুর মানে রুণুবাবুর দান আমাদের বন্ধা-জীবনে এতখানি ছিল, যার জন্য আজও আমরা অনেকে তাঁর নিকট মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়া থাকি। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টা ও তাগিদেই আমরা খেলার মাঠটি ভোগ-দখলে পাইয়াছিলাম, তাই আমরা বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এ যে কি প্রাপ্তি, বন্দী ব্যতীত অপরের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে।

খেলার মাঠ পাইয়াছিলাম। তাই আমরা বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। আমার ধারণা খেলার মাঠে প্রচুর ঘর্ম ও শক্তি ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের রক্তের স্বাভাবিক ছন্দ রক্ষিত হইতে পারিয়াছিল এবং শরীরে ও মনে আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকিতে পারিয়াছিলাম। নতুবা আমাদের মধ্যে অর্ধেকেরই বেশী ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ

অস্বাভাবিক মন লইয়া ফিরিতে বাধ্য হইতাম। আত্মহত্যা করিয়া বন্দীদের মধ্যে যাঁরা যন্ত্রণা এড়াইয়াছেন, তাঁদের সংখ্যা নিশ্চয় আরও বৃদ্ধি পাইত, যদি খেলার মাঠের মুক্তির আবহাওয়াটি আমাদের কাছে অপ্রাপ্য ও অনধিগম্য থাকিত।

বাহিরে নানা কাজে নানা রকম ঘাতপ্রতিঘাতে শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয় করিবার সুযোগ ছিল, দুর্গের এই বদ্ধ আবেষ্টনীতে খেলার মাঠেই সে সবের অভাব পূরণের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। উগ্র কর্মশক্তি ও তেমনি উগ্র কামনা-যদি বাইরে পথ না পাইয়া শরীর ও মনের ভিতর সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া পথ করিতে বাধ্য হইত, তবে বহুর ক্ষেত্রেই ফলে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দিত, যেমন কতিপয়ের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। গান-বাজনা, পড়াশুনা ইত্যাদি অবশ্য ছিল এবং তাহাতে মগ্ন থাকিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মচর্চা করিয়া অনেকেই দীর্ঘ কারাবাস তপস্বীর মত যাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, আমরা বেশীর ভাগ সংখ্যাই ছিলাম সৈন্যজাতীয়, তপস্বী, সাধক ও জ্ঞানীর সংখ্যা সে তুলনায় ছিল অতি কম.।

ক্যাম্পের বাহিরে কিন্তু দুর্গের সীমানার মধ্যেই উত্তর দিকে হাত ত্রিশেক নীচু জমিতে পাথর কাটিয়া খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সে মাঠে একপাশে মাটিও ছিল। মাঠটিতে সিপাহীরা ফুটবল ও হকি খেলিয়া থাকে, কারণ ব্যায়াম করিলে মনে সুখ ও শরীরে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং সিপাহীদের এদুটি জিনিসের নাকি বেশী আবশ্যক, সামরিক কর্তৃপক্ষ বহু আগেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খেলার মাঠে রিহার্সেল না দিয়া কোন সেনাপতিই লড়াইয়ের মাঠে সৈন্য-চালনা করিতে রাজী হয় না। আর আমরাও তো একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সৈন্যই, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে 'প্রিজনার অব ওয়ার' হইয়া আপাততঃ দুর্গে আটক আছি, খেলার মাঠে আমাদের দাবী না মানিলে চলিবে কেন, ইহাই হইল রুণুবাবুর বক্তব্য।

কমাণ্ডাণ্ট ফিনী সাহেবের পরিচয় কিছু দেওয়া হইয়াছে, তিনি কিছুতেই মাঠ ছাড়িতে রাজী হন না। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মাঠে আমাদের সত্বীকত্ব

মানে পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠিত হইল। মাঠে স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রুণুবাবু আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছিলেন, সামনে ছিলেন ভূপতিদা ও ক্ষিতীশবাবু অবশেষে একটা রফায় আমরা উপনীত হইলাম।

প্রথম বন্দোবস্ত হইল যে, মাঠটি আমাদের জন্য চার দফায় খেলা হইবে আধ ঘণ্টা করিয়া। প্রত্যেক দফায় চব্বিশ জন লোক মাঠে যাইবার ছাড়পত্র পাইবে, বাইশজন খেলোয়াড়, একজন রেফারী এবং একজন দর্শক, মোট সখ্যা চব্বিশই হয়। আমরা সম্মত হইয়া গেলাম।

সম্মত হইবার কারণ এই যে, ছুঁচ হইয়া ঢুকিলে ফাল হইয়া বাহির হইবার কথাটায় আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তা ছাড়া, ফিনীব্যাটা রাজবন্দী কি চীজ না বুঝিয়া আমাদের মাঠে ছাড়িতে সাহস পাইতেছে না। এক দুর্গের দিকটা বাদ দিয়া মাঠের অপর তিন দিকে শুধু তারকাঁটার বেড়া, কে জানে যদি দলবদ্ধভাবে আমরা পালাইবার চেষ্টা করি। অবশ্য এই কাঁটার বেড়া এমনই মজবুত ও ঘন করিয়া তৈরী যে, পলায়ন সম্ভব ছিল না। তবু সাবধানের মার নাই, এই বুদ্ধিকে বুড়ীর মত ফিনী সাহেব ছুঁইয়া রহিলেন। যদি প্রমাণ হয় যে, খেলার মাঠে আমরা খেলিতেই যাই, তাহা হইলে সকালে ও বিকালে দুই বেলা আমাদের জন্য সপ্তাহে চারদিন সাহেব মাঠ খোলা রাখিবেন, বাকী তিন দিন মাঠ থাকিবে সিপাহীদের দখলে ও ব্যবহারে। পরে সপ্তাহে একদিন বাদ দিয়া ছয়দিনই মাঠ আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে ফিনী সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই মাঠে কি খেলাই আমরা খেলিয়াছি, মনে পড়িলে রোমহর্ষণ হয়। নিজের কথা মনে আছে, চার দফায় চারবারই মাঠে গিয়া হকি খেলিয়াছি, দুপুরের আগে দুবার, দুপুরে একবার, আর বিকালে একবার। সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় 'প্রভু' হেড কোয়ার্টারে থাকিতেন না, প্রত্যেকবারই পুরোভাগে থাকিয়া প্রত্যেক ব্যারাক হইতে রিক্রুট সংগ্রহ করিয়া বাহিনী প্রস্তুত করিয়া লইয়া বাহির হইতেন। খেদাইয়া জড় করিবার কাজ যদি রুণুবাবু নিজে হাতে না নিতেন,

তবে চার দফার তিন দফাতেই মাঠ খেলোয়াড়শূন্য থাকিত, এক বিকালের দিক ছাড়া। কালটা ছিল শীত, ইহা স্মরণ রাখিবেন, তাও আবার পাহাড়ী শীত।

হকি খেলাতে প্রভু সত্যই ওস্তাদ ছিলেন; আমাদের কাছে তিনিই ছিলেন ধ্যানচাঁদ। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমরা যত না বল পিটাইয়াছি, তার হাজারগুণ অধিক পিঠাইয়াছি একে অপরের ঠ্যাং। বল মার খাইয়াও মড়ার মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু হকি-স্টীকের বাড়ি খাইয়া ঠ্যাং হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিলে চুপ করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সত্যই কষ্টকর হইত, তখন খেলাটা যা জমিত, ভাবিতে আবার রোমহর্ষণ হয়।

কয়েকজন খেলোয়াড়ের টাইমিং এমন নিখুঁত ছিল যে, প্রত্যেকবারই বল তাক করিয়া কার্যকালে স্বপক্ষ বা বিপক্ষের ঠ্যাংয়ে মারিয়া বসিত। প্রভু তাঁর শিক্ষার এমন চমৎকার ফল দেখিয়া সানন্দে উৎসাহ দিতেন, "সাবাস কেষ্টবাবু, এমন হাত যশ বড় দেখা যায় না, লক্ষ্যভেদে অর্জুনকেও কাঁদিয়ে ছাড়লেন।"

কেষ্টবাবু জবাব দিতেন, "প্রত্যেকবারই দেখছি কেউ না কেউ ঠ্যাং বাড়িয়ে দেবে, বল আর মারা হয় না।"

একদিন ফিনী সাহেবকে গিয়া রুণুবাবু বলিলেন—"সাহেব, তোমার সিপাই টীমের সঙ্গে আমরা হকি-ম্যাচ খেলতে চাই।" প্রস্তাবে সাহেব প্রথমটা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, এ খুব ভাল প্রস্তাব।" সাহেব নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন।

দুদিন সাহেব আমাদের খেলা দেখিলেন, তারপর রুণুবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "ম্যাচ খেলার প্রস্তাবটা বাতিল করতে হোল?"

—"কেন?"

—"ফল ভালো হবে না। তা ছাড়া, উপর থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না।"

কথাটা যুক্তিযুক্ত। প্রভু ভাবিত হইলেন, কি উপায়ে ব্যাটাকে সম্মত করা যায়।

ফিনী সাহেব বলিয়া বসিলেন, "You are dangerous players' বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। প্রভুও হাসিয়া ফেলিলেন এবং এতক্ষণে আসল কারণটা অনুমান করিতে সক্ষম হইলেন। 'ফিনী সাহেব আমাদের খেলা দেখিয়াই মনে মনে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। নিজেদের ঠ্যাং হইতে রক্ত ঝরাইতে যাদের এত উৎসাহ সিপাহীদের ও সাহেবের ঠ্যাংগুলির প্রতি তাদের আসক্তি ও আগ্রহ যে কি প্রকারের হইবে, সাহেব তাহা মানসচক্ষে দেখিয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং পরিণামে কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়াইতে পারে, তাহাও তিনি দেখিয়া লইয়াছিলেন।

তাই সংক্ষেপে বলিলেন, "you are dangerous players"

চোখ বুঝিলে আজও সেই পাহাড়ের মাঠ চোখে পরিষ্কার দেখিতে পাই এবং যে বিপজ্জনক ও রোমহর্ষক খেলা তথায় আমরা খেলিয়া আসিয়াছি, তাহার পুনরভিনয় মানস-মাঠে দেখিতে পাই। আজ প্রৌঢ় জীবনের শান্ত নির্জনতা হইতে সেদিকে তাকাইয়া দেখি, আর ভাবি যে, যৌবন আমাদের জীবনেও একদিন আসিয়াছিল। এত প্রাচুর্য, এত অমিত বেহিসাবী ব্যয় একদিন সত্যই দেখা দিয়াছিল—শৃঙ্খলমুক্ত ঝড়ের মত, বাঁধমুক্ত বন্যার মত, মেঘমুক্ত আলোর মত এই আমাদের জীবনে।

যাঁরা সৃষ্টির গোড়ার চক্রান্তটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁরা 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে' বলিয়া একটা মোক্ষম কথা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ চাকাটায় যে মাঝে মাঝে তেল দিতে হয়, কথাটাই কিন্তু তাঁরা একদম চাপিয়া গিয়াছেন। আমাদের চাকাটাও আটকাইয়া গেল, খেলার মাঠে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হাঙ্গামা দেখা দিল। চাকায় কি তৈল নিষেক করিলে তার গতি মসৃণ, সহজ ও চালু হইতে পারে, আমরা সেই সমস্যায় নিপতিত হইলাম।

আমরা আবিষ্কার করিলাম, কমাণ্ডাণ্ট ফিনী সাহেব শুধু ঘুঘু ব্যক্তিই নহেন, ব্যাটা রীতিমত একটি উঁচুদরের চোর। চৌর্যকে বড় বিদ্যা বলা হইয়াছে, যতক্ষণ না ধরা পড়ে। ফিনী সাহেব ধরা পড়িয়া গেলেন। আমাদের অনুমান-শক্তি জীববিশেষের ঘ্রাণ-শক্তির মতই প্রবল ছিল, তাই ব্যাপারটা আন্দাজেই আমরা আয়ত্ত ও বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা আপনারা মনে রাখিবেন।

গভর্ণমেণ্টের টাকা গৌরীসেন নামক ব্যক্তির টাকা, তা মারা গেলে শোক আমরা নাও করিতে পারি। কণ্ট্রাক্টর যিনি মাল সাপ্লাই করেন, তাঁর মস্তকে পনস নামক বৃহদাকার ফলটি স্থাপন পূর্বক ভাঙ্গিয়া ফিনী সাহেব যদি ভক্ষণ করেন, তাতেও আপত্তি করিতে আমরা বিরত থাকিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের ট্যাঁকে হাত দিতে আসিলে আমরা ন্যায়তঃ আপত্তি করিতে ও অসন্তুষ্ট হইতে নিশ্চয় পারি।

দুর্গের ও বন্দীদের পাহারার জন্য বেশ মোটা একটা গুর্খা ও গাড়োয়ালী সিপাহী-বাহিনী বক্সাতে রাখিতে হইয়াছিল। খেলার বাবদ সিপাহীদের প্রাপ্য টাকাটা মারিয়া দিয়া আমাদের হকিষ্টীক, বল ইত্যাদি দিয়াই ফিনী সাহেব কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। গুর্খাই ও গাড়োয়ালী হাতের ধাক্কা সামলাইতে আমাদের ষ্টীকগুলির দফা প্রায় রফা হইয়া আসিত, আমরা শুধু মরা মারিয়া খুনের দায়ে পড়িতাম।

খেলাটা যে আমাদের কতখানি ছিল, তাহা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছি। খেলাটা যে যুদ্ধের মত রোমহর্ষ ব্যাপার ছিল, সে রিপোর্ট'ও আপনাদের সমীপে পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের রসদ ও সমরোপকরণে এইভাবে টান পড়িলে আমাদের বরাদ্দ টাকায় সে লোকসান পোষানো সম্ভব নহে। এত দামী ষ্টীকগুলি যে এত অল্লায়ু, ইহা আমরা কেহই সন্দেহ করি নাই। আমাদের সমর-সচিব অর্থাৎ খেলার সেক্রেটারী অনুমান-আন্দাজে হাতড়াইয়া কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইতে দেখিলেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা আমাদের মালুম হইয়া গেল।

সেক্রেটারী কমিটির মিটিং-এ রিপোর্ট দাখিল করিলেন। আমরা মেম্বরগণ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম—আমাদের খেলার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম মালপত্তর আমাদের সম্পত্তি, সুতরাং সেগুলি আমাদের জিম্মাতে আলবৎ থাকা দরকার।

অতঃপর কমিটি সেক্রেটারীকে নির্দেশ দান করিলেন—মালশুদ্ধ বাক্সটা ভিতরে আনার ব্যবস্থা করা হউক। মস্ত বড় একটা কাঠের বাক্সে খেলার সাজসরঞ্জামগুলি অফিসে রক্ষিত হইত, মাঠের গেট খুলিলে অফিস হইতে সেগুলি লইবার অনুমতি আমরা পাইতাম।

ঐ বাক্সটা দখল করিবার হুকুমই আমরা দিলাম।

সন্ধ্যার সময় কমিটির আবার অধিবেশন বসিল। সেক্রেটারী বিরসবদনে নিবেদন করিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আদেশ পালনে সক্ষম হইনি।"

আমরা শুধাইলাম, "কেন, আপনি কি চেষ্টা করেননি? কিংবা আমাদের পঞ্চায়েতের নির্দেশ সমীচীন মনে করেন নি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, সেদিকে কোন ত্রুটি হয়নি। সাহেব বাক্সটা ভিতরে পাঠাতে প্রস্তুত নহেন।"

সমস্বরে প্রশ্ন উত্থিত হইল, "কেন? কেন তিনি বাক্স ভিতরে পাঠাবেন না

শুনি ?" অর্থাৎ উহা কি সাহেবের পৈত্রিক সম্পত্তি, ইহাই ছিল আমাদের আসল জিজ্ঞাস্য বা মনের ভাব।

সেক্রেটারী বলিলেন, "সমস্ত শুনে ফিনী সাহেব বল্লেন, "তোমাদের জিনিষ তোমাদের কাছে থাকবে, এতে আপত্তি করবার কি থাকতে পারে।"

আমরা বলিলাম, "আমরাও তো তাই বলি।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "কিন্তু তিনি বল্লেন যে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত—"

শেষ করিতে না দিয়াই আমরা প্রশ্ন করিলাম, "তিনি আবার খামোকা দুঃখিত হতে যান কেন ?"

—"কারণ, তাঁর সাধ্য নেই এগুলি ভিতরে পাঠাবার।"

আমরা বলিলাম, "বেশ, লোকের অভাব থাকে, আমরাই হাতে হাতে এগুলি নিয়ে আসব।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "লোকের অভাবের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, সাহেব বল্লেন যে, গভর্নমেণ্টের অর্ডার নেই।"

মেম্বরগণ তাঁহাদের সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি সে অর্ডার দেখেছেন ?"

সেক্রেটারীও ঝানু লোক, কহিলেন, "বল্লাম, কই দেখি তোমার অর্ডার। সাহেব একটা সার্কুলার আমার চোখের সামনে খুলে ধরে বল্লেন, দেখলে তো ক্ষুর পর্যন্ত not allowed. আর হকিস্টীকের মত ডজন তিনেক মারাত্মক অস্ত্র ইচ্ছে থাকলেও তোমাদের হাতে আমি তুলে দিতে পারিনে।"

শুনিয়া আমরা উচ্চারণ করিলাম—"হুঁ।" অর্থাৎ ব্যাটা আচ্ছা প্যাঁচ কষিয়াছে, ভোগাবে দেখিতেছি।

বুঝিলাম, ফিনী সাহেব এখন হইতে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করিয়াছে এবং যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুক্তির লড়াই মানে বুদ্ধির লড়াই। মাথার সংখ্যা বেশী হইলেই বুদ্ধির পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। এই পৃথিবীতে কতবার দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ বোকা লোক একটা বুদ্ধিমানের

নিকট হারিয়া গিয়াছে, যেমন হাজার ভেড়া একটা সিংহের গর্জ্জনে আধমরা হইয়া যায়। ফিনীসাহেব আমাদিগকে বেকায়দায় ফেলিলেন, আমরা কমিটির সভ্যগণ ভাবনা ও দুশ্চিন্তার ভারে মুণ্ড হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলাম'।

এমন সময় দৈববাণী হইল, "আমি মালশুদ্ধ বাক্স ভিতরে এনে দিতে পারি।"

রুণুবাবুর গলা। শুনিয়া আর সন্দেহ রহিল না যে, ব্রহ্ম কৃপা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিলাম যে, এক 'প্রভু'ই এই বিষাদসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি যে কি পারেন, আর কি পারেন না, বুঝিতে গিয়া আমরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রভুর মহিমাই শুধু নহে, প্রতিভাও অপার এবং বিচিত্র ছিল।

আমরা বলিলাম, "আপনি এগুলি আনিয়ে দিতে পারেন?"

রুণুবাবু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "পারি।" প্রভু শূন্য কুম্ভ ছিলেন না, তাই বেশী বাক্য নির্গত হইতে দেন নাই।

আমরা অনুরোধ করিলাম, "তবে আপনি এগুলি আনিয়ে দিন প্রভু।"

প্রভু বলিলেন, "আচ্ছা। কিন্তু—"

আমরা শঙ্কিত হইয়া কহিলাম—"এর মধ্যে দোহাই প্রভু, আর কিন্তু ঢোকাবেন না।"

অনুরোধে কান না দিয়া তিনি বলিলেন, "একটি সর্তে এ ভার নিতে আমি পারি।"

বাধ্য হইয়া আমাদের প্রশ্ন করিতে হইল, "কি আপনার সর্ত প্রভু?"

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—"আমাকে তিন দিনের জন্য সেক্রেটারী করতে হবে।"

আমাদের ঘর্ম দিয়া জ্বর ত্যাগ হইল, এত অল্পে রেহাই পাইব, এমন আশঙ্কা আমরা করি নাই। সানন্দে কমিটি প্রভুর সর্তে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া গেলেন। সাব্যস্ত হইল যে, অফিসে সেক্রেটারীর চিঠি যাইবে যে, তিনি অসুস্থ বিধায় তাঁহার

স্থলে মিঃ শৈলেন দাশগুপ্ত, ওরফে আমাদের 'প্রভু' সেক্রেটারীর কার্য নির্বাহ করিবেন।

• সভা ভঙ্গের পূর্বে স্বরে ঘনিষ্ঠতা আনিয়া আমরা প্রশ্ন করিলাম, "বলুন না প্রভু, কি ভাবে বাক্স আনবেন?"

প্রভু এতাবৎ রক্ষিত তাঁর গাম্ভীর্যকে একটুও শিথিল না করিয়া পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মন্ত্র ব্যক্ত করেন না, কারণ দেয়ালেরও কর্ণ রহিয়াছে।"

আমরা মুখে বলিলাম, "তা তো বটেই।" আর মনে মনে বলিলাম, "ব্যাটা ঘুঘুদাশ।"

• পরের দিন প্রভু যথাসময়ে আফিসে গেলেন এবং একাই ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে বাক্স নাই।

আমরা কহিলাম, "কই, বাক্স কই?"

—"বাক্স অফিসে আছে, ব্যস্ত হবেন না। এখনও দুদিন পূরো আছে!"

পরের দিন প্রভু আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পোষাক দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। পরিধানে হাফপ্যাণ্ট, পায়ে মোটা মোজা, দুই পায়ে দুই বুট, উত্তমাঙ্গে মিলিটারী কোট এবং মাথায় একটা টুপি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, "সমরে চলিনু হাম, হামে না ফিরাও হে।"

কহিলাম, সত্যি "ব্যাপার কি?"

উত্তর হইল, অফিসে যাচ্ছি। আজ আমি, জেনারেল ফন রুণডাস (রুণুদাশ), যাচ্ছি দুর্গের কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে মিলিটারী কন্‌ফারেন্সে আলোচনা করতে।" বলিয়াই আমার মশারী-টানাইবার একটা লোহার ডাণ্ডা টান মারিয়া খাটিয়া হইতে খুলিয়া লইলেন।

বলিলাম, "আরে, করেন কি?"

—"ভয় নেই, ফেরৎ পাবেন। দরকার আছে, নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে ব্যারাকের বারান্দায় আসিলেন।

বারান্দায় একটা লোহার খাটিয়াতে বসিয়া অফিস-আর্দালী নীলাদ্রি বাবুদের প্রদত্ত সিগারেট সেবন করিতেছিল। প্রভু বলিলেন, "চল।"

নীলাদ্রি বলিল, "চলিয়ে।"

বাবুদের সঙ্গে করিয়া অফিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া ও ফিরাইয়া আনার ডিউটি নীলাদ্রি ও আর একজন সিপাহীর উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারা ক্যাম্পের গেটে বা ভিতরেই থাকিত।

আমরা গেট পর্যন্ত প্রভুর অনুগমন করিলাম। গেটে একটা ঝাঁকা সম্মুখে রাখিয়া প্রভুর পেয়ারের ভূটিয়া চাকর বাচ্চু অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভু বলিলেন, "নে চল।"

বাচ্চু ঝাঁকাটা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর আমরা বিস্ময়ে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঝাঁকাটার মধ্যে রক্ষিত চীজগুলিই আমাদের বিস্ময়ের হেতু।

দেখিলাম, তাহাতে ছোট বড় মাঝারি নানা সাইজের বটি রহিয়াছে, নানা সাইজের বৈঠা মানে পিতলের খুন্তি-হাতা রহিয়াছে, রহিয়াছে দা ও মুরগী-কাটা ছুরি, রহিয়াছে সোডার বোতল এবং নানা সাইজের পাথরের টুকরা। সেই ঝাঁকা মাথায় বাচ্চু চলিয়াছে পিছনে, আর মশারী-টানাইবার-হাত আড়াই লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন আমাদের প্রভু ফন রুণডাস্।

গেটের সিপাহী বন্দুক হাতে আগাইয়া আসিয়া লোহার প্রকাণ্ড গেটটা খুলিয়া দিয়া আমাদের মতই হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু গেট পার হইয়া নীলাদ্রি ও বাচ্চুসহ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আর, আমাদের চিন্তাটা দুশ্চিন্তার তুঙ্গে উঠিয়া স্থির হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়েক সারা ক্যাম্পটা কুম্ভক মারিয়া অপেক্ষা করার পর আমরা শ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম, বাচ্চু ও নীলাদ্রিসহ প্রভু ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর সঙ্গে

আসিয়াছে দুইজন ভূটিয়া কুলির মাথায় চড়িয়া অতিকায় কাঠের একটা সিন্দুক। সারা ক্যাম্প গেটের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রভু ক্যাম্পে ঢুকিয়া বাণী ছাড়িলেন, "কেল্লা ফতে হো গিয়া।"

আমরা উল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিলাম, "জয় প্রভুর জয়।"

জন চারেক তরুণ বয়স্ক ডেটিনিউ ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া প্রভুকে ছোঁ মারিয়া চ্যাং দোলায় তুলিয়া লইল। প্রভু নিজের পায়ে হাঁটিবেন, ইহা যে আমাদেরই লজ্জা ও অপমানের কথা। চ্যাং দোলায় চাপিয়া হাতের ডাণ্ডাটাকে উর্দ্ধে পতাকার মত তুলিয়া ধরিয়া প্রভু অগ্রসর হইয়া চলিলেন, আমরা চলিলাম পিছনে ও অগ্রে রীতিমত একটা শোভাযাত্রা করিয়া।

কমনরুমে কমিটির বিশেষ অধিবেশন তৎক্ষণাৎ বসিল, সদস্যদের ডাকার আর প্রয়োজনই ছিল না।

কমিটিতে প্রভু উবাচ, "ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা এই অধমের উপর যে গুরুদায়িত্ব চাপাইয়াছিলেন, আপনাদের আশীর্বাদে তাহা আমি পালনে সক্ষম হইয়াছি। সঙ্গের ঐ বাক্সটিই তার প্রমাণ।"

প্রভুর বিনয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। শাস্ত্রে আছে, ফলবান বৃক্ষ কখনও উদ্ধত হয় না, মহাপুরুষগণও তেমনি সর্বদা বিনয়ী হইয়া থাকেন। কমিটির মেম্বর নয়, তাঁহারাও সভায় উপস্থিত ছিলেন, সংখ্যায় তাঁহারাই ভারী। নেড়া-মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া অমর চ্যাটার্জি (দক্ষিণ কলিকাতা) আগাইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "দিন প্রভু, একটু পায়ের ধূলো দিন।"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত প্রভুর ডান পা সম্মুখে সটান লম্বা হইয়া প্রসারিত হইল, চ্যাটার্জি খাবল মারিয়া পায়ের এক খামচা কাল্পনিক ধূলা লইয়া মাথায় মাখিলেন।

প্রভু বলিলেন, "কল্যাণ হোক। ওস্তাদ একটা সিগারেট ছাড় তো।"

সিগারেট ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ধীরে নাসাপথে বমন করিয়া প্রভু বলিয়া চলিলেন,—যাহা বলিলেন, তাহার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ঝাঁকা—মাথায় বাচ্চু সহ ঐ পোষাকে ডাণ্ডা হাতে সাহেবের ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন, অর্থাৎ ভয়ে একটু চমকে উঠলেন।

মুখে বললেন, "কি, ব্যাপার কি মিঃ দাশগুপ্ত? এ সব কি?"

—"বলছি ধৈর্য ধারণ কর," বলে আসন গ্রহণ করলাম। বাচ্চুকে বললাম, "ঝাঁকাটা চেয়ারের কাছে রেখে তুই বাইরে যা।"

তারপর আরম্ভ করলাম, "হে সাহেব, তুমি ক্ষুর ভিতরে দিতে পার না কারণ উহা মারাত্মক অস্ত্র। তুমি স্টীক ভিতরে দিতে পার না, পাছে ঐ অস্ত্র সাহায্যে আমরা তোমাকে বা তোমার অফিসারদের লাঠিপেটা করি। বেশ—"

তারপর ঝাঁকা হতে ছোট-বড় গুটি পাঁচেক পাথরের খণ্ড তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ইহা কি বস্তু তাহা কি তুমি জান?"

—"পাথর বলে মনে হচ্ছে।"

—"ঠিকই মনে হচ্ছে। কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?"

—"এ তো পাহাড়ের সর্বত্র পাওয়া যায়।"

—"উত্তম। ক্যাম্পের ভিতর পাওয়া যায়?—উত্তর দেও।"

মাথা নেড়ে বললেন,—"যায়।"

তারপর বড় পাথরটা দেখিয়ে বললাম, "এটা যদি ছুঁড়ে মারি এবং তা যদি তোমার মাথায় লাগে, তবে কি হয় বলতে পার?"

সাহেব বোকার মত তাকিয়ে রইলেন।

আমি বলে চললাম, "নাকে লাগলে নাক ভোঁতা হবে, রক্ত বন্ধ হবার আগেই তুমি শমন-সদনে প্রেরিত হবে। মাথায় লাগলেও ঐ একই পরিণাম।"

এইভাবে একটির পর একটি ক'রে সাহেবকে বস্তুপরিচয় শিক্ষা দিয়ে চললাম, বস্তুবিজ্ঞানও বলতে পারেন।

বল্লাম, "দেখ, এই ছুরি দিয়ে আমরা মুরগী জবাই ক'রে থাকি। এই মুরগীকাটা ছুরি দিয়ে তোমাকেও জবাই করা চলে কিনা, বল? এর নাম

বঁটি, এ দিয়ে বড় বড় মাছ কোটা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে মানুষ কর্তনও অনায়াসে হ'তে পারে। এর নাম খুন্তি, পেতলের বৈঠাও বলতে পার, তাক্ করে মারতে পারলে মাথা তোমার দু-ফাঁক করে দেওয়া যায়, কোমরে কষে মারতে পারলে তোমাকে জমি নিতে হবে। এর নাম হাতা, এর কার্যকারিতাও পূর্ববৎ। তারপর এটা কি বলতে পার ?"

—"সোডার বোতল।"

—"ছুঁড়তে জানলে বোমার কাজ দেয়। তাক্ তদি ঠিক হয়, তবে তোমার অত বড় মাথাটাই এই বোতল-বোমার এক আঘাতে ফুটিফাটা চৌচির হয়ে যাবে। বিশ্বাস হয় কি ?

এমন সময় এক-গাল দাড়ি নিয়ে আমাদের মহর্ষি জগদীশ ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি, শৈলেনবাবু ?"

বল্লাম—"চুপ, ডোন্‌ট টক্, কথা বলবেন না। শুনে যান।"

তারপরে লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে সমুত্থিত হলাম, সেটা মারাত্মক ভঙ্গীতে বাগিয়ে ধরতেই মহর্ষি দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। বল্লাম, "ভয় নেই, প্রয়োগ করবো না। শুধু দেখাব।"

সাহেবকে বল্লাম, "সাহেব এর নাম ডাণ্ডা, এতে ঠাণ্ডা না করা যায়, এমন ষণ্ডা মানুষের মধ্যে নাই। প্রত্যেক খাটিয়ার চার কোণায় চারটি ক'রে মোট দেড় শত খাটিয়ায় সর্বসাকুল্যে ছয়শত এই অস্ত্র আমাদের দখলে আছে। হকি-স্টীকের চেয়ে এগুলি কি কম হিংস্র, না অস্ত্র হিসেবে কম কার্যকরী ? চুপ করে থাকলে চলবে না, জবাব দাও।"

—"বস, বস।"

—"বসছি। সাহেব তুমি তো তুমি, ছোটখাটো একটা হাতীকে পর্যন্ত এ দিয়ে সাবাড় করা যায়, বুঝলে ?"

মহর্ষি হেসে উঠলেন।

তাঁকে বল্লাম, "হাস্য করবেন না, সিরিয়স্ কথা হচ্ছে।"

সাহেব হেসে বল্লেন, "You are a dangerous man, দাশগুপ্ত।"

বল্লাম, "না সাহেব, মোটেই ভয়ানক নই। আমাদের মেয়েরা বলে থাকেন, সরল অঙ্গুলীতে ঘি উঠে না। কেউ কেউ বলে থাকেন, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। অর্থটা নিও, আবার গালাগালি ভেবে বস না যেন।"

সাহেব এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

বল্লাম, "আমি এখন যাচ্ছি। বাক্সটার কি করবে?"

সাহেব বল্লেন, "জগদীশবাবু, তাহলে ওটা ভিতরেই পাঠিয়ে দেবেন।"

বল্লাম, "চলুন জগদীশবাবু।"

—"আপনি যান, আমি পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

—"না, এখনই। আমি ওটা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

উপস্থিত সকলের দিকে চক্ষু পাতিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাক্সটা এসেছে কিনা? কি বলেন আপনারা? এখন আমি সেক্রেটারীর চাকুরী পরিত্যাগ করলাম।"

অমর চ্যাটার্জি হাতজোড় করিয়া বন্দনার সুরে কহিল, "প্রভু হে, তুমি একটি আস্ত ঘুঘু।"

প্রভু ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে সস্নেহে উবাচ, "অমৃতম্ বালভাষিতম্। আর একটা সিগারেট ছাড় দেখি।"

কথায় বলে যে, কস্তুরী মৃগ গন্ধ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। ফুলও পারে না। গুণের দোষই এই যে, কখন চাপা থাকে না, বাহির হইয়া পড়েই। গুণের স্বভাব বুঝিতে গিয়া দার্শনিকেরা পর্যন্ত হিম্‌সিম্ খাইয়া গিয়াছেন। বস্তুকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কোনদিক দিয়াই দার্শনিকেরা তাকে কায়দা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুণটাকে সামনে ধরিয়া দিয়া বস্তু নিজে সরিয়া পড়ে। ফলে মুশকিল বা মস্ত ফ্যাসাদ সমুপস্থিত হয়। বস্তুকেই যদি না পাওয়া যায়,

তবে বস্তুর বিচার দূরে থাক, গুণের ভিত্তিটাই যে লোপ পাইয়া যায়। তাই হার মানিয়া বলিতে হয় যে,—মোট কথা, গুণের স্বভাবই প্রকাশিত হওয়া বা প্রকাশ পাওয়া।

বুদ্ধিতে শান দিয়া যদি তীক্ষ্ণ করিয়া লওয়া যায়, তবে এও আবিষ্কার করা সম্ভব যে, সৃষ্টিতে বস্তু নাই শুধু প্রকাশ আছে, অর্থাৎ শুধু গুণই আছে। তাই সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে গিয়া আমাদের কবি অবাক হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, "তুমি কেমন করে গান করহে গুণি!" বলা বাহুল্য, বস্তু বলিতে ঐ গুণিকেই বুঝায়। বস্তু চিরকাল আড়ালেই থাকে, সুতরাং সৃষ্টিতে ঐ গুণী বা স্রষ্টা চিরকালই অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। গুণের গোলকধাঁধাঁ পার হইয়া গুণীতে যিনি পৌছিতে পারেন, একমাত্র তাঁরই হিসাব মিলিয়া যায়। এদেশে তাঁকেই মুক্ত-পুরুষ বলা হয়। অর্থাৎ চৌদিকেতে গুণের যে ফাঁদ পাতা আছে, তার এলাকার বাহিরে গিয়া তিনি নির্গুণ বা গুণমুক্ত হইয়া পড়েন। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত যে, যাঁকে গুণী বলা হইল, তাঁকে কিন্তু জানা গেল নির্গুণ। গীতা না ভাগবতে কোথায় যেন ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মকে "নির্গুণ-গুণী" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

দেখিতেছি, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল, গুণের পিছনে ধাওয়া করিয়া একেবারে ব্রহ্মের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছি। দোষটা আমার নয়, কেঁচোরও নয়, দোষটা সাপের, কারণ কেঁচোর গর্তে সে বাসা লইয়াছে। এই সৃষ্টিতে সব গুণের গর্তে বস্তুর বদলে যদি ব্রহ্ম বাসা বাঁধিয়া থাকে, তবে বুদ্ধির খানাতল্লাসীতে ব্রহ্ম বাহির হইয়া পড়িবেই, সে জন্য আমাকে বা আপনাদের কাহাকেও দোষ দেওয়া ভুল।

গুণ থাকিলে তাহা চাপা থাকিবে না, এই বিশ্বাস বা ফর্মূলা লইয়া পৃথিবীতে চলিবার জন্যই কস্তুরী—মৃগের কথাটা প্রবীণেরা এভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে দুঃখ করেন যে, তাঁদের মূল্য বা মর্য্যাদা পৃথিবী স্বীকার করিল না। আমাদের হাতের ফর্মূলার নিকষ-পাথরে কষিয়া দেখিলে

এই অভিযোগকে নাকি সুরের মেকী কান্না বলিয়া সাব্যস্ত করিতে আমরা বাধ্য। গুণ আছে, অথচ তার প্রকাশ নাই, স্বীকৃতি নাই—এতবড় মিথ্যা কথা আর হইতেই পারে না।

অবশ্য, জোনাকী যদি তার এক-কণা আলোর সম্পত্তি লইয়া নিজেকে সূর্যের সগোত্র বলিয়া সূর্যের সম্মান দাবী করে, তবে সে আলাদা কথা। অভিযোগ বা নাকি সুরের কান্না রাখিয়া শান্ত মনে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, গুণ থাকিলে তার প্রকাশ ও স্বীকৃতি দুইই আছে। গুণের তারতম্যে স্বীকৃতিরও তারতম্য ঘটে। সূর্যকে দেখার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, তোমার হিরণ্ময় আবরণ অপসারণ কর, নইলে যে তোমাকে দেখা সম্ভব হয় না। আবার জোনাকীকে বলিতে হয়, তোমার পুচ্ছের আলোক-বিন্দুটি, জ্বালো নতুবা অন্ধকারে যে তোমার অস্তিত্বই মালুম হয় না।

জোনাকী হইয়া যদি সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা করিবার জেদ হয়, তবে সে রাস্তাও যে খোলা নাই, এমন নহে। ঐ গুণের খোলা রাস্তাটা অনুসরণ করিতে হয়। সকল গুণ যেখানে নিঃশেষে শেষ হইয়াছে, সেখানকার ছোঁয়া পাইলে পঙ্গু পর্বত পার হয়, বোবা বাগ্মী হয় এবং জোনাকীর জ্যোতিতেও সূর্য নিষ্প্রভ হয়। এখন একটা 'অতএব' দিয়া বলা যাক, গুণ থাকিলে তাহা প্রকাশ হইবেই, তাকে চাপিয়া রাখার সাধ্য সৃষ্টিতে কারো নাই।

বকসা-ক্যাম্পে আমরা মোট সংখ্যা ছিলাম প্রায় দেড়শ। ইহার মধ্যে কেহই আমরা গুণহীন বা তেমন নির্গুণ ছিলাম না। কারণ, গুণহীন বস্তু বা ব্যক্তি সৃষ্টিতে অসম্ভব, যেমন অসম্ভব আলোহীন সূর্য। এতগুলি গুণীর সমাবেশে স্থানটি রীতিমত সরগরম হইয়া থাকিত। কাহাকে রাখিয়া যে কাহাকে দেখি, তাহা ঠিক করা এক দুরূহ ব্যাপার। কাহাকেও ছোট বলিয়া এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, কারণ বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি যে, শিশি বড় দেখিলেই হয় না, ওজন দেখিতে হয়। বিপদ কি এক রকমের! যাহাকে বাদ দিব সে-ই হয়তো এই ধরণের মস্তবড় একটা সার্টিফিকেট নাকের

সামনে প্রমাণরূপে মেলিয়া ধরিবে, তখন সে দলিল অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য। কবি কি খামকা কাঁদিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "তুমি আমায় ফেলেছ• কোন ফাঁদে?" এই দেড়শত গুণীর সমাবেশ, গুণের গরমে বক্সা-ক্যাম্প সরগরম, এর মধ্যে কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে বাছিয়া লইব, ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইতেছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কথাটা সাধে কি উচ্চারণে এমন সঙ্গীন ঠেকে! এই রকম সঙ্গীন অবস্থাতেই তো ঐ শব্দটা প্রয়োগ করার বিধি আছে, যেমন নাভিশ্বাস উঠিলে কস্তুরীর ব্যবস্থা।

সেই কস্তুরীতেই ফিরিয়া আসা গেল, বাঁচা গেছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি। কস্তুরী-মৃগ গন্ধ লুকাইয়া রাখিতে পারে না, ধরা পড়িয়া যায়, অমর চ্যাটার্জীও (দক্ষিণ কলিকাতা) আবিষ্কৃত হইয়া পড়িলেন। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মহেন্দ্র ব্যানার্জী অমর চ্যাটার্জীকে আবিষ্কার করিলেন। ইহা যে কত বড় আবিষ্কার, তাহা বক্সার বন্দীমাত্রেই স্বীকার পাইবেন। আপনারাও অনুগ্রহ করিয়া মানিয়া লউন যে, অমর চ্যাটার্জী আবিষ্কৃত হওয়ায় বক্সার জীবনে আড্ডা বস্তুটি দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অমর চ্যাটার্জী যদি স্বদেশী দলে না ঢুকিত, তবে বড়গোছের একজন কাপ্তান মানুষ হইতে পারিত, আমার ও আমার মত অনেকেরই ধারণা। প্রথমে ক্যাম্পে তার একটা নাম প্রচলিত হয় "মারফৎ।" কিন্তু এই নামটির আয়ু বেশী দিন ছিল না, পরে আর একটি নাম হয় "ওস্তাদ" এবং এটাই স্থায়ী হয়। অমর চ্যাটার্জী একজন উচু-দরের তবলচী, সেই সূত্রেই নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে কতকটা চিনিয়াছিলাম। প্রাতঃকৃত্যের পর বাথরুম হইতে উপরে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু মাঝ পথেই থামিতে হইল। বাদামী রংয়ের কুকুর দুইটা মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে আগাইয়া আসিতেছে, পৃথিবীর গাত্রের ঘ্রাণ লইয়াই যেন সকল রহস্য আবিষ্কার করিবে। পিছনে আসিতেছেন সপরিষদ ফিণী সাহেব। পথের মধ্যে বাবুরা তাঁর

গতিরোধ করিলেন। একজন দুইজন করিয়া বেশ ছোটখাটো ভীড় জমিয়া গেল। সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি যার যা অভিযোগ বা বক্তব্যের লেনদেন চলিতে লাগিল। আমিও ভীড়ের কিনারায় স্থান গ্রহণ করিলাম, এমন সময়—

এমন সময়ে পায়জামা পায়ে, ভি-কলার গেঞ্জি গায়ে, টাওয়েলের পাগড়ী-আঁটা ন্যাড়া মাথায় হাতে একটা নিমের দাঁতন লইয়া বেঁটেখাটো মজবুৎ চেহারার এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিল, "শালা বাংলা জানে ?"

শুনিয়া ভালো করিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। কথাটা কিন্তু যথাস্থানে মানে শালার কর্ণে প্রবেশ করিল।

ফেণী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "হাঁ, বাঙলা জানে।"

শুনিয়া বক্তা জিভ কাটিল, অর্থাৎ লজ্জা প্রকাশ করিল এবং মুখে বলিল— "এই সেরেছে।" —অন্যান্য সকলে হাসিটা কোন মতে চাপিয়া রাখিলেন।

কিন্তু বেঁটে ভদ্রলোক ইহাতে মোটেই অপ্রতিভ হইল না, আগাইয়া গিয়া ফিণী সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াইল।

তারপর বলিল, "বাঙলা তো জান সাহেব বুঝলাম। কিন্তু ধোবা কবে আসবে, তা কি জান ?"

মিঃ ফিণী উত্তরে বলিলেন, "আমি জলপাইগুড়িতে লিখেছি ধোবার জন্য।"

—"তা ভালোই করেছ। কিন্তু কবে ধোবা আসবে, বলতে পার ? কুড়ি দিন যায়, কাপড়-চোপড়ের কি অবস্থা হয়েছে, বুঝতে পার না ?"

সাহেব বলিলেন, "আমিতো লিখেছি—"

শেষ করিতে না দিয়াই বক্তা বলিয়া উঠিল, "ওসব লেখালেখি আমি বুঝি না। আমার জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি সমস্তই ময়লা হয়ে গেছে। তিন দিনের মধ্যে তোমার ধোবা যদি না আসে, তবে সোজা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকবে না।"

বলিয়াই দাঁতন হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া

বাথরুমের দিকে আগাইয়া গেল।—শাসানীটুকুতে কাজ দিয়াছিল, দু দিনের মধ্যেই ক্যাম্পে রজকের আবির্ভাব হইল।

পরের দিন মহেন্দ্র ব্যানার্জী আসিয়া আমাদের ব্যারাকে উপস্থিত হইলেন, কহিলেন, "পঞ্চাননবাবু, একটা নতুন মাল আবিষ্কার করেছি, খোঁজ পাননি এখনও? দাঁড়ান, নিয়ে আসছি," বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দরজায় মহেন্দ্রবাবুর গলা শোনা গেল, "পঞ্চাননবাবু, এনেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের গলা শোনা গেল, "আরে করে কি! আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি। হাতটা ছাড়ুন, নইলে লোকে মনে করবে যে, পকেট মেরেছি। কথা দিচ্ছি পালাব না।"

ঘাড় ফিরাইয়া আমরা দেখিলাম, মহেন্দ্র ব্যানার্জি গতকল্যকার সেই "শালা বাঙলা জানে"-প্রশ্ন কর্তাকেই হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিতেছেন।

আমাদের সামনে তাকে হাজির করিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই নিন। ইনিই সেই মাল, নাম বর্তমানে মারফৎ।"

তারপর ঘণ্টা তিনেক বসিয়া আমরা জন পঁচিশেক অমর চ্যাটার্জিকে ঘিরিয়া যত হাসি হাসিয়াছিলাম, সারা বছরেও তত হাসি আমরা হাসি নাই। এই আসরেই ওস্তাদ তার গ্রেপ্তারের কাহিনী বর্ণনা করে এবং ধরা পড়ায় তাহার কি উপকার হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত করে। ওস্তাদের ভাষা যথাসাধ্য মার্জিত করিয়া তার বক্তব্যটুকুও পেশ করা যাইতেছে।

ওস্তাদ বলিল, "পুলিশে না ধরলে, শালা হোটেলওয়ালাই জেলে দিত।"

যতীনবাবু (দাশগুপ্ত) ওস্তাদদেরই এক পাড়ার লোক, জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোটেলওয়ালাটা আবার কে?"

—"যে খেতে দেয়, লোকে ব'লে পিতা, আমি বলি হোটেলওয়ালা।"

—"বাবা হয়ে তিনি তোমাকে জেলে দিতেন,"—বিস্মিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল।

উত্তর হইল, "কেন দেবে না শুনি? ব্যাটা আমার চরিত্রে সন্দেহ

করতে শুরু করেছিল। খেয়ে দেয়েই বেরিয়ে পড়তুম, হোটেলে ফিরতে রোজই একটু রাত হোত। উড়ে চাকরটাকে ক' বাক্স যে গোল্ডফ্লেক সিগারেট ঘুষ দিয়েছি, এলে শব্দ না করে যেন দরজাটা খুলে দেয়। বিশ্বেস করবেন না, শালা জগরনাথ পাকে পড়েছি জেনে চাপ দিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবীটাই মশায় একদিন আদায় করে নিল।" বলিয়া সিগারেটে এমন অগস্ত্য টানই ওস্তাদ দিল যে, মাথার আগুন গোড়ায় নামাইয়া আনিল।

পাঞ্জাবীর শোকটা ধোঁয়ার সঙ্গে বাহিরে উড়াইয়া দিয়া ওস্তাদ বলিয়া চলিল, "রাত তখন একটা হবে, ফিরে এসে জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকলাম, এই মাগুনি দোর খোল। ব্যাটা জেগেই ছিল, ঝাড়া আধঘণ্টা দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর উঠে এসে এমন শব্দ করে দরজা খুল্ল যে, ভয় পেয়ে বল্লাম, এই আস্তে, জেগে উঠবে।" বলিয়া পূর্ববৎ সিগারেটে মরীয়া হইয়া টান দিল।

পরে বলিয়া চলিল, "আর জেগে উঠবে! জেগে উঠেই তো ছিল, দোতালার বারান্দা হতে আওয়াজ এল, কে এলরে মাগুনি?

মাগুনি উর্ধমুখে জবাব দিল, "দাদাবাবু আইল।"

উপর হতে ফের আওয়াজ এল, শুয়োর ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কি রাঁড়ের বাড়ি পেয়েছে যে, যখন আসবে, তখনই দরজা খুলবে?"

এই পর্য্যন্ত আসিয়া অমর চ্যাটার্জি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আবেদনের সুরে পেশ করিল, "ব্যাটাচ্ছেলের কথা শুনলেন? বলে নাকি রাঁড়ের বাড়ি পেয়েছ? না, এমন বাড়িতে আর থাকব না, ঠিক করেই ফেল্লাম।"

অতঃপর ওস্তাদ তার প্ল্যান ও তার ফলাফল বর্ণনা করিয়া চলিল, "বাড়িউলী মানে গর্ভধারিণী জননী ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনতে দেয়, খরচার জন্য পঞ্চাশ তুলতে হবে। পঞ্চাশের আগে সাত বসিয়ে নিয়ে এলুম সাড়ে সাতশ, পঞ্চাশ দিয়ে হাতে রইল সাতশ। সেদিনেই চলে এলাম

দিদির কাছে এলাহাবাদ, জানেনই তো বিপদ কখনও একা আসে না। দিদি ভায়ের হাত দিয়েই ব্যাংক থেকে টাকা তুললেন, ফলে ঠিক ঐ একই কায়দায় হাতে এল পাঁচশ। ছোটখাটো একটা জমিদারই হয়ে গেলাম, কি বলেন?" বলিয়া আমাদের অভিমত চাহিল, না গর্ব প্রকাশ করিল ঠিক বুঝা গেল না।

—"এদিকে কলকাতায় বাড়িওয়ালা ফায়ার, এলাহাবাদে জরুরী চিঠি এল জামাইবাবুর কাছে, চোরকে আটক করে রাখ, ওকে আমি জেলে দেব। দিদির উত্তর গেল, চোর ভাগলবা, আমারও পঁচিশ গাপ করে সরেছে। ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেলাম পুলিশের হাতে। ব্যাটা কি বলে জানেন?"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "না, কি বলেন?"

—"বলে কিনা, পুলিশে না ধরলে আমিই ওকে জেলে দিতাম, ও চোরকে আমি ঘানি টানিয়ে ছাড়তাম। পুণ্যের জোর ছিল, এখন তো মহাপুরুষদের আসরে এসে জুটেছি," বলিয়া আমরা যত মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলাম, তাহাদের সকলের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঝাঁটার মত মার্জনা করিয়া লইল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, টাকাটা দলের কাজের জন্যই হস্তগত করা হইয়াছিল, ওটুকু ওস্তাদ ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছিল।

যতীনবাবু অমরের খবর জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্যামিলি-এলাউন্সের যে দরখাস্ত করেছিলে, তার কি উত্তর এল?"

প্রশ্নটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমরা জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিলাম, অনেকের চোখেমুখে বিরক্তিই দেখা দিল যে, এই আসরে আবার ওসব কথা কেন! কিন্তু যতীন দাশের চোখে মুখে যেন একটা কৌতুকের আভা পড়িয়াছিল।

মহেন্দ্রবাবু ওস্তাদকে কহিলেন, "বলেই ফেল না, এতটাই যখন পেরেছ, তখন ওটুকুতে আর লজ্জা কেন?"

ওস্তাদ বলিল, "আজ থাক, আর একদিন হবে।"

আমরা বলিলাম, "না, আর একদিন নয়, আজই শুনব।"

ওস্তাদ বলিল, "বেলা কত হয়েছে ঠিক পান? বারোটা বেজে গেছে।"

—"তা যাক, তুমি আরম্ভ কর।"

আনন্দের স্বভাবই এই, তা আধখানা ভোগ করিয়া বাকী আধখানা অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া চলে না। আনন্দ ভোগে বা বিতরণে হিসেবীদের স্থান নাই, উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র বে-হিসেবীদেরই অধিকার থাকে। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িয়া গেল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ে যাতে ধুলা না লাগে, তার জন্য সতর্কতা ও সাবধানতা তাহাই সংসারী ও হিসেবী মানুষের স্বভাব। আর যখন বুক আনন্দে ভরিয়া যায়, তখন সেই ধোপদুরস্ত জামা কাপড় শুদ্ধই ধূলায় আমরা গড়াগড়ি দিয়া থাকি, ইহাই মানুষের বেহিসেবী চরিত্র। আনন্দের স্বভাবই এই যে, সে কোন হিসাব মানে না, সে বে-হিসেবী।

আমরাও আনন্দে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, বন্দিত্বের কথা, নাওয়া-খাওয়ার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাই বেলা বারোটা বাজিয়া গেলেও আমাদের পক্ষে বেলা হইতে পারে নাই।

মদই হউক বা অমৃতই হউক, দুটোর মধ্যেই নেশা আছে, একটাতে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত হিসাব বিস্মৃত হইতে হয়, আর একটার বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল থাকিয়াও মনটা সমস্ত হিসাবের চৌহদ্দীর বাহিরে চলিয়া যায়। ঐ নেশাতেই আমাদের সেদিন পাইয়াছিল, আমরা যেন কলস উপুড় করিয়া আনন্দ-রস বা মদ্য-পানীয় আকণ্ঠ পান করিয়া লইয়াছিলাম।

বাধ্য হইয়াই অমরকে আবার আরম্ভ করিতে হইল। ওস্তাদ শুরু করিল,—

—"তখন প্রেসিডেন্সী জেলে, জ্বরে বিছানায় পড়ে আছি। প্রকৃতির আহ্বান ঠেলা দিল, উঠতে গিয়ে খাটিয়ার পায়াতে পাটা লেগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাবা। ও-ব্যাটা ঘুঘুদাশ পাশের সীটে চেয়ারে বসে বই পড়ছিল।"

উপেন দাস প্রশ্ন করিল, "ঘুঘু দাশটি কিনি ?"

চোখের ইঙ্গিতে যতীন দাসকে দেখাইয়া দিয়া ওস্তাদ বলিল, "উনি। ব্যাটা হাড়ে হাড়ে শয়তান, সাবধানে থাকবেন। বলে বসল, এখন তো খুব বাবাগো মাগো করছ, বাইরে থাকতে এ-ভক্তি ছিল কোথায় ? বল্লাম, থাম ব্যাটা, তখন সময় পাইনি, এখন সেটা পুষিয়ে নিচ্ছি। ঘুঘুদাশের কথায় কিন্তু একটা উপকার হল।"

আমাদের বিভূতি ম্যাস্টর জিভের জড়তার সঙ্গে যুদ্ধ শেষে বাক্যটি মুক্ত করিয়া বাহিরে আনিল, "কি উপকার হোল, প্রকাশ করেই বল বাবা।"

ম্যাস্টরও ওস্তাদের পাড়ারই লোক।

তাকে ধমকের সুরে ওস্তাদ থামাইয়া দিল, "থাম, কতবার বলেছি একখণ্ড সীসা মুখে রাখবি," বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অভিমুখে আবার দৃষ্টিটা মেলিয়া ধরিল।

বলিয়া চলিল, "ঠিক করলাম, শত হোক জন্মদাতা পিতা তো, এতকাল খোরাক-পোষাক জুগিয়েছে, নেকাপড়ার জন্যও চেষ্টা করেছে, বল ? বলিয়া দক্ষিণের হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি আমাদের চোখের সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিল।

—"ভাবলাম, ঋণশোধ যথাসাধ্য করতে হবে। দিলাম ঠুকে এক দরখাস্ত। পারিবারিক ভাতা চাই, বাড়ীর আমিই একমাত্র পুত্তুর, আমার আয়েই সংসারের নির্ভর ইত্যাদি সব ভালো ভালো পয়েণ্ট দরখাস্তে ঠেসে দিলাম। ঐ ঘুঘুদাশকে দিয়েই লিখিয়েছিলাম, ব্যাটা অপয়া !"

—"ওর দিকে তাকিও না, বলে যাও। তারপর ?"

—"তারপর ? তারপর এস-বি'র এক নিস্‌পেক্টর বাড়িতে গিয়ে হাজির, দরখাস্তটার তদন্ত করতে গেছেন। সেদিন ভদ্রলোকের একটা ফাঁড়া গেছে।"

আমরা উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম, অনেকেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছিল ?"

ওস্তাদ ধীরেসুস্থে বলিয়া চলিল—

—"ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, অমরবাবু আপনার ছেলে ?

হোটেলওয়ালা নামটা শুনেই ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, মুখে বল্লেন, না বলতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু কেন ?

ভদ্রলোক বল্লেন, তিনি দরখাস্তে বলেছেন যে, তাঁর আয়েই নাকি আপনার সংসার চলত।

হোটেলওয়ালা একেবারে ফেটে পড়ল, ভদ্রলোককে শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠল, আপনি বেরোন, এক্ষুণি বেরিয়ে যান।

নিসপেক্টর তো অবাক। তিনি যত চেষ্টা করেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হোটেলওয়ালা ততই তেতে উঠে, পাড়ার লোক দৌড়ে এল ব্যাপার কি !

হোটেলওয়ালা সবাইকে শুনিয়ে বল্ল, শোন তোমরা, উনি এসে বলছেন যে, ঐ হারামজাদা শুয়োর ব্যাটা নাকি আমাদের খাওয়াতো পরাতো, তার টাকাতেই নাকি সংসার চলত। তার হয়ে এই ইনি এয়েছেন খবর নিতে, ওকালতী করতে। যান, আপনি বেরিয়ে যান, আমাকে চটাবেন না। চটে গেলে আমি কী যে করব, তার ঠিক নেই। সোজা বলছি, আপনারা ওকে ছেড়ে দিয়ে দেখুন, ওকে আমি জেল খাটাই কি না। চোর, চোর, কতটাকা যে চুরি করেছে, তা আপনি জানেন মশায় ? ব্যাটাচ্ছেলের আয়ে সংসার চলে ! না, আপনি বেরোন, আমি দরজা বন্ধ করি, বলে নিস্‌পেক্টরের মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করে দিল।”

ওস্তাদের বলার ভঙ্গীতে এবং ভাষার গাঁথুনিতে শ্রোতাদের চোখের সম্মুখে অমরের পিতার ক্রুদ্ধ মূর্তি, নিস্‌পেক্টরের অসহায় মুখের ছবি এবং দুইয়ে মিলাইয়া যে-পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা একেবারে জলজ্যান্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে আমাদের পেটে সত্যই সেদিন খিল ধরিয়া গিয়াছিল। একমাত্র বক্তাই এই হাসির ছোঁয়াচ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

হাসির ভীড়ের মধ্যে অমরের পরের কয়েকটি কথা চাপা পড়িয়া গেল, কোন মতে তাহা জোড়াতালি দিয়া একটা বক্তব্য মনে খাড়া করিয়া লইলাম।

অমর বলিতেছিল, "অদৃষ্টে নেই পুত্রের রোজগার খাওয়া, আমি চেষ্টা করলে কি হবে! নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারল, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলল, আমি কি করব।" বলিয়া অমর উঠিয়া পড়িল।

আজ পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া ভাবিতেছি যে, সেদিন বৃদ্ধ হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া যত হাসি আমরা হাসিয়াছিলাম, তার কোন চিহ্নই কি সেই মৌন পাষাণের বুকে দাগ কাটে নাই? গ্রামোফোনের রেকর্ডের রেখা হইতে সুরসঙ্গীত উদ্ধার করিবার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ পাষাণের বুকের দাগ হইতে কোন উপায়েই কি সেদিনকার পুঞ্জপুঞ্জ আনন্দ-হাসিকে উদ্ধার করা সম্ভব নহে? স্মৃতির যাদুকাঠির ছোঁয়া দিয়া শুধু আমার কাছেই তাহা আমি পুনরুজ্জীবিত করিয়া লইতে পারি, কিন্তু সংসারের আর দশজনকে তো তার অংশীদার করিতে পারি না।

অথচ শুনিতে পাই যে, ত্রিকালের কোন কিছুই নাকি হারায় না, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালের খণ্ড সীমানা পার হইয়া অনন্তকালে সত্যই নাকি তারা চিরবিদ্যমান। আমাদের জগতেই কেবল হৃদয়ের সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু জীবনের পথপ্রান্তে ফেলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যে-জগতে সমস্ত সঞ্চয় চির অস্তিত্বে বর্তমান, সে-জগতের সন্ধান কালের সীমাবদ্ধ এই দৃষ্টিতে পাওয়ার তো উপায় নাই। শুনিতে পাই, কবি, গুণী, সাধক, প্রভৃতির প্রতিভায় ও মনীষায় নাকি কদাচিৎ সেই অলৌকিক লোকের আলোক-আভাস ধরা পড়ে। কিন্তু আমরা তাহারা নই, তাই স্মৃতিই শুধু আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশ্রয়।

সন্ধানী লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই। কারণ, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন। সিঁদুর-মাখা পাথর বা গাছ দেখিলেই যে লোকেরা প্রণাম করিয়া বসে, তার কারণও ইহাই। কে জানে কোন্ দেবতা কোন্ ঘরমে বৈঠতা হ্যায়, তার তো নিশ্চয়তা নাই। বিশ্বাস করিয়া একটি প্রণাম জমা করিয়া রাখা গেল, হয়তো মিলিলে মিলিতেও পারে।

এত কথায় আমাদের আবশ্যক কি! যাঁহাকে শ্মশানের পিশাচ মনে করিতেছি, তাঁহার গায়ের ও জটার ছাই-ভস্ম মার্জনা করিয়া লইলে হয়তো দেখা যাইবে যে, তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং শিব। অতএব, ছাই দেখিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে নাই, উড়াইয়া দেখিতে হয়।

ছাই উড়াইয়া আমরাও রত্ন পাইয়া গেলাম। রত্নটির নাম গোবিন্দ, পদবী আজ আর স্মরণে নাই। বক্সা ক্যাম্পে আমরা ছিলাম বাবু। বাবু থাকিলেই চাকর-বাকরও অবশ্যই থাকিবে। জেলে কয়েদীরাই বাবুদের ঠাকুর, চাকর, বেয়ারা ইত্যাদির কাজ সম্পাদন করিত। এখানে বাহির হইতে পাচক ও চাকর আমদানী করা হইয়াছিল। গোবিন্দ ছিল তাদেরই একজন। পরে অবশ্য জানা গেল যে, সে শুধু একজন নহে, বিশেষ একজন।

যে-বাড়িতে রান্নাঘরের ব্যবস্থা ভালো, সে-বাড়িতে স্বচ্ছল পরিবার বসবাস করিয়া থাকে, ইহা অনুমানেই মানিয়া লওয়া চলে। আর মানিয়া লওয়া চলে যে, সে-পরিবারে সুখ বর্তমান। আমবা সুখী পরিবার ছিলাম। এই সুখের জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একক দক্ষিণাদার (মিত্র)। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কবি কালীপদবাবু লিখিয়াছিলেন, ‘ধরে নাই পেটে তবু দক্ষিণাদা, ডেটিনিউ-সংসদে সকলের মা।’ কথাটার মধ্যে একরত্তি বাড়তি নাই, একেবারে খাঁটি কথা। রন্ধন-বিদ্যায় তিনি এতখানি পারঙ্গম ছিলেন যে, যে-কোন গৃহলক্ষ্মীকে এ-বিদ্যায় তিনি পরাস্ত করিতে পারিতেন। আর স্নেহও ছিল মায়ের মত। মা সন্তানকে

স্তন্য পান করাইয়া যে সুখ ও তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দক্ষিণাদাও অনুরূপ সুখ বোধ করিতেন।

রান্নাঘর যে এমন সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা কে আগে মনে করিতে পারিয়াছিল। চৌর্যবিদ্যা-চর্চার এমন ক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টি হইতে নাই। এই বিষয়ে হাতযশ যার যত বেশী, তার ক্ষমতাও তত অধিক, এমন কি, সিপাহীরা পর্যন্ত তার হাতেব মধ্যে আসিয়া পড়িত! সুতরাং এই বিদ্যায় যারা গুরু ও শিক্ষক, উভয় পক্ষকেই ঠেকাইবার জন্য দক্ষিণাদাকে ভোরে রান্নাঘর খোলা হইতে রাত্রে রান্নাঘর বন্ধ করা অবধি প্রায় সময়টাই এই মহলে থাকিতে হইত। তদুপরি, ঠাকুর-চাকরদের মধ্যে নানা কারণে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই থাকিত, অরাজকতা দমনের জন্যও দক্ষিণাদার রন্ধনশালায় উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।

দক্ষিণাদা চাকরদের মধ্যে কাজ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন! গোবিন্দ পড়িয়াছিল চা-টিফিন—বিভাগে। ইতিমধ্যে গোবিন্দ সম্বন্ধে কানাঘুষা শোনা যাইতে লাগিল, গোবিন্দ ঠাকুর-চাকরদের লইয়া মিটিং করে।

বিজয়বাবু (দত্ত) রাম-অবতারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই, গোবিন্দ তোদের কি বলে রে?"

সে উত্তর দিল, "গোবিন্দ বাবু লেখাপড়া জানে।"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ, বাবু। মুদীর দোকানে খাতা লিখত।"

—"বটে?"

রাম-অবতার বলিল,—"হ্যাঁ, বাবু। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলে।"

ইহার পরে আর আপত্তি করে কাহার সাধ্য।

বিজয়বাবু কহিলেন, "গোবিন্দ খুব পণ্ডিত, না রে?"

রাম-অবতার খুশী হইয়া গেল, বলিল, "গোবিন্দকে আমরা খুব মান্য করি।"

প্রভু-ভৃত্যের আলাপ নিজের সীটে বসিয়াই শুনিতেছিলাম। গোবিন্দ সম্বন্ধে মনে মনে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া পড়িলাম।

কানে আসিল, বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ আর কি বলে ?"

অর্থাৎ এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি আসলে সরকারের স্পাই কিনা, এইটাই রাম-অবতারের নিকট হইতে তিনি আদায় করিয়া লইতেছিলেন। উত্তরে বিজয়বাবু যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল, আমিও কোনমতে উদাত্ত হাসির মুখে জোরসে ছিপি আঁটিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাম-অবতার সরল মানুষ, সরল মনেই আমাদের বোধগম্য হিন্দিতে যাহা বলিয়াছিল, তাহা এই—"গোবিন্দ বলে, সব বাবু সমান অছে না। কেউ কেউ বোমা মেরে এসেছে, কেউ কেউ সাহেব মেরে, লেখাপড়াও কেউ কেউ জানে। সব বাবু সমান আছে না। কত বাবু চুরি করে, কত বাবু ত্রিহরণ (স্ত্রীহরণ) মামলায় এসেছে, তার ঠিক নাই।" ইত্যাদি।

রাম-অবতার বিদায় লইতে ছিপি ছাড়িয়া দিলাম, অট্টহাসিতে ঘর দুজনেই ভরিয়া ফেলিলাম। শোন কথা, আমরা নাকি ত্রিহরণ মামলায় ধরা পড়িয়া আসিয়াছি।

বিজয়বাবু বলিলেন, "মহাপুরুষটির খোঁজ নিতে হোল।"

বিজয়বাবু যখন ঘরে বসিয়া খোঁজ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, ঠিক তখনই নীচে টিফিন-ঘরে গোবিন্দ এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। খবরটা একপ্রকার পাখায় ভর করিয়া উপরে, নীচে, ব্যারাকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্যারীবাবু (দাস) যখন চায়ের ঘরে ঢুকিয়াছেন, তখন ভোরের টিফিন-পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বেঞ্চিতে বসিয়া হাঁক দিলেন, "গোবিন্দ, এক কাপ চা দাও।"

গোবিন্দ চায়ের ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল এবং উত্তর দিল, "বসুন, দিচ্ছি।" সম্মুখে লম্বা-টানা টেবিল লইয়া প্যারীবাবু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ এক কাপ চা আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল।

চায়ে চুমুক দিয়াই প্যারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "চায়ে দুধ দেও নাই।"

—"না, দুধ নেই।"

—"হুঁ। সেদ্ধপাতা দিয়েই আবার চা করেছ ?"

—"এক কাপ চায়ের জন্য আর নূতন প্যাকেট ভাঙ্গিনি, খানিকটা সেদ্ধ চা আবার গরম করে দিয়েছি।"

প্যারীবাবু আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তুমি মানুষ, না জানোয়ার ? এ-চা মানুষে খেতে পারে ?"

বলিয়াই হাতের পেয়ালাটা কাঠের মেঝেতে ছুড়িয়া মারিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঝনঝন শব্দ করিয়া পেয়ালাটা টুকরা টুকরা হইয়া গেল। প্যারীবাবুর চীৎকারে ও পেয়ালার শব্দে ঠাকুর-চাকর অনেকে ছুটিয়া আসিল।

গোবিন্দ প্যারীবাবুকে কহিল, "রাগ করে যে পেয়ালাটা ভাঙ্গলেন, এতে কার লোকসান হোল ?"

প্যারীবাবু গোবিন্দের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিছনে শোনা গেল যে, গোবিন্দ উপস্থিত পাচক ও চাকরদের বলিতেছে, "দেখলি তো লেখাপড়া জানার গুণ ? তোরা হলে তো রেগে আমার মুখেই পেয়ালা ছুঁড়ে মারতিস।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গোবিন্দ শুধু সত্যবাদীই ছিল না, তার ন্যায়-অন্যায় বোধটাও প্রখর ছিল। কিন্তু তার এই নৈতিক চরিত্র, গাম্ভীর্য ও ধৈর্য ক্রমেই আমাদের অসহনীয় হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে একদিন গোবিন্দ চাকর মহলে ঘোষণা করিল যে, এর পরের বার আর সে চাকর হইয়া ক্যাম্পে আসিবে না, ডেটিনিউ হইয়াই আসিবে। ঘোষণাতে তার মর্যাদা উক্ত মহলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। বাবুরাও গোবিন্দকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

দিন দশেক পরে ভোরে একটু দেরি করিয়া টিফিন-ঘরে ঢুকিয়াছি। দেখি, খাঁ সাহেব (আবদুর রেজাক খাঁ) ঘরে আছেন, একটা বেঞ্চিতে উবু হইয়া হাঁটুর উপর হাত দুইটা টান করিয়া বসিয়া আছেন। পাশে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘরে কেউ নেই নাকি ?" বলিয়া টিফিন-ঘরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

খাঁ সাহেব নিম্নস্বরে বলিলেন, "গোবিন্দ আছে।"

ডাক দিলাম, "গোবিন্দ ?"

—"আজ্ঞে", বলিয়া গোবিন্দ ভিতর হইতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কহিলাম, "চা দেও।"

গোবিন্দ বলিল, "আপনি তো এই এলেন, উনি আধঘণ্টা বসে আছেন, চা পাননি।"

বিস্মিত হইলাম। কহিলাম, "দেওনি কেন ?"

—"কেমন করে দেই ?"

—"কেন ?"

গোবিন্দ বলিল, "পরশুরাম বাজার আনতে গেছে।"

—"পরশুরামের কথা কে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি খাঁ সাহেবকে চা দেওনি কেন ?"

গোবিন্দ বলিল, "না শুনলে আমি কি করব, আমি তো বলেছি—"

—"কি বলেছ ?"

—"বলেছি, পরশুরাম বাজার আনতে গেছে, না এলে হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিলাম, "কেন হবে না ?"

উত্তর হইল, "কেমন করে হবে ? কাপ-প্লেট ধোয়া নেই।"

শুনিয়া রক্ত মাথায় চড়িয়া বসিল, ধমক দিতে যাইতেছিলাম, খাঁ সাহেব হাতে চাপ দিয়া থামাইয়া দিলেন।

পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে কহিলেন, "কাপ-প্লেট ধোয়া পরশুরামের ভাগে পড়েছে কিনা, তাই। গোবিন্দের ভাগে পড়েচে চা তৈরী করা।"

ক্রোধকে যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিয়া কহিলাম, "আধঘণ্টার মধ্যে তুমি নিজে একটা কাপ ধুয়ে চা দিতে পারতে না ?"

—"পারব না কেন ? ইচ্ছে করলেই পারতাম।"

—"এখন তবে দয়া করে সেই ইচ্ছেটা একবার কর।"

খাঁ সাহেব বলিয়া বসিলেন, "থাক গোবিন্দ, কষ্ট হবে, পরশুরাম আসুক।"

গোবিন্দ উত্তর দিল "আর থাকবে কেন, আমিই কাপ ধুয়ে চা করে দিচ্ছি।" বলিয়া টিফিন-ঘরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আপনমনে একা-একা কি যেন গোবিন্দ বলিতেছিল।

ডাকিয়া কহিলাম, "বলছ কি ?"

উত্তর আসিল, কি আর বলব। বলছি, আপনারাই নিয়ম করে কাজ ভাগ করে দেবেন, আপনারাই আবার তা ভাঙ্গবেন—"

সহ্যের সীমা অতিক্রম বহু পূর্বেই করিয়া গিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়া খাঁ সাহেব আবার বাধা দিলেন, "থাক, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। চলুন, উঠে পড়ি।"

কথাটা বোধ হয় গোবিন্দের কানে গিয়া থাকিবে, ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "উঠবেন না, চা হয়ে গেছে, খেয়েই যান।"

দুই কাপ চা লইয়া গোবিন্দ উপস্থিত হইল, আমাদের সম্মুখে তাহা ধরিয়া দিয়া যাইতে যাইতে মন্তব্য করিল, "না খেয়ে যদি চলে যেতেন, দু-কাপ চা খামোকা নষ্ট হোত।"

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া আসিলাম।

খাঁ সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "চীজটি কেমন বুঝলেন ?"

—"গোবিন্দ যদি না যায়, তবে অনেক বাবুকেই পাগল করে ছাড়বে, বলে রাখলাম।"

ব্যাপারটা দক্ষিণাদার কানে গেল। গোবিন্দ উপস্থিত ছিল না, চাকর-বাকরদের সম্মুখে তিনি মন্তব্য করিলেন, "ব্যাটাকে তাড়াতেই হোল দেখছি।"

কথাটা যথাস্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। গোবিন্দ শুনিতে পাইল যে, ম্যানেজারবাবু তাহাকে তাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

খাবার-ঘরে দক্ষিণাদাকে ঘিরিয়া বাবুরা আড্ডা জমাইয়াছিল। অনেকের

হাতেই প্লেট, আহারের পূর্বে চাখিয়া দেখিতেছে, মাংসটা কেমন হইয়াছে। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া হাজির হইল।

দক্ষিণাদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "আমাকে নাকি ছাড়িয়ে দেবেন ?"

দক্ষিণাদা চটিয়া গিয়া বলিলেন, "দেবই তো।"

গোবিন্দ বলিল, "না, আমি নিজেই রিজাইন করব।"

শুনিয়া বাবুরা প্রায় বিহ্বল হইয়া গেলেন। বলে কি, গোবিন্দ নাকি রিজাইন করিবে। ব্যাটা ইংরেজীও জানে দেখা যাইতেছে।

গোবিন্দ কহিল, "ডিসমিস করলে নাম খারাপ হয়, তাই আমি রিজাইন করব ঠিক করেছি।"

গোবিন্দকে অবশ্য ডিসমিস করা হয় নাই কিংবা সে-ও রিজাইন করিবার সুযোগ পায় নাই। বাড়ি হইতে মায়ের অসুখের খবর পাইয়া সে ছুটি লইয়া চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে নাই।

পৃথিবীকে জলে আর স্থলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছি। শুনিতে পাই যে, ইহার মধ্যে নাকি তিনভাগই পড়িয়াছে জলের দখলে, আর বাকী একভাগ পড়িয়াছে স্থলের অংশে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই বিষম ভাগের নিশ্চয় একটা যুক্তিযুক্ত হেতু রহিয়াছে। হেতুটা বোধ হয় এই যে, সাত সমুদ্রের লোনাজলে যদি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া না রাখা হইত, তবে গোটা পৃথিবীটাই পচিয়া উঠিত।

একভাগকে বাঁচাইবার জন্য তিনভাগের এই ব্যয়টাকে অপব্যয় মনে করিলে ভুল হইবে। এই অপব্যয়ের মধ্যে সৃষ্টির রহস্য বা সত্যটিই নিহিত আছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে সৃষ্টিতে অপ্রয়োজনই পরিমাণে ও মূলে অধিক। অথবা, অর্থহীন একটা অপ্রয়োজন সৃষ্টিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, যেমন মহাশূন্যের সীমাহীন কোলে কয়েক কোটি সৌরজগৎ এখানে-সেখানে ছিঁটেফোঁটার মত ফুটিয়া আছে—আছে কিনা, তাহাও মালুম হয়

না। ভারতবর্ষের ঋষিরা একদা পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্যই নাই, ইহা আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে স্থিত এবং পরিণামে আনন্দেই অবসিত। মোট কথা, বিনা প্রয়োজনেই সৃষ্টি, এই কথাটাই আনন্দ শব্দ দ্বারা ঋষিরা বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমি বিনা-প্রয়োজনকে আনন্দ না বলিয়া অপ্রয়োজন বলিয়াছি, এই যা তফাৎ। অনেকে আবার ইহাকে লীলা বলিয়া থাকেন। যাঁর যেমন অভিরুচি!

আপনারা অবশ্যই বলিতে পারেন যে, এত ভূমিকার বা ভণিতার আবশ্যক নাই, কথাটা বলিয়া ফেলিলেই তো হয়। বেশ, তবে বলিয়া ফেলা যাইতেছে—

লিখিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছি যে বক্সা বন্দিজীবনের প্রয়োজনীয় কথা বা কাহিনী এতাবৎ আমার কলমে তেমন আসিতেছে না। যাহা আসিতেছে, তাহা সমস্তই হাল্কা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়।

কেন এমন হইল, তার উত্তরটাই ভূমিকায় বা ভণিতায় ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। বলিতে চাহিয়াছিলাম, দোষটা আমার স্বভাবের অর্থাৎ স্মৃতির। বন্দিজীবনের ভয়ানক ব্যাপার, গুরুতর বিষয় সমস্তই বিস্মৃতিতে তলাইয়া গিয়াছে, শুধু হালকা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিকেই স্মৃতি পরম মমতায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যারা বা যে-সমস্ত ঘটনা বন্দিজীবনকে সহনীয় বা উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাই স্মৃতিতে একান্ত সত্য ও প্রধান হইয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আর বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ও তার নায়কগণ বেমালুম স্মৃতি হইতে লোপ পাইয়াছে।

আমার স্বভাবের মধ্যে সঞ্চয়ী বলিয়া যে-লোকটি রহিয়াছে, সে যে ঐতিহাসিক নহে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের দিকেই তার পক্ষপাতিত্ব, তাই বিষয়-বণ্টনে তিন ভাগেরও অধিক সে অপ্রয়োজনের ভাঁড়ারে ঠাসিয়া দিয়াছে। সেই স্বভাবটাই আমার স্মৃতিতে বসিয়া কলমের কর্ণধারী

সাজিয়াছে। কাজেই আমি মানে কলমটা উক্ত কর্ণধারের হাতে মোচড় খাইয়া যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছে।

আমার সমস্ত ভূমিকা, ভণিতা বা বক্তব্যের সার মর্ম—আমার স্বভাবমত চলিবার ও বলিবার অনুমতি আমি আপনাদের দশজনের দরবারে প্রার্থনা করিতেছি।

বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি নামে পরিচিত হইলেও আমরা ছিলাম বাঙালী, একথাটা স্মরণ রাখিতে আজ্ঞা হয়। আর দশজন বাঙালীর যে সমস্ত দোষগুণ থাকে, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম না। বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিতে যদি সত্যই কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আমাদেরও ছিল। তবু একটা বিষয়ে সাধারণ বাঙালী হইতে বিপ্লবীরা একটু স্বতন্ত্র ছিল। সেই স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য একটি কথায় ব্যক্ত করিলে বলিতে পারি—চরিত্র।

এই চরিত্র-শক্তিটুকু যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে বাঙলার ইতিহাস হইতে স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনের মূল ভিত্তিটিই অপসারিত হইবে এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের ইতিহাসের ভীড়ের মধ্যে ঝাঁকের কই-এর মত মিশিয়া যাইবে। বিপ্লবীদের চরিত্র-শক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুইটি বিশেষ উপাদান আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে একাধারে সৈনিক ও সাধক দুইটি চরিত্রের সম্মেলন দেখা যায়। বিবেকানন্দের মানসরসেই ইহা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গীতাই ছিল বিপ্লবীদের জীবনের আদর্শ ও পাথেয় একাধারে। পুরাতন বিপ্লবীদের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। গান্ধীযুগে যাঁহারা বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহুক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত অভিমত প্রযোজ্য নহে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবু সকলকে একত্রিত করিয়া একই পটভূমিকায় দাঁড় করাইয়া দেখিলে দেখা নিশ্চয় যাইবে যে, সৈনিক ও সাধক দুইয়ের মিশ্রণে মূলত বিপ্লবীদের চরিত্র গঠিত। এই চরিত্রশক্তির বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে আর দশজন বাঙালী হইতে ইহাদের তেমন কোন পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করিবার মত আমার দৃষ্টিতে পড়ে না।

বক্সা-ক্যাম্পে বন্দীদের তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যুগান্তর, অনুশীলন ও বাদবাকী-তৃতীয় পার্টি। ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতার চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা কিন্তু আমার নিজস্ব চোখে-দেখা পরিচয়, ইহাকে চরিত্র-কথা বা ইতিহাস বলিলে ভুল হইবে। আমি ঐতিহাসিক নই, একথা ভূমিকাতেই কবুল করিয়া রাখিয়াছি।

বক্সা-বন্দিশিবিরে আবদ্ধ কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে এবার আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব লইতেছি।

দুইটি কথা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন,—প্রথম, ইহা শুধু পরিচয়, ইংরেজীতে যাকে বলে introduction, কাজেই এই পরিচয়কে জীবনী বা ইতিহাস মনে করিবেন না। দ্বিতীয়, এই পরিচয়ে শ্রেণী বিভাগ বা তারতম্য কিছু করা হয় নাই। কে বড় কে ছোট, কার দান বেশী কার দান কম ইত্যাদি কোন প্রশ্নকেই এই পরিচয়ে আমল দেওয়া হয় নাই। এই পরিচয়ে মূল্য নির্ধারণের কোন মনোভাব বা প্রচেষ্টাই স্বীকৃত হইবে না, আমার চোখে দেখা ও কলমে-বলা এই পরিচয়, তাহার অধিক কোন মূল্য ইহার মধ্যে আপনারা যেন আবিষ্কারের চেষ্টা না করেন। আর সাধারণভাবে একটি কথা মনে রাখিবেন যে, ইহাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, ত্যাগে, দুঃখবরণে ও তেজস্বিতায় মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের যাঁহারা সমতুল্য।

আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাইবার পূর্বে ইঁহাদিগকে আমি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া লইলাম।

প্রথমেই যাহার সঙ্গে আপনি করমর্দন করিতেছেন, যদি অপরাধ না নেন, তবে বলিতে পারি যে, করমর্দন না করিয়া যাঁহাকে নমস্কার বা প্রণাম করা আপনার উচিত, তাঁহার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপ্লবী ও সরকারী উভয় মহলে যিনি মহারাজ নামে পরিচিত। সমস্ত বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে মহারাজকে গ্রহণ করিতে পারেন। সৈনিক ও সাধকে মিশাইয়া যে-উপাদানে বিপ্লবীদের চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, মহারাজের মধ্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। শান্ত, ধীর

ও গম্ভীর পুরুষ। গীতার অনাসক্ত পুরুষ বলিয়া এঁকে আমি মনে করি। পুলিন দাসের পর প্রকৃতপক্ষে ইনিই অনুশীলন-পার্টির ধারক ও বাহক ছিলেন এবং ইঁহাকে অনুশীলন-পার্টির মেরুদণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহার চরিত্রশক্তি বিরুদ্ধ দলেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড এবং জেল-আইনের যাবতীয় শাস্তি মহারাজের জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে। আন্দামানে প্রেরিত হইবার পূর্বে মহারাজের 'জেল হিস্টরী'-টিকিটে শেষের দিকে এই কয়টি লাইন লিপিবদ্ধ ছিল—

"He was one of the leaders of the Revolutionary Party—was suspected in 14 murders and dacoities. Very dangerous"

আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতাম যে, সরকারী কর্মচারীকে খুন করিবার পর মুহূর্তেই ইনি ছুঁচে সূতা ভরিতে পারেন, এমনই মহারাজের নার্ভ। ইহা অত্যুক্তি নয়, সত্যই মহারাজ চরিত্রের সংযমে ও শক্তিতে এমনই সংহত ও আত্মস্থ ব্যক্তি। ১৯০৮ হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে দীর্ঘ ৩০টি বছরই মহারাজ জেলে কাটাইয়াছেন। পৃথিবীর কোন দেশের কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে এত দীর্ঘকাল জেলে কাটাইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এদিক দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসেই মহারাজের একটি বিশিষ্ট আসন রহিয়াছে।

রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি বিপ্লবীদের কর্মপন্থার মধ্যে অবস্থার চাপে ও প্রয়োজনে গৃহীত হইয়াছিল। এই দুই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ও চেষ্টায় যিনি বাঙলার সমস্ত বিপ্লবীদের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, অতঃপর তাঁহার সঙ্গেই আপনাদের পরিচয় করাইতেছি। আমাদের বীরেনদার (চ্যাটার্জি) পরিচয় পূর্বেও কিছুটা প্রদত্ত হইয়াছে। ইনিও অনুশীলন-পার্টির সদস্য। গৌরকায় সুপুরুষ। গলার আওয়াজ বাঘের মত, এঘরে ডাক দিলে ওঘরে চেয়ারে বসিয়া চমকাইয়া উঠিতে হয়। যৌবনে এই ব্রাহ্মণতনয় কতবার যে মাঝি হইয়া নিশীথ রাত্রে ঝড়ের পদ্মা পাড়ি দিয়াছেন, সে

রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙলার বিপ্লবী ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় নিশ্চয় গ্রহণ করিতে পারে। একক বীরেনদার হাতে কম করিয়াও ১৮টি পুলিশ কর্মচারী ও গোয়েন্দা নিহত হইয়াছে, এদিক দিয়া বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যে ইঁহার জুড়ি নাই। আর ডাকাতি, এদিক দিয়াও বীরেনদার জুড়ি বিপ্লবীদের মধ্যে তো নাইই, পেশাদার ডাকাতদের মধ্যেও আছে বলিয়া মনে হয় না, থাকিলেও খুব বেশী নাই।

বীরেনদার একটি কীর্তি শ্রবণ করুন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর, সার্কুলার রোডে গীয়ারপার্কে (অধুনা লেডীস পার্ক) সন্ধ্যার সময়ে নরেন সেনের নেতৃত্বে অনুশীলন-পার্টির একটি গোপন জমায়েৎ হয়। কিছুক্ষণ পরেই সন্দেহ-জনক ব্যক্তিদের পার্কের বাইরে ঘুরাফেরা করিতে দেখা গেল। যে যেভাবে পারে সরিয়া পড়িবার অনুমতি পাইল। বীরেনদা রেলিং টপকাইয়া পার্কের দক্ষিণদিকের গলিতে পড়িতেই এক গোয়েন্দা কর্মচারী তাঁহাকে বাহু-বন্ধনে বুকে বাঁধিয়া লইল। এই অপ্রত্যাশিত প্রেমালিঙ্গন বীরেনদার আদৌ আরামপ্রদ বোধ হইল না। কোথা হইতে এক আপদ আসিয়া উপস্থিত। বয়সটা তখন তরুণ, শরীরে তখন অসুরের শক্তি, তদুপরি লাঠি খেলা, কুস্তি ইত্যাদিতে বেশ একটু অধিকার অর্জিত, সুতরাং এক ঝটকায় এই প্রণয়বন্ধন মুক্ত করিয়া বীরেনদা অন্ধকারে সরিয়া পড়িলেন।

কিন্তু মনে তখন চিন্তা, আসলে দুশ্চিন্তা মাথা ধরার মত চাপিয়া আছে যে, বন্ধুদের কি হইল। পার্শিবাগান গলি দিয়া বীরেনদা আবার সার্কুলার রোডে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, দলের নেতা নরেন সেনকে ধরিয়া পুলিশ দারোগার দল মারধর করিতেছে। নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অত্যাচার পথচারী বীরেন চ্যাটার্জী সমর্থন করিতে পারিলেন না।

আগাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ক্যা হুয়া, এই ভদ্রলোককে তোমরা মারতে হ্যায় কাহে। চোর হ্যায়, না ডাকু হ্যায়?"

পিছন হইতে বলিষ্ঠ বাহুতে এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকী-আলিঙ্গনে বীরেনদাকে জাপটাইয়া ধরিলেন। বীরেনদা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঝাটা লালমুখো এক সাহেব। বিদেশী বন্ধুর বাহুবন্ধন, দেশী লোক নয় যে, এক ঝটকায় মুক্তি আদায় হইবে। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কর্তব্য। যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষিতেই কাঁধের উপর দিয়া উঠিয়া আসিয়া লালমুখো সাহেব পুঙ্গব একটা অতিকায় লাসের মত ফুটপাতে চিৎ হইয়া পড়িলেন। এই লাশটি আর কেহই নহেন, বাঙলার পুলিশের ভবিষ্যৎ আই-জি মিঃ লোম্যান, তখন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার অব ক্যালকাটা পুলিশ।

পরবর্তীকালে লোম্যান যখন আই-বির বড় কর্তা, তখন বীরেনদার সঙ্গে একবার দেখা হইলে পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার মস্তবড় একটা ক্ষতি করেছ চ্যাটার্জী।"

—"কি ক্ষতি আমি আবার করলাম?"

—"রাগবী খেলাটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সেদিনের পর আর ও খেলায় আমি যোগ দিতে পারি নাই।"

বীরেনদা কহিলেন, "কেন? কি হয়েছিল?"

—"এমন প্যাঁচ দিয়েছিলে যে, ডান হাতের কব্‌জিটা চিরকালের জন্য জখম হয়ে গেছে।"

বীরেনদা অনুতপ্ত সুরে উত্তর দিলেন, "পিছন থেকে ধরতে গেলে কেন? সামনে থেকে ধরলে ল্যাং মেরে সরে পড়তাম, তাতে বড় জোর ঠ্যাংটায় একটু ব্যথা পেতে।"

বীরেনদা বয়স্ক ব্যক্তি, কিন্তু বন্দিসমাজে সকল বয়সেরই তিনি বন্ধু। আড্ডা হৈ হৈ ইত্যাদির মধ্যেই আছেন, খেলাধুলাতেও তরুণদের মতই আসক্তি। এত বড় কর্মী, অথচ কখনও কোনদিন তাঁহার মধ্যে সামান্যতম গর্বের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। নিজেই একদিন এক আড্ডায় আফশোষের ভঙ্গীতে বলিলেন, "না আমার অদৃষ্টই খারাপ, নেতা আর হওয়া হোল না,

রবি (সেন), মহারাজ, জ্ঞানবাবু, প্রতুলবাবু এঁরাই পথ আটকে রাখলেন। আমি নূতন একটি দল খুলব।"

আমরা বলিলাম, "আছি আমরা আপনার দলে।"

—"হেঁ, তবেই হয়েছে। দুদিনেই ঘাঁটি ভেঙ্গে যাবে, তোমরা তো প্রত্যেকেই এক একটি লীডার। না বাপু, এত ধাক্কা সামলানো আমার সাধ্য নয়।" বলিয়া প্রস্তাবিত পার্টিটা জন্মিবার আগেই তিনি ভাঙ্গিয়া দিলেন।

অতঃপর যে দীর্ঘকায় ব্যক্তি একমাথা পাকা চুল লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যাইতেছে। তিনি আমাদের মাস্টার মশায়, বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। জ্ঞানী ও গম্ভীর ব্যক্তি, অথচ রসিকতার রোগ বা স্বভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পড়াশুনা নিয়াই থাকেন, বেশীর ভাগ সময় শ্রীঅরবিন্দের বইই পড়েন! বন্দীদেরও পড়াশুনায় সাহায্য করেন। জেল্ জীবনের অত্যাচারে একেবারে চলৎশক্তিশূন্য হইয়াছিলেন। অধুনা চলাফেরা করিতে পারেন। তবে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠা-নামার সময়ে অপরের সাহায্য লইয়া থাকেন। সভা-সমিতিতে মাস্টার মশায়ের সভাপতিত্বের আসনটীতে একরূপ একচেটিয়া অধিকারই ছিল।

বাঙলা দেশে তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্ত উভয় নেতারই সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি ছিলেন। স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে-ক্ষতি মানসিক স্বাস্থ্যে ও তেজে ভগবান পূরণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিখ্যাত বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা মাস্টার মশায়েরই শিষ্য।

মাস্টার মশায়ের আর একটি পরিচয় আছে, যাহা বাইরের লোকে জানে না। তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য না হইয়াও অনুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন গুপ্ত-যোগী। মাঝে মাঝে কাহারও মুক্তির খবর, কিংবা পারিবারিক কোন আসন্ন ঘটনা মাস্টার মহাশয় বলিয়া দিতেন এবং তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিত। বেণুবাবু (রায়) একদিন মাস্টার মহাশয়কে সোজা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ভবিষ্যতের কথা কেমন করে বলেন?"

উত্তরে মাস্টার মশায় দুই ভুরুর সংগমস্থলে আঙ্গুল রাখিয়া বলেন, "এখানে একটা পাখী এসে বসে, সেই আমাকে বলে দেয়।"

তারপর যোগ করেন, "এস্থানটিকে কি বলে জান? একে আজ্ঞাচক্র বলে। এখানে একটি আকাশ আছে, সে-আকাশ খুলে গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখা যায়।"

আমি নিজে এই বিষয়ে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কোন আলাপ করি নাই। কিন্তু মাস্টার মশায়ের যোগসাধনা ব্যাপার সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে, তিনি নাকি একটি বিপজ্জনক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। মাস্টার মশায়ের মত নাকি এই যে, এই দেহকে সজ্ঞানে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আলোক বা জ্যোতির্লোকে পৌছানো যায় এবং যে কোন পথ দিয়াই দেহ-উত্তরণ সম্ভব। মাস্টার মশায় চিরাচরিত পন্থায় আজ্ঞাচক্রে বা হৃদয়ে ধ্যান বা মন-সংযম না করিয়া পায়ের পথেং নাকি মনকে চালনা করিবার পন্থা ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ঐ পথে যোগীদের পরিভাষায় 'শেষপাতাল' পার হইয়া জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হইবেন। অনেকের মতে মাস্টার মশায়ের চলৎশক্তি ও দৈহিক শক্তির বিপর্যয়ের নাকি এই যৌগিক প্রক্রিয়াই বিশেষ কারণ। আমি নিজে অবশ্য এই মত পোষণ করি না। আমার ধারণা, জেলের অত্যাচারই মাস্টার মশায়ের দৈহিক অসুস্থতার মূল কারণ। মাস্টার মশায় একদিন সুভাষচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তখন উভয়েই স্টেট-প্রিজনার, "এমন ঘুম দিব যে, মুক্তির ঠিক আগের দিন জাগব।" এই ঘুম অর্থে তিনি যে সমাধিকেই বুঝাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য তেমন ঘুম তিনি দেন নাই।—একদিক দিয়া বাঙলার বিপ্লবী সমাজে মাস্টার মশায়ের সমতুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ নাই, আমার বিশ্বাস।

তাঁহারই পাশে যে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন যে, স্বাধীন দেশে জন্ম লইলে ইনি নিশ্চয় জেনারেল বা ফিল্ড-মার্শাল হইতেন, তাঁহার নাম রবিবাবু (সেন)। ইনি অনুশীলন-পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা

বলিয়া পরিচিত। অত বড় দেহের মধ্যে যে-মনটি বসবাস করিতেছে, তাহাতে ঘোরপ্যাঁচের কোন হাঙ্গামা নাই। তেজস্বী নির্ভীক ব্যক্তি। চলনে বলনে একটা আন্তরিকতা সর্বদাই পরিস্ফুট। অল্প বয়সের বিপ্লবীদের মধ্যে যা কিছু একটা করিবার যে তীব্র বেগ ও জ্বালা থাকে, বয়স বৃদ্ধিতেও সেই জ্বালা ইঁহাকে ত্যাগ করে নাই। যাঁহারা সৈনিক ধাঁচের, তাঁহারাই বিশেষভাবে ইঁহার অনুরক্ত হইতেন। রবিবাবুর পরিচয় পূর্বে কিছু প্রদত্ত হইয়াছে। পরেও তাঁহার দেখা আপনারা আবার পাইবেন।

একটা খবর এখানে পেশ করিয়া রাখিতেছি যে, এই ভীমকায় ব্যক্তিটি ভোজনে প্রকৃতই বৃকোদর সদৃশ ছিলেন। ইনি ছিলেন পাঁঠার যম, দক্ষিণাদা একদিন ইঁহাকে সামনে বসাইয়া মাংস খাওয়াইয়াছিলেন—পরিমাণ দেখিয়া আমার তো ভিরমিই লাগিয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, প্রয়োজনীয় সময় দিলে প্রমাণ সাইজের একটা পাঁঠার সবটুকু মাংসই তিনি একা গ্রাস করিতে পারেন। বাঙালীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শক্তির বড়াই অবশ্যই তিনি করিতে পারেন।

তাঁহারই পাশে এবং তাঁহারও চেয়ে ইঞ্চিকতক লম্বা যে ভীমকায় ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে, তিনি আর কেহ নহেন, সন্তোষ দত্ত। স্কুলে থাকিতেই দেহের অস্বাভাবিক শক্তির জন্য অল্প বয়স সত্ত্বেও ডাকাতি ইত্যাদিতে অংশ নিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১১।১২ সালে পূর্ণ দাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র-মামলার আসামী হিসাবে ফরিদপুর জেলে আবদ্ধ অবস্থায় ইনি এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ করিলে তিনি এই বয়সেও লজ্জিত হইয়া পড়েন। ল্যাঙ্গোটি আঁটিয়া তিনি বদ্ধ ঘরের মধ্যে ব্যায়ামে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে জনৈক জেল-কর্মচারী বদ্ধ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। নেতৃস্থানীয় এক বিপ্লবীর সঙ্গে কি লইয়া কথা বলিতে বলিতে ভদ্রলোক উদ্ধত মেজাজে অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া বসেন। শুনিয়া বয়সে-অল্প কিন্তু দেহে-পূর্ণ ভীমকায় সন্তোষ দত্ত "তবেরে" আওয়াজ

ছাড়িয়া ল্যাঙ্গোটি-আঁটা নগ্ন সজ্জায় ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়াই লোহার গরাদ-দেওয়া আবদ্ধ দরজাটা দুই হাতে ধরিয়া এমন ঝাঁকানিই দিয়াছিলেন যে, জেল-কর্মচারী বোমা-খাওয়া মানুষের মত্ দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন দরজাটা ভাঙ্গিয়া দানবসদৃশ সন্তোষ দত্ত নির্গত হইলেন বলিয়া। তাই উঠিয়া মরি-কি-বাঁচি করিয়া দৌড় দিলেন এবং জেলগেটে উপস্থিত হইয়া তবে তিনি থামিলেন। সন্তোষবাবুর লজ্জার কারণ এই যে, ঐ লৌহ দরজা ভাঙ্গা দ্বাপরের ভীম অথবা ত্রেতার মহাবীর কারো পক্ষে সম্ভব নহে, অথচ কলির ভীমের এ হুঁশ ছিল না। তাই নিষ্ফল আক্রোশে লৌহ গরাদের উপরই তিনি শক্তিটা নিরর্থক ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সন্তোষবাবুকে এই আখ্যায়িকায় পরে অন্ততঃ আর একবার আপনারা দেখিতে পাইবেন।

জাহাজের গায়ে জালি-বোটের ন্যায় সন্তোষবাবুর গা ঘেঁষিয়া যে বেঁটে ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া আপনি ভাবিতেছেন যে, ইনি নিশ্চয় কোন গ্রাম্য কবিরাজের কম্পাউণ্ডার, তাঁহার নাম যতীন রায়। চেহারায় আপনি আকৃষ্ট হন নাই। নাম শুনিয়াও আপনি বিশেষ কিছু আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু পোষাকী নামের খাপ হইতে যদি এর আটপৌরে নামটা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাই, তবে আপনাকেও সচকিত হইতে হইবে। ইনি বরিশালের ফেগু রায়, ওরফে ফেগু ডাকাত। এই নাম শ্রবনে বরিশাল জেলায় এক সময়ে হিন্দু-মুসলমান কোন গৃহস্থই রাত্রিবেলা ঘরের বাহির হইত না, ঘরের মধ্যে হাঁড়ি-মালসাতেই নৈশকৃত্য সারিয়া রাখিত। বরিশাল জেলার বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা করিলে ফেগু ডাকাতের খবর আপনারা পাইতে পারেন। ইনি চা, পান, সিগারেট কোন নেশাই করেন না, অপরে যে করে তাহাও পছন্দ করেন না। যাঁর নামে গ্রামবাসীদের মনে এত আতঙ্ক সঞ্চারিত হইত, তাঁর নিজের মনটি অদ্ভুত। বন্দিশিবিরে দেখিয়াছি যে, যে দলের যে কেহই রোগে পড়িয়াছে, ফেগু রায় তার শিয়রে রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। খাদশূন্য ব্যক্তি, চরিত্রে নিষ্পাপ। জীবনে কথার খেলাপ ইনি করেন নাই। দধীচির হাড়ের খবর

রাখি না, কিন্তু ফেগু রায়ের হাড়েরও বজ্র তৈরী হইতে পারে, আমার বিশ্বাস।

তাঁহারই পাশে মজবুত গঠন, চওড়া বুক ও সাধারণ বাঙালীর দৈর্ঘ্য লইয়া যিনি দণ্ডায়মান, তাঁহার চোখের ও চোয়ালের দিকে নিশ্চয় আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইনি সুরেশচন্দ্র দাস, বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে কর্মী সংঘের নেতারূপে যিনি একদা একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়াছেন। চোয়ালে চরিত্রের দৃঢ়তা ব্যক্ত, চোখের দৃষ্টির সারমর্ম, 'কারো কাছে আমি কোন প্রত্যাশা করি না।' সত্য কথা স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কাহাকেও শুনাইতে ইনি দ্বিধা করেন না এবং বক্তব্য মোলায়েম বা প্রিয় করিয়া পেশ করিবার কোন বাহুল্যেই ইনি ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেন না। দলের বা বে-দলের দুঃখ-দারিদ্র্যে এঁর মত বান্ধব খুব কমই আছে। পথচারী পথিকের সঙ্গে ইনি যে-ভাষায ও ভাবে আলাপ করিবেন, স্বয়ং বড়লাটের সঙ্গেও সাক্ষাৎকালে তাহার ঈষৎ মাত্র পরিবর্তন ইনি করিবেন না, অর্থাৎ একই পোষাকে ও মূর্তিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপাত্রের সম্মুখীন ইনি হইবেন! সংগঠন শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দলের ভার এই জাতীয় ব্যক্তিই বহন করিয়া থাকেন। দেশের জননেতারা ইঁহাকে বেশ একটু সমীহ এবং ভয় করিয়াই চলিতেন। সুরেশদা যুগান্তর পার্টির অন্যতম নেতা।

তাঁহার পাশেই দীর্ঘকায় যে ভদ্রব্যক্তি দণ্ডায়মান, তিনি ময়মনসিংহের জ্ঞানবাবু (মজুমদার), অনুশীলন-পার্টির অন্যতম মাথা, ইংরাজীতে ব্রেন। কপালে বুদ্ধির চিহ্ন অতীব ব্যক্ত। জীবনে যে স্বল্প কয়টি বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে লোকে তেমন ভালোবাসে বলিয়া আমার ধারণা নাই। আমি কিন্তু মনে মনে জ্ঞানবাবুর জন্য একটা শ্রদ্ধাযুক্ত ভালোবাসাই বোধ করিতাম! যেদিন জ্ঞানবাবুকে খেলার মাঠে দেখি, তখনই আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। ফুটবল খেলায় এই বয়স্ক, ধনী, ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে উঁচুদরের স্টাইল

দেহের গতিভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি আবিষ্কার করিলাম যে, ইনি আসলে বুদ্ধিজীবী নহেন, এঁর সত্তার গভীরে একজন আর্টিস্ট একাকী বসবাস করিয়া থাকে। জ্ঞানবাবুর এই পরিচয় তাঁহার বন্ধুদের নিকটও হয়তো অজানা রহিয়া গিয়াছে। বাংলার প্রধান মন্ত্রীর আসনে জ্ঞানবাবুকে উপবিষ্ট দেখিলে আমি অন্তত অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চ-পদাধিকার বলিয়া তাহা মনে করিতাম না। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বড় বড় ডাকাতিতে জ্ঞানবাবু অংশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানবাবুর পাশে যিনি দণ্ডায়মান, দেখিলেই যাঁহাকে স্মার্ট, চট্‌পটে, সর্ব অবস্থায় সদা প্রস্তুত ও সপ্রতিভ বলিয়া মনে হইবে, তাঁহাকে আপনারা নিশ্চয় চিনেন ও জানেন। তিনি ভূপতিদা (মজুমদার)। বয়স্কদের মধ্যে-ফুটবল খেলায় ইঁহার জুড়ি নাই। যৌবনে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় ছিলেন। আসরে গল্প জমাইতে ভূপতিদার সমকক্ষ ব্যক্তি সকল সমাজেই খুব কম আছে। এঁর ইংরেজী ভাষার উপর দখল অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করিবে। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জীর ইনি সহকর্মী ও যুগান্তর-পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, তখন সিঙ্গাপুরে গোপনে গমন করেন। সেখানে বন্দী হন এবং ঠিক বলিতে পারি না, সিঙ্গাপুর দুর্গ হইতে হয়তো ইনি পলায়নই করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতা এঁর চরিত্রে নাই। চরিত্রে ভূপতিদা ছিলেন আসলে কবি ও সাহিত্যিক। আনন্দই ছিল ইঁহার বিধিদত্ত সাধনা, কিন্তু তার বদলে ইনি দেশের স্বাধীনতাকেই তরুণ বয়সে জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করেন। জেল-জীবনে ভূপতিদাকে পাশে পাওয়া মানে দুঃখ, চিন্তা ও ভাবনার হাত হইতে রেহাই পাওয়া। এই খেলোয়াড় আর্টিস্টকে শুধু একা আমিই নয়, দল-নিরপেক্ষভাবে আরও অনেকেই নিজের পরম নিকট-আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

তাঁহার পাশেই গৌরকায় যে সুদর্শন ব্যক্তিটিকে দেখিতেছেন, তাঁহাকে আপনাদের না-চেনার কথা নহে। ইনিই প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী), দীর্ঘদিন

যাবত অনুশীলন-পার্টির মুখপাত্ররূপে পরিচিত। রাজনীতি ব্যতীত জীবনে প্রতুলবাবুর যে অন্য কোন আকর্ষণ আছে, তাহা আমার মনে হয় নাই। অবশ্য দুপুরে পাশার আসরে তিনি অবতীর্ণ হইতেন। অনুশীলন পার্টির নেতৃবর্গের মধ্যে জনসাধারেণের নিকট প্রতুলবাবুর নামই সমধিক পরিচিত। প্রতুলবাবুকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া বিপ্লবীমহলে প্রতুলবাবুর প্রসিদ্ধি আছে। আমার ধারণা, দল গঠনে ইঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্য রহিয়াছে।

প্রতুলবাবুর পাশেই চশমা-চোখে যে ভদ্রলোককে দেখিতেছেন, ইনিই অরুণবাবু (গুহ)। ইঁহার নামের সঙ্গে আর একটি নাম অবশ্যই যুক্ত হইবে—তিনি হইলেন ভূপেন দত্ত, ঐ কিছুদূরে যিনি জীবনবাবুর (চ্যাটার্জি)। পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। অরুণবাবু ও ভূপেনবাবু দুই বন্ধু। এই বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই সকলে মনে করে। অরুণবাবু বয়সে বড় এবং প্রকৃতিতে দুই বন্ধুর খুব সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। অরুণবাবুর মুখে আমি হাসি দেখি নাই, আর ভূপেনবাবুর মুখে মৃদু সুন্দর হাসি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। অরুণবাবুকে লোকে এড়াইয়া চলিত, ভূপেনবাবুর পাশে লোক আপনা হইতেই আগাইয়া যাইত। দলের বাহিরের লোকের সঙ্গে অরুণবাবু তেমন মেলামেশা করেন না। পার্টির লোকের সমস্ত রকম সুবিধা-অসুবিধার খবর ইনি তন্ন তন্ন করিয়া লইতেন। পার্টিই অরুণবাবুর ধ্যান ও জ্ঞান। পার্টির স্বার্থ ও সুনাম ইনি যেন যক্ষের মত পাহারা দিতেছেন, এমনই মনে হইত। বাহিরের লোকের কাছে এঁর হৃদয়ের পরিচয় কিছু নাই, কিন্তু পার্টির লোকের নিকট এঁর হৃদয় অবারিত। অরুণবাবুর প্রকৃতির লোকের হাতেই পার্টির ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মে গিয়া ন্যস্ত হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলে অরুণবাবু যে ভবিষ্যতে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইবেন, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। ইনি যুগান্তর পার্টির অন্যতম নায়ক।

এই সুযোগে অরুণবাবুর বন্ধুর পরিচয়ও সারিয়া রাখা যাইতেছে। যে কয়জন ব্যক্তির পড়াশুনা খুব বেশী বলিয়া জেলে খ্যাতি ছিল, ভূপেনবাবু তাঁহাদেরই একজন। ভূপেনবাবু ছাত্রহিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, ইংরেজী ভালো লিখিতে পারেন বলিয়া বন্দিমহলে স্বীকৃত। ভূপেনবাবুকে দেখিলেই আমার মনে স্বল্পবাক ও স্মিতহাস্যমণ্ডিত এক তেজস্বী মূর্তি উদ্ভাসিত হইত। ভূপেনবাবু সত্যিকার তেজস্বী ব্যক্তি, তাঁহাকে ভাঙা চলে কিন্তু নোয়ানো চলে না। তেজ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সংমিশ্রণে ভূপেনবাবুর যে-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ভূপেনবাবু স্বভাবে লাজুক। এই শক্তিমান পুরুষ ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিতে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, বক্সা-ক্যাম্পে বহুবার এই কথা আমার মনে জাগ্রত হইয়াছে।

তাঁহার পাশেই দীর্ঘনাসা বেঁটে-খাটো যে-ভদ্রলোক ফতুয়া গায়ে বিড়িমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই জীবনবাবু (চ্যাটার্জি)। মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে বিপ্লবের গুপ্তকেন্দ্রগুলি বহুলাংশে ইঁহারই সৃষ্টি। ইনি নিরভিমান, সত্যিকার ত্যাগী, ধন-যশ-ক্ষমতার লোভ ইঁহার মনে স্থান লইতে পারে নাই। আদর্শ চরিত্রের জন্য জীবনবাবুকে শ্রদ্ধা আমরা সকলেই জানাইতে বাধ্য। দরদ ও সহানুভূতিতে হৃদয় এঁর পূর্ণ। অনলস কর্মশক্তি দিয়া ভগবান এঁকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কারাজীবন-যাপনে এঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জীবনবাবুকে যদি নাম দিতে হয়, তবে আশুতোষ বা ভোলানাথ নামই তাঁহার উপযুক্ত। অল্পেই ইনি সন্তুষ্ট এবং স্বভাবে ইনি বৈরাগী।

পরিচযের পালা এখনও শেষ হয় নাই, আপনাদের একটু কষ্ট করিয়া আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

ঐ যে ঢিলা ও লম্বা হাফসার্ট গায়ে হৃষ্টপুষ্ট বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার নাম হেমচন্দ্র ঘোষ। নিজে কুস্তিতে ওস্তাদ এবং ইতিহাস-অধ্যয়নেই এঁর বিশেষ আসক্তি। নিজের একক

চেষ্টায় ইনি যে-দলটি গঠন করিয়াছিলেন, বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায় তাঁদের দানে সমৃদ্ধ। মূলে ইনি যুগান্তর-পার্টির লোক। এঁর দলের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিবার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন। এঁর দলই "বি ভি" (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার) ও "শ্রীসংঘ" এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই দুই ভাগের তিনজন ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছি, তাহা হইতেই হেমবাবুর পরিচয় পাইবেন—ভূপেনবাবু (রক্ষিত রায়), সত্যবাবু (গুপ্ত) ও অনিলবাবু (রায়)। প্রথম দুইজনই বিখ্যাত বি-ভির নেতা। ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর জেলার কয়টি ম্যাজিস্ট্রেট এই দলের হাতেই প্রাণ দেয়। লোম্যান হত্যাকাণ্ড, রাইটার্স বিল্ডিং-এ জেল বিভাগের আই-জির হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীগণ এই বি-ভিরই সদস্য। ফল দিয়া বৃক্ষের পরিচয়, এই সংকেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর প্রকৃত পরিচয় আপনারা পাইবেন।

দুই বন্ধুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় এই সঙ্গেই করাইতেছি। তাঁহারা হইলেন ভূপেনবাবু (রক্ষিত) ও সত্যবাবু (গুপ্ত), বিনয়-দীনেশ-বাদল এই ত্রয়ীর নেতা। সত্য গুপ্তের মানসিক গঠন সৈনিকের, চরিত্রেও তিনি সৈনিক। নির্ভীক, তেজস্বী ব্যক্তি তিনি। বিপ্লবীদের মধ্যে মিলিটারী মানুষ বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। সাধারণের নিকট তিনি মেজর গুপ্ত বলিয়া পরিচিত। সরল মনখোলা মানুষ, কথার মারপ্যাঁচের কোন ধার ধারেন না, কিছু একটা করিতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট।

আর ভূপেনবাবু শান্ত, সংযত ও স্বল্পবাক্। শিক্ষা অর্থে যদি মনের সুরুচিকে বুঝায়, তবে ডেটিনিউদের মধ্যে ভূপেনবাবুর সমকক্ষ ব্যক্তি খুব কমই আছে। এত মার্জিত ও ভদ্ররুচির মানুষ আমি নিজে বেশী দেখি নাই। এঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বয়স্কদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। অত্যন্ত দৃঢ়সঙ্কল্পের মানুষ বলিয়া এঁর খ্যাতি আছে। ভূপেনবাবুর প্রকৃত পরিচয় তিনি সাহিত্যিক, তিনি গুণী, তিনি সুন্দরের উপাসক। সুন্দরের উপাসক কেন যে

প্রলয়ংকর শংকরের পূজারী হইলেন, এ প্রশ্ন আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

এখন আমরা যাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তাঁহার নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি অনিলবাবু, পূর্বোক্ত শ্রীসংঘের নেতা। স্বাস্থ্য দেখিয়া যাহা আপনার মনে হইয়াছে, তাহা ঠিকই, ইনি কুস্তিগীর পালোয়ান ব্যক্তি। এ গেল বাহ্যিক পরিচয়, চোখ থাকিলেই নজরে পড়ে। ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ও সাহিত্য রসিক, কবিতা ও প্রবন্ধ উভয় বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি আছে, সঙ্গীত শাস্ত্রেও পড়াশুনা নাকি গভীর, দর্শন ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ, এক কথায়, অনিলবাবুর মধ্যে বিভিন্ন ও বিপরীত বহু বিষয়ের একটা সমাবেশ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ইনি। যদিও বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনে প্রবীণদের তুলনায় নবাগন্তক বা নবীন, তথাপি বিশেষ সম্ভাবনা লইয়াই ইনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সর্বদাই মনে হইয়াছে যে, ইনি পথ ভুল করিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। এঁর স্থান বিপ্লবের ক্ষেত্র নহে, এঁর প্রকৃত স্থান ছিল দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ইনি স্বধর্মচ্যুত, এই ধারণা আমার মনে বরাবরই আমি পোষণ করিয়াছি।

এখন আপনাদের আমি যুগান্তর-পার্টির 'ত্রিশূলের' সঙ্গে পরিচয় করাইতে চলিয়াছি। 'ত্রিশূল' কথাটির ব্যাখ্যা আবশ্যক। ছ' নম্বর ব্যারাকটি একান্ত-ভাবে যুগান্তর-দলের দখলে ছিল। ভোরের দিকে ছ' নম্বরের নয়নাঞ্জনবাবুর সীটে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম, এমন সময় দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়াই নয়নাঞ্জনবাবু একটু জোরে বলিয়া উঠিলেন—"ত্রিশূল"। কোণের সীট হইতে ভূপেন মজুমদারের গলার আওয়াজ শুনিলাম—"শাল?" নয়ানবাবু উত্তর দিলেন, "শেল।" ইতিমধ্যে পূর্ণবাবু (দাস) ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন। ব্যাপারটা অনুমানেই কতকটা বুঝিয়াছিলাম যে, ইঁহারা সাংকেতিক ভাষায় একে অপরকে সতর্ক করিতেছেন। চুরুট-সিগারেটের অভ্যাস অনেকেরই ছিল, তাহা ছাড়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার বিষয় ও বক্তব্যও সব সময়ে গুরুজনদের

শ্রুতি-যোগ্য নহে, তাই যুগান্তর-পার্টির প্রথমতম ত্রয়ীর একত্রে 'ত্রিশূল', আর পৃথকভাবে শাল, শেল ও শূল এই সাংকেতিক নাম ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত। 'শাল' হইলেন মনোরঞ্জনবাবু (গুপ্ত), 'শেল' পূর্ণবাবু এবং 'শূল' হইলেন মধুদা ওরফে সুরেনবাবু (ঘোষ)।

শালের সঙ্গে পরিচয় করুন। বাঙালদের ভাষায় শাল শব্দের একটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে, যেমন শাল দিয়াছে বা শাল ঢুকিয়াছে। শুধু গোঁজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারও অধিক কিছু শালে আছে। মনোরঞ্জনবাবু প্রকৃতই শালসদৃশ। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ইনি যুগান্তর-পার্টির স্তম্ভসদৃশ। অকপট মানুষ, দুর্দমনীয় সংকল্প এঁর চরিত্রের মূল উপাদান। চোখ-মুখের ভাব দেখিলেই বুলডগের কথা মনে আসে, বোমার আঘাতে এঁর মুণ্ড ছিন্ন করা চলে, কিন্তু এঁর কামড় আলগা করা চলে না। এঁর সংকল্প শক্তিতে ইনি দলের আদর্শস্থানীয়। ১৯৩০ সালে এঁরই নেতৃত্বে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের শংকর-মঠের মানুষ ইনি এবং যতীন মুখার্জীর সহকর্মী। নিরভিমান ব্যক্তি, দলের প্রধানতম এক স্তম্ভ হইয়াও ইনি দলাদলিতে অনভ্যস্ত এবং ১৯২৮ সালে অনুশীলন-যুগান্তর দুই পার্টির একত্রীকরণে এঁর আন্তরিক চেষ্টা বহুলাংশে দায়ী। বরিশাল জেলায় বিপ্লব আন্দোলনের এঁকে প্রাণ বা মূলখুঁটি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

এবার শেলের সঙ্গে পরিচয় করুন। পূর্ণ দাস নামটি জনসাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত পরিচিত। ফেগু-ডাকাতের মত এঁরও নিজ জেলায় ডাকাত বলিয়া এক বিভীষিকা-উৎপাদক পরিচয় প্রচারিত। ইনি যুগান্তর পার্টির একদিক দিয়া সর্বাধিক বলিষ্ঠ স্তম্ভ। যুগান্তর পার্টির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে ইঁহার একক দান সকলকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। বালেশ্বরে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জীর চারজন সঙ্গীর মধ্যে তিনজনই এঁর শিষ্য। ইনিই বিখ্যাত চিত্তপ্রিয়-নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জনের নেতা। বিপ্লবীদের মধ্যে দীর্ঘদিন জেলবাসে ত্রৈলোক্য মহারাজ যেমন পুরোভাগে, জেল-গমনের সংখ্যা বা বারে তেমনি ইনিই

পুরোভাগে। এঁরও জেলজীবন ত্রিশ বছর না হইলেও খুব কম নহে, পঁচিশ বছরের উপরে তো বটেই। বিপ্লবীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে গান্ধীজীর নন্‌কো-পারেশন আন্দোলনে যোগদান করেন।এই সময়ে বিখ্যাত 'শান্তি সেনা' প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করেন, সারা বাঙলায়, সকল জেলায় এবং আসামেও ইঁহারই নিয়ন্ত্রিত প্রায় ২০ হাজার শান্তি-সেনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যেই শুধু নহে, সারা বাঙলাতেও এঁর মত সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই। এদিক দিয়া পূর্ণ দাস প্রকৃতই প্রতিভা।

এবার আপনারা শূলের সম্মুখান হউন। শূল শুনিয়া ভয় পাইবেন না, এঁর আসল পরিচয় এঁর ডাক নামটির মধ্যেই ব্যক্ত—মধু ঘোষ। চোখেমুখে স্মিত হাসি, পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার, এঁর বৈশিষ্ট্য। যাদুগোপাল মুখার্জী সর্বজনস্বীকৃত নেতা হইলেও কর্মক্ষেত্রে স্থরেনবাবুই পার্টির নেতা। এঁর মধ্যে সৈনিকের চেয়ে সাধকই অধিকতর অভিব্যক্ত। বাঙলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যে কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, স্থরেনবাবু তন্মধ্যে অন্যতম। ১৯২৩ সালে ইনিই ছিলেন দেশবন্ধুর প্রকৃত পরামর্শদাতা বা দক্ষিণ হস্ত। বিবাদ মিটাইতে, সমস্যার সমাধান কারতে সকলকে একত্রিত করিয়া একযোগে কাজ করিতে স্থরেনবাবুর সহজাত নৈপুণ্য ছিল। এঁর বন্ধু-প্রীতি অনুসরণ করিবার মত বস্তু। পরে ইনিই দীর্ঘ কয়েক বৎসর বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। স্থরেনবাবুর আর একটি পরিচয় আছে, বিপ্লবী হইয়াও চরিত্রে ইনি ব্রাহ্মণ। জেল জীবনেই স্বপ্নে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং মুক্তির পরে পণ্ডিচেরীতে স্থায়ী আশ্রমবাসীরূপে বসবাস সংকল্প ইনি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা ও অবস্থার চক্রান্তে কর্মজীবন হইতে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। অনুশীলন-যুগান্তর উভয় দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধুদাকেই আমি সর্বাধিক আপনজন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম দলের বিরোধ সত্ত্বেও। আমার মনে হয়, রাজনীতি হইতে আশ্রম-জীবনেই মধুদার সত্যিকার স্থান।

পরিচয়ের পালা শেষ করিয়া আনিয়াছি, এখন আর একজনের সঙ্গে পরিচয়

হইলেই আপনাদের ছুটি। ভদ্রলোকের নাম পঞ্চানন চক্রবর্তী, জন্মে ব্রাহ্মণ, কিন্তু স্বভাবে ক্ষত্রিয়। এঁকে মহাক্ষত্রিয় আখ্যা দিতে অন্ততঃ আমার কোন দ্বিধা নাই। আমার সমগ্র জীবনে এঁর মত তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষের সাক্ষাৎ পাই নাই। সাহসের জন্য এঁকে সাধনা করিতে হয় নাই, ভয়শূন্য হইয়াই ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিপদ দেখিলে এঁর একটা স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ জন্মিয়া থাকে। এই কারণে দেশবন্ধুর বিশেষ স্নেহ ইনি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এঁর জীবন ঘটনাবহুল। ১৯২৩ সালে এঁর সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের উক্তি ছিল—"The most turbulant youngman of Bengal." এই মহাক্ষত্রিয়ের মধ্যে একজন সাহিত্যিক ও দার্শনিক লুক্কায়িত রহিয়াছে। বাঙলার জেল-আইনের একটি বিশেষ সংশোধনের সঙ্গে এঁর নাম জড়িত। ব্যাপারটি এই—

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ছয় শতের উপর বন্দী ফরিদপুর জেলে আবদ্ধ করা হয়। জেলে স্থানাভাব দেখা দেয়, তিন শত বন্দীর থাকিবার মত জায়গায় এই বৃহৎ সংখ্যাটিকে ঠাসিয়া ভরা হয়। ফলে স্বদেশীদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের ঠোকাঠুকি, তার ফলে একদিন সন্ধ্যাকালে শ কয়েক বন্দী বাঁকিয়া বসিলেন যে, তাঁহারা ঘরে বন্ধ হইবেন না। জেলার বিপদে পড়িলেন, অনুনয় বিনয়ে কোন ফল দিল না, অবশেষে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফোন করেন। উত্তর পাইলেন,

"Go home and get sound sleep. I have managed German prisoners. They are Bengali Babus. I am coming to-morrow morning."

ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ হগ সাহেব, পরে যিনি আসামের গভর্ণর হন।

পরদিন ভোর বেলা তিনি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া জেলে ঢুকিলেন। জেল-গেটে জেলারকে হুকুম দিলেন whipping Triangle খাটাইতে।

তারপর তিনি বন্দীদের মহলে প্রবেশ করিয়া এক হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। মুখে তাঁর একমাত্র হুকুম—'সেলাম দেও।' পরে সকলকে জেলের ঘরে জোর করিয়া ঠেলিয়া বন্ধ করিলেন, বাহিরের সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে। শ'দেড়েক বন্দীকে বাছিয়া আনিয়া জেল অফিসের সম্মুখে খোলা মাঠে আনিয়া রৌদ্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইলেন।

এই সময়ে পঞ্চাননবাবু প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইলেন। ব্যাপারটা অনুমানেই বুঝিয়া লইলেন, সম্মুখে বেত মারার কাঠের খাঁচাটা তিনঠ্যাংয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আসিয়াই পঞ্চাননবাবু সারিবদ্ধ বন্দিদের লাইন ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং ঠেলিয়া নিজেই একধার হইতে লাইন ভাঙিতে লাগিয়া গেলেন।

মিঃ হগ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটা কে?"

জেলর বলিলেন, "স্যার, এই সেই পঞ্চানন চক্রবর্তী।"

"হুঁ। পাকড়াও।"

হুকুমমত জনচারেক সিপাহী পঞ্চাননবাবুকে জাপটাইয়া ধরিল।

সাহেব বলিল, "সেলে নিয়ে যাও।"

আবার বন্দিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। সাহেব প্রত্যেকের সম্মুখে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সেলাম দেবে কি না?"

সকলেই নিরুত্তর। সাহেব নিজেই বাছিয়া ত্রিশজনকে লাইনের বাহিরে লইয়া আসিলেন। তারপর জোড়া জোড়া করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন। একের পিছনে অপরে এইভাবে পনর-জোড়া বন্দী তেপায়া কাঠের খাঁচাটাকে সম্মুখে রাখিয়া রৌদ্রে উপবিষ্ট রহিলেন! প্রথম জোড়ার একটিকে আপনারা চিনিবেন, তিনিও বর্তমানে বকসাক্যাম্পে আছেন, নাম বিজয় দত্ত, পঞ্চাননবাবুর বন্ধু। শক্তিতে ও দেহে ইনি আমাদের রবিবাবু ও সন্তোষ দত্তেরই সম-শ্রেণীর।

বিজয় দত্তের জুড়িকেই গিয়া মিঃ হগ প্রথমে বলিলেন, "খাড়া হও।"

যিনি খাড়া হইলেন, তিনি একটি স্কুলের হেডমাস্টার, নাম সুরেন্দ্র সিংহ।

মিঃ হগ বলিলেন, "সেলাম দিবে কিনা বল?"

হেডমাস্টার উত্তর দিলেন যে, নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ দিতে হইবে, গান্ধীজীও "আদর্শ কয়েদী" বলিয়া যে-আচরণের পরামর্শ দিয়েছেন, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ বন্দিরা পাইবে।

মিঃ হগের অত ধৈর্য ছিল না, ধমকের সুরে বলিলেন, "আবহি বল।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এইভাবে বলিলে সেলাম দেওয়া সম্ভব নহে।"

—"বহুৎ আচ্ছা।"

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অতঃপর হেডমাস্টারকে উলঙ্গ করিয়া কাঠের তেপায়া খাঁচাটার উপর তোলা হইল, হাত, পা, কোমর যথারীতি বন্ধনও করা হইল।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে সাহেব হুকুম দিলেন, "পঞ্চানন চকরবর্টীকে নিয়ে এস।"

সেল হইতে পঞ্চাননবাবুকে বাহির করিয়া আনা হইল, তিনি আসিয়া সাহেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সমস্ত আবহাওয়াটা আতঙ্কে ও ভয়ে থম্-থম্।

সাহসের অভাব না হইলেই যে শরীরিক সহ্য শক্তি বেশী হইবে, এমন কোন কথা নাই। দীর্ঘ বেত সপাং শব্দে হেড-মাস্টার মশায়ের দেহে কষিয়া বসিতেই তিনি এমন মর্মান্তিক আর্ত-চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত স্থানটিরই যেন হৃদপিণ্ড হঠাৎ ধক্ করিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সাহেবের মুখে একটা দানবীয় চাপা-হাসি প্রকাশিত হইল।

পরে শুনিয়াছি যে, এই চীৎকারে জনৈক বয়স্ক উকীলের (তিনি সেলে বন্ধ ছিলেন।) নাভির নীচের স্নায়ুবন্ধন শিথিল হইয়া কাপড় ভিজাইয়া দিয়াছিল। নেতাদের মধ্যে পূর্ণ দাস, তমিজদ্দিন খাঁ (বর্তমানে পাকিস্থান গণ-পরিষদের সভাপতি) সুরেন বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিগণও এই চীৎকারে যে

ভয়, আতঙ্ক ত্রাস জেলের সর্বত্র বিস্তারিত হইয়াছিল, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মত তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন।

পনর বেত মারার পর হেড-মাস্টারকে তিনঠ্যাংয়ের বেতমারার ত্রিভুজ হইতে মুক্ত করিয়া নামানো হইল। দেহটা ডাক্তারের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

পৈশাচিক তৃপ্তি ও দানবীয় দৃঢ়তা লইয়া হগ সাহেব অতঃপর পঞ্চাননবাবুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কহিলেন, "সেলাম দেবে ?"

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে যে আমার সেলাম চাও ?"

উত্তর হইল, " আমি ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ।"

পঞ্চাননবাবু বলিলেন, "তুমি তো একটা ক্ষুদ্র ম্যাজিস্ট্রেট ! তোমার সমস্ত ব্রিটিশজাতিকে নিয়ে এস ।"

হগ সাহেব কাঠের খাঁচাটার দিকে হাতের ছড়িটা দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "দেখেছ ?"

পঞ্চাননবাবু হগ সাহেবের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, —"বেত ? বেতের কথা কি বলছ। তোমার বেয়নেট ও বুলেট নিয়ে এসে প্রশ্ন কর, তারপর দেখ সেলাম পাও কিনা।"

সাহেব হুকুম দিলেন, "অলরাইট টাঙ্গাও।"

দীর্ঘ বেত সপাং সপাং শব্দে পঞ্চাননবাবুর উপর পড়িতে লাগিল, সাহেব গণিয়া চলিলেন, এক, দো, তিন···। চৌদ্দকে ভুল করিয়া সাহেব পনর গণিলেন। একটি শব্দও পঞ্চাননবাবুর মুখ হইতে নির্গত হয় নাই, সংখ্যা গণনায় ভুল বোধ হয় এই কারণেই হইয়া থাকিবে।

দুই হাতের, দুই পায়ের ও কোমরের বন্ধনী খুলিয়া লইতে রক্তাক্ত দেহে

পঞ্চাননবাবু নামিয়া আসিলেন। টলিতে টলিতে মিঃ হগের সম্মুখে আসিয়া একেবারে তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইলেন।

তারপর বলিলেন, "well Mr. Hogg, have you got your salaam ?"

মিঃ হগ নিরুত্তর, তারপর হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে তিনি জেল গেটের অভিমুখে রওনা হইলেন। যতদিন তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, আর ফরিদপুর জেলে প্রবেশ করেন নাই।

এই ঘটনা ভারতবর্ষের মহানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, গান্ধীজী তাঁহার Young India'-তে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে মন্তব্য করিলেন, "জালিওয়ানালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য তত দুঃখ আমার হয় না, কিন্তু পাঞ্জাব সেদিন বুকে হাঁটিয়াছিল, বাঁশের দণ্ডে স্থাপিত টুপিকে সেলাম করিয়াছিল, একটি প্রতিবাদও পাঞ্জাবে সেদিন হয় নাই। আজ ফরিদপুর জেলে এক তরুণ বাঙালী অন্যায় অসম্মানের সম্মুখে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না, এ হুকুম মানি না।"

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইহার কয়েক মাস পরে কলিকাতা আসেন, দেশবন্ধু তখন মুক্ত, বলেন, "দাশ, আমি সেই ছেলেটিকে দেখতে চাই।"

দিন কয়েক হয় পঞ্চাননবাবু আলিপুর জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন, দেশবন্ধুর গৃহে বৃদ্ধ পণ্ডিতজী পঞ্চাননবাবুর এক ফটো তুলিয়া লন, বলেন, "এই ফটো আমি আমার টেবিলে রাখব।"

ইহার পর হইতেই রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে "সরকার সেলাম" প্রয়োগ নিষিদ্ধ হয়। যত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীই হউক, কোন ক্ষেত্রেই সেলাম দিবার জেল-আইন রাজনৈতিক বন্দীদের অতঃপর আর পালনীয় নহে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়। ১৯৩০ সালের আয়ু কাজেই একদিন ফুরাইয়া গেল, ১৯৩১ সাল আসরে আসিয়া দেখ দিল।

প্রথমেই মনে বাঙালদের ভাষায় 'কামড়' মারিল যে, না জানি এ-ভাবে জেলে কত সালকেই পুরোনো বলিয়া বিদায় দিয়া নূতন সালকে অভ্যর্থনা করিতে হয়। মনকে অবশ্য প্রবোধ দিলাম যে, মুক্তির দিন একটা বছর আগাইয়া রাখা গেল। মুক্তির দিন যত দূরেই রহুক, একটা বছর পার করিয়া একটা বছর তার নিকটবর্তী হইয়াছি, ইহাকে হাতের পাঁচ বলিয়া মনে করিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় ছিল। এই সান্ত্বনা লইয়াই ১৯৩১ সালকে 'আস্তে আজ্ঞা হোক্' বলিয়া আমরা সম্ভাষণ জানাইলাম।

মাস কতক পরে বাঙলা নূতন সাল ১৩৩৮ দেখা দিল। নূতন বছর আমার জন্য একটি উপঢৌকন আনিয়াছিল। এই সালটি আমার জীবনে স্মরণীয় বৎসর, এই বৎসরে আমার জীবনে একটি পরমপ্রাপ্তি ঘটে। জেলখানাতে পরমপ্রাপ্তি? কেন, তাহাতে বাধা আছে কিছু? 'পরমপ্রাপ্তি' যেখান হইতে প্রেরিত হয়, সেখানকার দানের স্বভাব সম্বন্ধেই তো প্রবাদ প্রচলিত, "যো দেতা হ্যায় ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা হ্যায়।" এতই পারে, আর জেলখানাতে দিতে পারিবে না, একি একটা কথা হইল!

একটু বিনয় প্রকাশ করিতে হইল। ব্যাকরণের 'উত্তমপুরুষ' কথাটা আপনাদের মনে আছে আশা করি। সেখানকার ভূমিকা ও কৈফিয়তটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইতে আজ্ঞা হয়। কারণ, উত্তমপুরুষের মানে আমার নিজের কথা কিছু এবার আসিয়া পড়িবে। নিজের কথা বলিয়াই যে তাহাদের আগমনে আপত্তি করিব, আমার ব্যবহারে এমন পক্ষপাতিত্ব আপনারা আশা করিবেন না।

২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হইবে। সমগ্র জাতি

এই উপলক্ষে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিরাট ব্যাপার ও বিরাট উৎসব, তাই অনুষ্ঠানের তারিখটি জয়ন্তী-উৎসবের কর্তৃপক্ষ পিছাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ঠিক করিলাম যে, ২৫শে তারিখেই আমরা কবিগুরুর জয়ন্তী-উৎসব পালন করিব।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশের লোকের ও স্বদেশীদের কি মনোভাব, তাহা আপনারা নিশ্চয় জানেন। এখনও যদি না জানিয়া থাকেন, তবে আর খামোকা চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট নাই বা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা লিখিতেছি না। কবিগুরু সম্বন্ধে আমর ব্যক্তিগত ধারণাটা এই সুযোগে এখানে পেশ করিয়া রাখিতে চাই। আশা করি, আমার মতামত একান্ত আমারই বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কলহের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন না।

পড়াশুনা আমার খুব বেশী, এমন অহংকার আমি করি না। আপনাদের আশীর্বাদে যতটুকু বিদ্যাচর্চার দুর্ভোগ আমার হইয়াছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমার প্রথম অভিমতটি ব্যক্ত করিতেছি। ব্যাসদেবের পর ভারতবর্ষে এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা আর আসেন নাই, কবিগুরু সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। যুক্তি দিয়া এ-ধারণা পরিবর্তন আপনারা করিতে পারিবেন না। আমি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহা আর রদবদলের অবকাশ নাই।

আমার দ্বিতীয় ধারণা, বর্তমান যুগে উপনিষদের এত বড় ভাষ্যকার আর কেহ আসেন নাই। বর্তমান ভারতবর্ষে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার বলিয়াই কবিগুরুকে আমি মনে করি।

আমার তৃতীয় ধারণাটি একটু বিশেষ। প্রথম দুইটি ধারণা লইয়াআলোচনার অবকাশ হয়তো আছে এবং হইলে আলোচনা করাও চলে। কিন্তু তৃতীয় ধারণাটি সম্বন্ধে সে-সুযোগ নাই। ধারণাটি ব্যক্ত করিলেই আমার উক্তির অর্থটুকু পরিষ্কার হইবে। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথ সমাধিবান পুরুষ। ঋষির সমাধিই আমি বুঝাইতোছ, যে-সমাধিতে ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সাধকগণ উপনীত

হইয়া থাকেন। জানি প্রশ্ন করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছেন যে, কেমন করিয়া জানিলাম, ইহার প্রমাণ কি? ক্ষমা করিবেন, যতটুকু বলিয়াছি, তার অধিক কিছু আমার আর এ-বিষয়ে বক্তব্য নাই। আমি মনে করি, শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথ আমি জানি, সমাধিবান পুরুষ। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিতেন, ইহা রীতিরক্ষা নহে, ইহা সত্য সম্ভাষণ। এই সত্য অজানা থাকিলে গান্ধীজীকে আর ভারতবর্ষের 'মহাত্মা' হওয়া চলিত না। ভারতবর্ষের মহাত্মা যাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রকৃতই গুরুস্থানীয় ছিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজনের মূলে ছিলেন ভূপেনবাবু (রক্ষিত)। ভবেশবাবু (নন্দী) তখন ছিলেন আমাদের সাহিত্যসভা ও লাইব্রেরীর সেক্রেটারী। তাঁহাকে লইয়া আমার যতদূর মনে পড়ে অনিলবাবুও (রায়) সঙ্গে ছিলেন, ভূপেনবাবু তিন নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় আমার কম্বলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই ছিল আমার অধ্যয়নগৃহ।

ভূপেনবাবু বলিলেন, সকলের ইচ্ছা যে, অভিনন্দনপত্রটি আমি রচনা করি। প্রস্তাব শুনিয়াই মন লোভী হইয়া উঠিল। বিপ্লবী-বন্দীদের পক্ষ হইতে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানাইবার অধিকার, এই সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্লোভ আমি ছিলাম না। 'আচ্ছা' বলিয়া আমি সম্মত হইলাম। আমার জীবনে ইহাকে ভাগ্যের শ্রেষ্ঠতম একটি দান বলিয়াই আমি মনে করি। মুখে বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

ভারতীয় রীতিতে মঞ্চটি সুসজ্জিত হইল। মঞ্চের সম্মুখে দুই ধারে কদলীবৃক্ষ ও আলপনা-দেওয়া মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সম্মুখের দিকে এক সারি প্রদীপমালা। প্রথমে ঐক্যতান, তৎপর অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির পাদমূলে স্থাপিত হয়। সর্বশেষে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। পরে কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকের পৌরোহিত্য করেন বন্ধুবর ভূপেন রক্ষিত।

সুধীরবাবু (বসু) ছিলেন শিক্ষিত আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি চিত্র অংকিত করিয়া নীচে অভিনন্দনটি চীনা-কালিতে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। একটি বাঁশের নলের আধারে 'অভিনন্দনপত্রটি' রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরিত হয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে অমল হোম মহাশয় এক পত্রে জানান যে, অভিনন্দনটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রত্যুত্তরে একটি 'প্রত্যভিনন্দন' কবিতা লিখিয়াছেন। কবির স্বহস্তে লিখিত "প্রত্যভিনন্দনটি" অভিনন্দন রচয়িতাকেই যেন দেওয়া হয়, ইহাই কবির ইচ্ছা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির স্বহস্তের সেই 'প্রত্যাভিনন্দন'-পত্রটি পৌঁছিতে পারে নাই। পরে জানিয়াছি লেখাটী বক্সা-ক্যাম্পের অফিস হইতে কবির নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। কবি লেখাটী শ্রীযুত অমল হোমকে দিয়াছেন। এখন তাহা শ্রীযুত হোমের নিকট আছে।

আমাদের অভিনন্দনপত্রটির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে—

ওগো কবি,

তোমায় আমরা করিগো নমস্কার।

সুদূর অতীতের যে-পুণ্য প্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাঙলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া আমরা বন্দিদল তোমার সেই জন্মাক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে, যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ময় আলোক-দেবতা তমসা-তীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আলোকবহ্নির আত্মপ্রকাশই তো সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে তটে বিচিত্র বহুও যে আপনাকে জানিয়া জানাইয়া উঠিয়াছে। হে মর্তের রবি, তোমার আকাশ-বিহারী বন্ধুর সঙ্গে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ, তাই তো বিস্মৃতির অখ্যাত প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হে ঐশ্বর্যবান, তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ধ্যানী, তোমার চোখে জাতি মহান বিশ্ব-মানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয় ?

হে ঋষি, তোমার জনমক্ষণে এই বাঙলায় জনমগেহে সমগ্র জাতির জন্ম-জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। অজাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাঁথিয়াছ। আমরা সে-দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়তো হারাইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আজিকার এই স্মরণ-দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্তশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তে শেষ সীমান্ত-পারে গিয়া পৌছুক।

হে কবিগুরু, "তোমায় আমরা করি গো নমস্কার।' অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি গুণমুগ্ধ সমবেত রাজবন্দী

বক্সা-বন্দিশিবির

২৫শে বৈশাখ

১৩৩৮

আমাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবিগুরু পাঠাইলেন "প্রত্যভিনন্দন"। ঋষি কবির প্রত্যভিনন্দন, আমরা স্বভাবতঃই একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। অভিনন্দনের উত্তর হয়তো একটা তিনি দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বিনিময়ে তিনিও আমাদের জন্য অভিনন্দন পাঠাইবেন, ইহা বস্তুতঃতই আমরা আশা করি নাই। বুঝিলাম, বাঙলার বিপ্লবীদের প্রণাম বাঙলার কবিকে সত্যই বিচলিত করিয়াছে, কাজেই এই অগ্নি-প্রণামের প্রত্যুত্তরে ঋষির অভিনন্দন উৎসারিত হইয়াছে বিপ্লবীদের জন্য নয়, বিপ্লব-শক্তির জন্য।

কবিগুরু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—

"প্রত্যভিনন্দন

(বক্সা-দুর্গের রাজবন্দীদের প্রতি)

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তিভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত নরের রাজধানী॥

'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ দার্জিলিং

কবিগুরু এই প্রত্যভিনন্দন যত সাময়িক কালের জন্যই হউক, বন্দিদের একটু বিশেষভাবে আত্মসচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, এইটুকু আমার মনে আছে। আমার নিজের কথা পূর্বেই একটু ব্যক্ত হইয়াছে। আমার লেখা কবিগুরুকে

স্পর্শ করিয়াছে, ইহাতে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমি লিখিতে পারি এবং চেষ্টা করিলে সাহিত্যিক বলিয়াও হয়তো একদিন পরিচিত হইতে পারি। অর্থাৎ এই ঘটনা—যাহা ঘটে তাহাই ঘটনা নহে, যাহাতে চরিত্রের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, আমি তাহাকে ঘটনা আখ্যা দিয়া থাকি,—আমাকে আমার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। যে-মনোভাব আমার সেদিন আমি দেখিয়াছিলাম, তাহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্ম-আদর।

বয়স বাড়িয়াছে, রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে, হয়তো মাথাও কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে, তাই আজ আর আমার আত্ম-আদর বা আত্ম-অনাদর কোন ভাবই মনে আসে না। যেটা আসে, তাহা একটি প্রশ্ন অথবা প্রত্যাশা।

'প্রত্যভিনন্দন'-এর শেষ কথাটীতে কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় ?" উত্তরে আজ আর বলিতে পারি না, আমি বা আমরা। অপরের কথা জানি না, কিন্তু নিজের কথা যতটুকু জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের পরিচয় অন্ততঃ আমি দিতে পারি নাই। আমার মুক্ত পরিচয় আমার কাছে এখনও অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে, বাহিরের শৃঙ্খলচ্ছন্দে তাহার পারিচয় দেওয়ার কথা তো উঠেই না।

কিন্তু কবি এমন কথা কেন লিখিলেন ? 'অমৃতের পুত্র মোরা,' এ কথা তো আমরা জানি না, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লিখিলেন, 'আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।' অথচ শুনিতে পাই, 'ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।' প্রত্যভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঋষিকবির এই উক্তি কি প্রকৃতই সত্য—ইহাই আমার প্রশ্ন।

ইহাকে প্রশ্ন না বলিয়া প্রত্যাশাও বলা চলে। ঋষিকবি আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন, তাহাই প্রশ্নের আকারে ঐভাবে প্রত্যভিনন্দনে জানাইয়া গিয়াছেন, এই অর্থেই আজ আমার মন ঋষির 'অভিনন্দন' গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার ধারণা, ইহাই প্রত্যভিনন্দনের প্রকৃত অর্থ।

ঋষির প্রত্যাশা যদি আমাদের একজনের জীবনেও পূর্ণ হইত, তবে দেশের ভাগ্য আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিতাম। যে-শক্তিতে গান্ধীজী ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন, তখন বাঙলার বিপ্লবীরা তাহার চেয়েও প্রবলতর ভাবে দেশ ও জাতিকে আন্দোলিত ও মন্থিত করিতে পারিত। সে-মন্থনে অমৃত যদি নাই বা উঠিত, অন্ততঃ বাঙলা-বিভাগের গরল উঠিত না, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষও সে-মন্থনে সঞ্জাত হইত না। বাঙলার বিপ্লবীদের কোন নেতা বা কর্মীর জীবনেই ঋষিকবির এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই, কেহই নিজ জীবনে ঋষির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই।

আজ নিজের নিভৃত মনের গহনে তাকাইয়া দেখিতে পাই যে, বাঙলার বিপ্লবের অসমাপ্ত যজ্ঞশালা পরিত্যক্ত পড়িয়া আছে, কিন্তু ভস্মমাঝে এখনও অগ্নি অবসান হয় নাই। মহাযাজ্ঞিক ও মহাতাপসের অপেক্ষায় এক কণা অগ্নি এখনও অপলক তাকাইয়া আছে।

গ্রীষ্মকাল আসিল। আপনাদের একটু কষ্ট করিয়া আর একবার খেলার মাঠে যাইতে হইবে। আমাদের হকি খেলা দেখিয়াছেন, এবার ফুটবলের পালা। ভাবিতেছেন, হকি খেলা হইতেই আমাদের ফুটবল খেলাটাও অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন? বৃথা চেষ্টা করিবেন না।

শুনুন তবে, সিপাহীরা পর্যন্ত স্বীকার পাইল যে, ফুটবল খেলা না দেখিলে বাবুদের সঠিক পরিচয় জানা বাকী থাকিয়া যাইত। উঃ, কি প্রচণ্ড খেলা। ফুটবলে লাথি মারিতে গিয়া বাবুরা পাথর কিক্ করেন, কেষ্টবাবু ও অনুকূলবাবু এজন্য সামান্য মুখ-বিকৃতি পর্যন্ত করেন না। সিপাহীদের মহলে ধন্য-ধন্য পড়িয়া গেল। সাধে কি আর সাহেবেরা বাবুদের এত ভয় করেন।

লীগের খেলা মারাত্মক অবস্থায় আসিয়াছে। পাঁচ-নম্বর ও তিন-নম্বর ব্যারাক পয়েণ্টে ভীষণভাবে কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে—যেন দুইটি রেসের ঘোড়া পাশা-পাশি ছুটিয়াছে, ঘাড় লম্বা করিয়া একে অপরকে হার মানাইবার শেষ চেষ্টা

করিতেছে, এমনই সঙ্গীন ও রোমাঞ্চকর 'পরিস্থিতি' সেটা। উত্তেজনার আর অবধি নাই।

আমরা তিন-নম্বর ব্যারাক টীম গঠন লইয়া সমস্যায় পড়িলাম। আমাদের তিন-নম্বর ব্যারাকের গোলরক্ষক ছিলেন ক্ষিতীশবাবু (ব্যানার্জি)। একটু বর্ণনার আবশ্যক বোধ করিতেছি।

ক্ষিতীশদা বয়স্ক ব্যক্তি, আর একটু ঠেলা দিলেই চল্লিশে পৌঁছিয়া যাইবেন। দৈর্ঘ্যে একটু কম, এই কমতিটুকু তিনি প্রস্থে প্রয়োজনেরও অধিক পোষাইয়া লইয়াছেন। ভুঁড়িটি দর্শনীয়, কিন্তু স্পর্শ করিলে টের পাওয়া যাইত যে, তাহা লোহার মত নিরেট। দেয়ালে বল লাগিলে যেমন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের গোলরক্ষকের ভুঁড়ির দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া তীব্র সটের বলকেও 'মাগো' ডাক ছাড়িয়া তেমনি তীব্রবেগে পিছু হটিয়া আসিতে হইয়াছে। ক্ষিতীশদার ভুঁড়ি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর প্রচলিত ছিল :—

—"কে যায় ?"

—"ভুঁড়ি যায়।"

—"কার ভুঁড়ি ?"

—"ক্ষিতীশবাবুর।"

—"তিনি কোথায় ?"

—"পিছনে আসিতেছেন।"

চেহারার বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন করা যাইতেছে। আমাদের এমন গোলরক্ষকের মুখে মানে নাকের নীচে একজোড়া গোঁফ, মুখের ডাহিনে বামে বাহু বিস্তার করিয়া মুখমণ্ডলকে আগুলিয়া আছে—যেন আগন্তুক মাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তুম্ কোন্ হ্যায় রে।" গোঁফজোড়া ক্ষিতীশদার গর্বের বস্তু ছিল। হাত দুইটি ছোট একজোড়া মুগুরের মত ঘাড় হইতে বিলম্বিত হইয়া আছে। ভীম কর্তৃক ময়দামর্দিত কীচকের খানিকটা আভাস যেন আনয়ন করে বলিয়া মনে হয়। ক্ষিতীশদা ভুঁড়িপেট লইয়া বরাবর আমাদের গোলরক্ষকের কাজ চালাইয়া

আসিয়াছেন! কিন্তু তিনি অজাতশত্রু ছিলেন না, অনেকে তাঁর পিছনে ফেউ লাগিলেন, বিশেষ করিয়া সন্তোষদা (দত্ত)।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে তিন-নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় পাশা বসিত, একদিকে থাকিতেন প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী) ও সন্তোষদা, অপরপক্ষে থাকিতেন ক্ষিতীশবাবু ও ভূপতিদা (মজুমদার)। তখন অহি-নকুল-সম্পর্কে নিত্যসম্পৃক্ত সন্তোষদা ও ক্ষিতীশদার যে বাক্-যুদ্ধ চলিত, তাহাতে উপর-নীচ সকল ব্যারাকের বহু দর্শককে আকর্ষণ করিয়া আনিত। অর্থাৎ বিনা পয়সায় এমন দৃশ্য দেখিবার জন্য আমরা ছোটখাটো একটা ভীড় জমাইয়া খেলার আসরটিকে চক্রাকারে বেষ্টনপূর্বক অবস্থান করিতাম।

বাক্-যুদ্ধ অনেক সময় বাহু-যুদ্ধে গিয়া গড়াইত। এ-পাশ হইতে ক্ষিতীশদা তাঁর মোটা-সোটা খাটো হাতে উদ্বাহু হইয়া আক্রোমণোদ্যত হইতেন, পাশার ছকের ও-পাশ হইতে সন্তোষদা তাঁর সবল দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া তাহা ঠেকাইতেন। অনেক সময় মনে হইত, সন্তোষদা দুই হাতে এক ক্রুদ্ধ সিংহের থাবা কোনমতে মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া "ত্রাহি জপ করিতেছেন। আমরা দর্শকগণ সন্তোষদার এই বিপদে কিছুমাত্র সহানুভূতি বা মমতা না দেখাইয়া উল্লাসে হৈ-হৈ করিয়া উঠিতাম। ভূপতিদা মন্তব্য করিতেন, "গজ-কচ্ছপের লড়াই।" শুনিয়া আমরা হাস্য করিতাম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, গজ-কচ্ছপও হাসিতে যোগ দিয়া আমাদের হাস্য ও আনন্দ দুই-ই বৃদ্ধি করিত।

সেদিন বাক্-যুদ্ধ গজ-কচ্ছপের বাহুযুদ্ধে আসিয়া গিয়াছে। হাড়ের পাশা দুই হাতের পাতায় ঘর্ষণপূর্বক মড়মড় শব্দ তুলিয়া প্রতুলবাবু যুদ্ধবিরতির অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পাশার দান দিবার আগে প্রতুলবাবু শান্তভাবে হাসিকে অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "এ তোমার বড় অন্যায়, সন্তোষ। গোল ঠেকাতে পারেননি বলে যে পাশা খেলতে পারবেন না, এ তোমার কোন কাজের কথা নয়।"

সন্তোষদা উত্তর দিলেন, "আপনি জানেন না প্রতুলদা, এ একটি জিনিয়স, সব খেলাতেই সমান পারঙ্গম, সব্যবাচী বল্লেই চলে।"

প্রতুলবাবু এবার হাসিকে মুক্ত করিতে কোন বাধা বোধ করিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষিতীশবাবু কি বলেন?"

ক্ষিতীশবাবু জবাব দিলেন, "এঁরা সব মুখেন মারিতং জগৎ। দেখলাম না তো আজ পর্যন্ত মাঠে নামতে একদিন।" আমরা উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এ-অভিযোগ সমর্থন করিলাম।

সন্তোষবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমি তো আর লজ্জার মাথা খাইনি, নইলে আর একজনের মত নেমে পড়তুম বৈকি।"

'আর একজন' যিনি লজ্জার মস্তক ভক্ষণ করিয়া বসিয়াছেন, তিনি মুখভঙ্গী সহযোগে পুরানো রসিকতাটিরই আবৃত্তি করিলেন, "মুখ না থাকলে এদ্দিন শেয়ালে টেনে নিত।"

ভূপতিদা শুধু প্রশ্ন করিলেন, "কার?" অর্থাৎ কার মুখ না থাকিলে, বক্তার না সন্তোষ দত্তের, এই সমস্যায় তিনি পড়িয়াছেন।

ক্ষিতীশদা মেজাজ রক্ষা করিলেন না, স্ব-পক্ষের ভূপতিদাকে পর্যন্ত বিপক্ষে ঠেলিয়া দিয়া ব্যাপক আক্রমণ চালাইলেন, "আপনাদের সকলেরই। সবাই সমান বচনবাগীশ।"

প্রতুলবাবু মোক্ষম সময়ে একটি সংবাদ ছাড়িলেন "সন্তোষ, রবিবাবুও (সেন) নাকি গোলে খেলতে পারেন। কিন্তু বছর কুড়ির মধ্যে মাঠে নেমেছেন বলে তো মনে হয় না?"

সন্তোষদা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "আমাদের গোলকিপারের মত খেলতে কুড়ি বছর কি বলছেন, জীবনেও মাঠে নামবার দরকার হয় না। কিন্তু রবিবাবু খেলবেন কি করে?"

প্রতুলবাবু বুঝিতে পারিলেন না, আমরাও না, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন, "বুঝছেন না, তাহলে যে মণ্ডপ কাৎ হয়ে পড়বে। আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগবে যে। আমাদের চ্যাম্পিয়ন্ কি রাজী হবেন গোল ছাড়তে ?" বলিয়া তেরছ-নয়নে চ্যাম্পিয়নের দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

"আমাদের চ্যাম্পিয়ন' কিন্তু রাজী হইয়া গেলেন, বলিলেন, "তবে তো বেঁচে যাই, একটা খেলার মত খেলাও দেখতে পারি। শুধু গোলে কেন, ব্যাকেও তো গোষ্ঠ দত্ত নিজে নামতে পারেন।"

বলিয়াই তিনি দৃষ্টিটাকে উপস্থিত সকলের উপর বুলাইয়া নিলেন। তাঁহার মুখের ভাবখানা এই যে, সন্তোষ দত্তকে গোষ্ঠ দত্ত নাম দিয়া তিনি যেন বাক্-যুদ্ধে সকলকেই 'নক-আউট' করিয়া ফেলিয়াছেন। উপস্থিত সকলেও ক্ষিতীশদার বক্তব্যে ও মুখের বিজয়ী ভঙ্গিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন, "গোল খালি রেখেও নামতে রাজী আছি কিন্তু বিভীষণকে গোলে রেখে—"কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না। সকলের সমবেত হাসির মধ্যে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। চ্যাম্পিয়ন হইতে একেবারে বিভীষণে নামাইয়া আনা, সন্তোষবাবু যেন ক্ষিতীশদাকে একটি প্যাচে ডিগবাজী খাওয়াইয়া দিলেন।

অবশেষে ঠিক হইল, আগামীকল্য ভোরেই একটা 'প্র্যাকটিস ম্যাচ' হইবে, তিন-নম্বরের পক্ষে রবিবাবু গোলে, আর সন্তোষদা ব্যাকে খেলিবেন। রবিবাবুকে রাজী করাইবার কথা উঠিলে সন্তোষদাই বলিলেন, "সে ভার আমার, ওটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

রাত্রিটা কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া আমরা পার করিয়া দিলাম। ভোর হইতেই সারা ক্যাম্পে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। সারারাত্র থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি গিয়াছে, ভোরেও আকাশের সারা মুখ মেঘে আচ্ছন্ন। টিপ-টিপ বৃষ্টিও হইতেছিল, কিন্তু এই সামান্য বৃষ্টি বক্সা পাহাড়ে বৃষ্টি বলিয়া ধর্তব্যই নহে। খেলাটা বন্ধ হইল না।

রবিবাবু হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া গোলে গিয়া দাঁড়ালেন। দাঁড়াইবার

ভঙ্গীতে মনে হইল যে, কেহ যেন তাঁহার ত্রিসীমার মধ্যে না আসে, অন্তত যার প্রাণের মায়া আছে, সে যেন না আসে, এমনই 'এস্পার কি ওস্পার-মার্কা বিজ্ঞাপন রবিবাবুর চোখে-মুখে লটকানো হইয়াছে। আজ রবিবাবুরই শেষ দিন, নয় বলেরই শেষ দিন, কিংবা কোন হতভাগ্য খেলোয়াড়েরই শেষ দিন। ভয়ানক ও রোমাঞ্চকর নাটকের পর্দা-উত্তোলনের অপেক্ষায় সকলে কুম্ভক মারিয়া রহিলেন।

রবিবাবুর পুরোভাগে ব্যাকে স্থান লইলেন সন্তোষদা ওরফে ক্ষিতীশদার গোষ্ঠ দত্ত। তাঁহারও ভাবখানা কহতব্য নহে। রবিবাবু ও সন্তোষ দত্ত যেন দুই দৈত্য তিন-নম্বর টীমের ব্যূহদ্বার আগলাইয়া আছেন।

আর ঠিক তাঁহাদের পশ্চাতে গোলপোস্টের পিছনে স্থান গ্রহন করিলেন আমাদের চ্যাম্পিয়ন ওরফে সন্তোষ দত্তের বিভীষণ ক্ষিতীশদা। তাঁহার ভুঁড়িপেট ও "তুম কোন হ্যায়রে"-মার্কা গোঁফজোড়া অবশ্য সঙ্গেই ছিল, তাঁহার ভাবখানাও কহতব্য নহে, যেন মহাবীর ভীমসেন বালখিল্যদের ক্রীড়া দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন, এমনই একটি কৌতুক ও তাচ্ছিল্যের মাংসপিণ্ডের ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান রহিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। এদিকে ব্যূহরক্ষাকারী দুই দৈত্য ও ভুঁড়িপেট চ্যাম্পিয়নের মধ্যেও লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। মাঠে ও মাঠের বাহিরে দুইটি লড়াই যুগপৎ চলিতে লাগিল। সন্তোষ দত্ত বল কিক্ করিতে গিয়া স্বপক্ষের খেলোয়াড়ের নিতম্বে লাথি মারিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, গোলের পিছনে দাঁড়াইয়া ক্ষিতীশদা অঙ্গভঙ্গীতে তাহার অনবদ্য অনুবাদ করিয়া দেখাইলেন। রবিবাবু একবার ডাহিনে একবার বামে হেলিতেছেন, বলের সঙ্গে যেন অদৃশ্যসূত্রে তিনি নাসিকাবদ্ধ—তাহারও নিখুঁত নকল ক্ষিতীশবাবু স্বীয় দেহে দেখাইয়া চলিলেন। এই অপূর্বদেহভঙ্গী দর্শকদের 'মাগো, আর হাসিতে পারি না' স্বীকারোক্তি নির্গত করিয়া ছাড়িল।

এতো গেল নাট্যের নীরব দিক। ক্ষিতীশদা এই সঙ্গে গোলরক্ষক ও ব্যাকের সহিত সমান বাক্-যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, যেন কর্ণের রথের শল্য-সারথি সমালোচনা

করিয়াই বীরদ্বয়কে অর্ধেক ঘায়েল করিয়া আনিবেন। বাকীটা অর্থাৎ মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিবার ভারটুকু মাত্র তিনি মাঠের খেলোয়াড়দের উপর দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। খেলাটা বিশেষভাবে এইখানেই এবং মাঠেও মারাত্মকভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল।

যোগেশ চক্রবর্তী বল লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ব্যাকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল বলিয়া। রবিবাবু খাঁচার বাঘের মত গোলের দুই পোস্টের মধ্যে বলের গতি অনুযায়ী একবার ডাহিনে, আবার বাঁয়ে হেলিতেছেন, চেঁচাইয়া বলিলেন, "সন্তোষ, অপোজ হিম, চার্জ কর।"

পিছন হইতে ক্ষিতীশদা রবিবাবুকে পরামর্শ দিলেন, "দুর্গা দুর্গা বলে বুক চেপে ধরুন, চোখ বন্ধ করুন, ফাঁড়া কেটে যাবে।"

রবিবাবুর এই দিকে কান দিবার মত অবস্থা ছিল না। তিনি সত্য সত্যই 'সিরিয়স' হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবার ধমক দিয়া উঠিলেন, "অপোজ হিম।"

হুকুম পাইবার পূর্বেই সন্তোষ দত্ত 'অপোজ' করিতে কুইকমার্চে ছুটিয়াছিলেন, ব্যাকের একটা দারিত্ব আছে তো। কিন্তু যোগেশ চক্রবর্তী মানুষ মোটেই সুবিধার নয়, সন্তোষদার সম্মুখ দিয়াই বল লইয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইল। কাপুরুষ, ভয়ে পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল এবং গোল লক্ষ্য করিয়া ধাঁ করিয়া কিক্ করিয়া বসিল—বল গোলের অভিমুখে উঁচু হইয়া ছুটিয়া আসিল।

রবিবাবু পুরোভাগে ব্যাক সন্তোষ দত্তের অক্ষমতায় ও পশ্চাৎভাগে মাঠের বাহিরে ক্ষিতীশদার মর্মভেদী খোঁচায় অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সমালোচনায় যৎপরোনাস্তি চটিয়া রহিয়াছিলেন। বলটা তাঁর নাকের বরাবর হাত দুই দূরে থাকিতেই রাগিয়া এমন ঘুষি মারিলেন, যেন এতদিনে ভগবান দয়া করিয়া বৃটিশ জাতিটারই মুখটি বলাকারে তাঁহার থাবার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন—'মরি কি বাঁচি' করিয়া তিনি ঘুষি ছাড়িলেন।

একে তো রবিবাবু শক্তিমান পুরুষ, তদুপরি বেশ একটু তপ্ত হইয়াই ছিলেন, ঘুষির জোরটা কাজেই মোক্ষমই হইয়াছিল। বলটা মাঝ মাঠ পর্যন্ত ফিরিয়া

গেল। রবিবাবু সটান ক্ষিতীশদার অভিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন মুখের ভাবখানা এই—বলি ব্যাপারটা দেখিয়াছেন, কি মনে হয়? আর ক্ষিতীশদার মুখের ভাবও দেখিবার মত হইল, ঘুঁষিটা যেন বলের বদলে তাঁরই মুখে লাগিয়াছে।

রবিবাবু খেলা শেষ হইবার অপেক্ষায় ছিলেন। গোলপোস্টের পিছনে দাঁড়াইয়া ক্ষিতীশবাবু এতক্ষণ যেসব মর্মভেদী বাক্যবাণ অঙ্গভঙ্গী সহযোগে এক-তরফা নিক্ষেপ করিয়াছেন, খেলাতে আবদ্ধ থাকায় এতক্ষণ তার কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবার অবসর মিলিয়াছে।

রবিবাবু ডাকিয়া কহিলেন, "সন্তোষ, ধর তো।" বলিয়া চোখের ইঙ্গিতে শিকার দেখাইয়া দিলেন।

মোটা শরীর ও ভুঁড়িপেট লইয়া শিকার তখনও গোলপোস্টের পিছনেই ছিলেন। সন্তোষবাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ক্ষিতীশবাবু খেঁকাইয়া উঠিলেন, "আসুক না দেখি।" বলিয়া কিন্তু এক-পা-দু-পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিলেন। সারা গায়ে ও কাপড়ে কাদা লইয়া সন্তোষ দত্ত ক্ষিতীশবাবুকে গিয়া জাপটাইয়া ধরিলেন।

উপরে পাহাড়ের গ্যালারীতে ও নীচে মাঠে যত দর্শক ছিলেন, পরম উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া সিপাহীরা পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল, খেলা শেষে তাহারা ব্যারাকের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

উঃ, কী আলিঙ্গন! যেন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে বাহুবেষ্টনে পাইয়াছেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই বীর জাপটাজাপটি করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন এবং ভীমরুলের কামড়-খাওয়া জীবের মত গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

রবিবাবু তফাতে দাঁড়াইয়া দেখিবার মত লোক ছিলেন না। আগাইয়া গিয়া ক্ষিতীশবাবুকে ধরিয়া এ-পাশ ও-পাশ করাইতে লাগিলেন—যেন অতিকায় একটি মৎস্যকে ভাজিবার পূর্বে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মশলা মাখাইয়া লইতেছেন।

ক্ষিতীশবাবু যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখা গেল যে, জলে-কাদায় তিনি এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। মোটা গোঁফজোড়ায় কাদা

লেপটাইয়া যাওয়ায় বীর-ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া তাহা অবমাননায় হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।—সিপাহীরা পর্যন্ত খুশি হইয়া গেল।

লড়াই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছিল। খেলোয়াড় ও অ-খেলোয়াড় সব জোড়ে জোড়ে জাপটাজাপটি চলিয়াছিল। পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া যাঁহারা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া খেলা দেখিতেছিলেন, মাঠ হইতে কর্দমাক্ত শত্রু তাঁদের পিছনে তাড়া করিল। ব্যারাকের ভিতরেও গিয়া আক্রমণকারিগণ লড়াই শুরু করিয়া দিল। রোগী ও নিতান্ত বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁরাই কেবল রেহাই পাইলেন। মেয়েরা থাকিলে তাঁরাও অবশ্য রেহাই পাইতেন, কারণ রণ-শাস্ত্রে অস্পৃশ্যদের তালিকায় রুগ্ন ও বৃদ্ধের সঙ্গে ইহাদেরও উল্লেখ আছে।

মাঠ হইতে একটা সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ক্রমে ব্যারাকের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। এক সময়ে দেখা গেল, ভুড়িপেট ও মোটা-শরীর ক্ষিতীশদা জন-চার-পাঁচেকের কাঁধে চড়িয়া চীৎ হইয়া ব্যারাকে প্রবেশ করিতেছেন।

মাল মাটিতে নামাইয়া রাখিতেই ওস্তাদ অমর চ্যাটার্জি সিগন্যাল দিল—"জয় বাবা ঘটোৎকচের জয়।"

সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বাহক দল ও অন্যান্য সকলে হুঙ্কার ছাড়িল, "জয়—"

ভূপতিদা বলিলেন, "কচ্ছপ তো দেখছি, গজটি কোথায়?"

ভীড়ের মধ্য হইতে সন্তোষ দত্ত উত্তর দিলেন—"হাম, ইধার হ্যায়।"

নদী যখন পর্বতগুহা ছাড়িয়া বাহির হয়, তখন হাতে কোন ম্যাপ লইয়া বাহির হয় না। ডাহিনে বামে তটের ধাক্কায় তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে এবং এইভাবেই একদা সমুদ্র-মোহানায় এ-যাত্রা সমাপ্ত হয়। নদীর সঙ্গে মানুষের এই বিষয়ে হুবহু মিল রহিয়াছে। মানুষের মধ্যেও এমনি একটি প্রাণ-প্রবাহ বর্তমান, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারও জীবন-পথ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

নদীর জীবন-যাত্রা সমুদ্রে শেষ হয়, মানুষের যাত্রা কোন্ সমুদ্রে শেষ হয়? উত্তম প্রশ্ন। নদী তো পর্বত গুহা হইতে নির্গত হয়, মানুষের আদি উৎস-গুহাটী কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিলে, মানুষের যাত্রা কোন্ সমুদ্রে শেষ হয়, আপনাদের এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমিও প্রস্তুত আছি, তার পূর্বে নহে। অর্থাৎ, আপনার আদি আগে আপনি আবিষ্কার করুন, আপনার অবসানও তখন আপনি জানিতে পারিবেন।

পৃথিবীতে ঠ্যাটা মানুষের অভাব নাই, কেহ কোন কিছু বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে তারা যেন এক পায়ে খাড়া হইয়াই থাকে। তাহারা বলিবে যে, নদীর সঙ্গে মানুষের মিলটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, নদীর হাতে ম্যাপ নাই সত্য, কিন্তু মানুষের কপালে দুই দুটা চক্ষু আছে। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধি আছে, তার আলোতেই সে জীবনের পথ দেখিয়া লইতে ও চলিতে পারে।

কথাটা শুনিতে নিশ্চয় বুদ্ধিমানের মত, কিন্তু ইহাকেই বলা হয় পল্লবগ্রাহী বুদ্ধি। বুদ্ধির আলোতে পথ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, কথাটা মানিয়া লইয়া একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। মোটরেরও তো সামনে আলো থাকে, সে-আলোতে পথ দেখে কে? নিশ্চয় মোটর গাড়িটা নয়। এই আলোতে পথ দেখে গাড়ির চালক। মানুষের চালক কে? যাক্, নদীর ক্ষেত্রে যার নাম দেওয়া হইযাছে গতি, মানুষের বেলা তার নামই প্রাণ-প্রবাহ বা স্ব-ভাব। এই স্ব-ভাবটিই বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিশেষ অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হইয়া চলে।

এত কুটকচালে আমাদের আবশ্যক নাই। কোন কিছুকেই আকার দিতে হইলে হাতুড়ীর আঘাত দিতে হয়, নইলে তাহা অর্থহীন একটা বস্তুপিণ্ড থাকিয়া যায় মাত্র! মানুষের স্বভাবটিকেও বিশেষ মূর্তিতে বা ব্যক্তিত্বে রূপ দিতে তেমনি আঘাত আবশ্যক, সংসারে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতই সেই হাতুড়ীর আঘাত। এই রকম একটি আঘাতেই বক্সাক্যাম্পে আমার স্বভাবের একটা দিক সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। ব্যাপারটা এই—

তখন আমি পাঁচ-নম্বর ব্যারাকের বাসিন্দা, পরে তিন নম্বরে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, আমার পাশের সীটে আছেন শরৎবাবু, যিনি সিউড়ী হইতে এতাবৎ জোঁকের মত আমার সঙ্গে লাগিয়াই ছিলেন। বিকালের দিকে বিছানায় চীৎ হইয়া একটা বিদেশী উপন্যাস পাঠ করিতেছিলাম, বেশ জমিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু রসভঙ্গ-দূতের অভাব কোনকালে কোথাও হয় না, এ-ক্ষেত্রেও হইল না।

শরৎবাবুর সীটে বসিয়া ডাঃ জ্যোতিময় শর্মা শরৎবাবুকে 'কম্যুনিজম্' বুঝাইতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া কানে আসিতেছিল, 'ক্লাশলেস্ সোসাইটি।' মন বিগড়াইয়া গেল। রস-ভোগে বা সম্ভোগে যারা বাধা দেয়, তাদের সম্বন্ধেই তো আদি-কবির শাশ্বত অভিশাপ, 'মা নিষাদ—।' আমিও অভিশাপ প্রদান করিলাম।

আধুনিককালের ভাষায় চিরকালের অভিশাপকে তর্জমা করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা মানে রূপ দিলাম—"Your classless Society is an Utopia."

অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ শুধু আকাশ-কুসুমই নহে, সেই খ-পুষ্পেরই স্বপ্ন তাহা।

ব্যস্, শুরু হইয়া গেল, যাকে বলে তর্ক-যুদ্ধ। যুদ্ধের দর্শকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইল এবং যুধ্যমান ব্যক্তিরাও দুইভাগ হইয়া দুইপক্ষে যোগ দিলেন। লড়াইটা প্রথম দিনে শেষ হইল না, পরদিন আবার বিকালে টিফিন শেষে এইখানেই তর্কসভা বসিবে, সাব্যস্ত হইল। পর পর চারদিন এই তর্ক-সভার অধিবেশন হয়, পরে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

ডাঃ শর্মার পক্ষে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন কালীমোহন সেন, করাচীর বুখারী, মণি সিং, রেজাক সাহেব—ইঁহারা সকলেই কমরেড। আমার পক্ষে যোগ দিলেন সন্তোষ গাঙ্গুলী ও সুরপতি চক্রবর্তী। নেতারাও আসিয়া আসরে আসন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিতেন না।

ইহার পরেই ক্যাম্পে কম্যুনিস্ট-সাহিত্য চর্চার ধূম পড়িয়া যায়। নিত্য মোটা মোটা ইংরেজী বই ক্যাম্পে আসিতে লাগিল। এবারকার বন্দীশালাতেই বাঙলার

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কম্যুনিজম প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ লাভ করে এবং সমর্থক সংগ্রহ করে। আন্দামানেও ঠিক এই একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার বিপ্লবী বন্দীরাও অবশেষে কম্যুনিস্ট দলে নাম লিখাইয়াছিলেন। বাঙলার কম্যুনিস্ট-পার্টির প্রকৃত শক্তি জেলেই সংগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রেণীহীন সমাজকে তো স্বপ্ন বলিয়া মন্তব্য করিয়া বসিলাম, কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়াইল, তাহাই ভাবি। উক্ত স্বপ্ন আজও স্বপ্নই আছে এবং স্বপ্নই থাকিবে, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টিটা কিছু আর স্বপ্ন নয়, তাই কমরেডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, ইহারা আগে কম্যুনিস্ট হয়, পরে কম্যুনিজম গ্রহণ করে। জেলখানাতে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহা হইতেই এই ধারণা আমার হইয়াছে। পিতা হিন্দু হইলে যেমন সন্তানসন্ততিরা হিন্দু হয়, কোন দল বা উপদলের নেতা কম্যুনিস্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুবর্তিগণের ধর্মান্তর ঘটিয়া থাকে। আমার বিস্ময়ই বোধ হইত যে, ইহা কী চরিত্র? আগে কম্যুনিস্ট হওয়া পরে কম্যুনিজম গ্রহণ! এ যেন আগে মুসলমান হইয়া পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

সেদিন আমি তর্কযুদ্ধে কি বক্তব্য ও মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা আজ আর স্মরণ নাই। শুধু এইটুকু বিশেষভাবে স্মরণ আছে যে, আমার সমগ্র অস্তিত্ব কম্যুনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ আমার স্বভাবের উপর এই ঘটনা হাতুড়ী-আঘাতের কাজ দিল, দেখিলাম স্বভাবটি আমার বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। আমি কম্যুনিজমের 'শুধু প্রতিবাদী নহি, ঘোর বিদ্বেষীই হইয়া উঠিলাম।

কোন মতবাদের প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা চরিত্রের নেতিবাচক দিকটাই শুধু ব্যক্ত হয়, চরিত্রের নিজস্ব স্ব-রূপটি তাহাতে ব্যক্ত হয় না। আমার স্বভাবের নেতিবাচক দিকটাও একদিন এইভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সাহিত্যসভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার আমার উপর পড়ে। প্রবন্ধটির আরম্ভ ও উপসংহার দুইই আমার আজও স্মরণে আছে।

একেবারে সংস্কৃতের ভোঃ ভোঃ বা শৃন্বন্তু স্টাইলে সে-প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম—"আমি আছি, ইহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না, আমি স্বয়ংসিদ্ধ।"

তারপর এই 'স্বয়ংসিদ্ধকে' তাড়া করিয়া যে—শেষে বা পরিণতিতে গিয়া খতম করিলাম, তাহার নাম 'সচ্চিদানন্দ।' লিখিলাম, "আমি আছি, তাই আমার এক পরিচয় সৎ; আমি জানি, তাই আমি চিৎ এবং ইহাই আমার আনন্দ।" এই তিনটিকে 'আমি' নামক স্বয়ংসিদ্ধ-পাত্রে ঠাসিয়া মিশ্রিত করিয়া অংকশাস্ত্রের যোগফলে যাহা পাওয়া গেল, তাহাই সচ্চিদানন্দ।

লিখিবার আগে সত্যই আমি জানিতাম না কি লিখিব। লিখিয়া তবে জানিতে পারিলাম কি আমার প্রকৃত বক্তব্য। অর্থাৎ আমার স্বভাবটি আমার কাছে এই ঘটনায় ঈষৎ বিদ্যুৎচমকে ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম প্রকাশেই আমি আমার স্বভাবের সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ সেদিন করিতে সমর্থ হইলাম।

যেন যুদ্ধে জয় করিয়াছি, এমনই মুখচোখের ভাব লইয়া সাহিত্য-সভা হইতে নির্গত হইলাম। প্রবন্ধটিতে ক্যাম্পের চিন্তাশীল মহলে নাকি একটু আন্দোলনও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু আমার বন্ধুরাই আমাকে পথে বসাইয়া দিল। ইহা না হইলে বন্ধু!

ফণী (মজুমদার) জিজ্ঞাসা করিল, "যা লিখিস, তা তুই বুঝিস ?"

শোন কথা! আমার কথার অর্থ নাকি আমি জানি না। আমি কি ব্যাসদেবের স্টেনোগ্রাফার সেই গণেশ কেরানী যে, শুনিয়া তবে লিখিতে হইবে? অর্থাৎ ফণীর কথার সোজা মানে এই যে, আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা গিলিতচর্বণ মাত্র। ইহা যদি গিলিতচর্বণ হইয়া থাকে, তবে গলাধঃকরণ ব্যাপারটি

নিশ্চয় আমি জন্মজন্মান্তরে সারিয়া রাখিয়াছি, এই জীবনে তাই শুধু চর্বণের অধিক পরিশ্রম আমার অদৃষ্টে লেখা হয় নাই। যত যুক্তিই দেই না কেন, মনে মনে কিন্তু দমিয়া গেলাম।

মোক্ষম ঘাই মারিল কালীপদ (গুহরায়)। সাহিত্য সভা হইতে ব্যারাকে ফিরিয়া আসিতেই সে ডাক দিয়া বসিল, "এই অনুলোম-বিলোম।"

অমলেন্দু নামটা যে কারণে অনুলোম-বিলোমে রূপান্তরিত হইল, তাহাতেই আমাকে একেবারে ফাটা ফানুস বানাইয়া ছাড়িল, আমি একেবারে চুপসাইয়া গেলাম।

পরে কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে, অঙ্গারকে জলে শত ধুইয়াও তার কালো রং ছাড়ানো চলে.না, আমার স্বভাবের ঐ রংটিও তেমনি আমাকে পরিত্যাগ করিল না। আগুন দিলে কালো অঙ্গারও অবশ্য অগ্নিবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু মানুষের স্বভাবে আগুন লাগিতে পারে, সে আগুন কোথায় ?

দুর্গে পড়া-শুনার ধূম লাগিয়া গিয়াছিল, সকল পার্টিতেই ঘরে ঘরে ক্লাস বসিত। আলাপ আলোচনা, পড়াশুনা, বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদিতে বক্সা ক্যাম্পের চিন্তাজগতে ঝড় লাগিল। আমিও আমার কম্বল-ঘেরা বারান্দার ঘরে অধ্যয়নে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আমার পাঠ্য দেশী-বিদেশী গল্প-উপন্যাস সাহিত্যের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। সকলে যখন বুদ্ধি ও চিন্তার খোরক সংগ্রহে ব্যস্ত, আমি তখন রস-সম্ভোগে মগ্ন।

সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি হইতে আমি আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া রাখিলাম, কারণ চাণক্য বলিয়া দিয়াছেন, 'শতহস্তেন—।' 'ইজম'কে আমি সেই "শতহস্তেন"-এর তালিকায় ফেলিয়া দূরেই রহিলাম বটে, কিন্তু তাহারা দূরে রহিল না, আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ করিল।

বক্সা ক্যাম্পে তিন-নম্বর চৌকায় যাহারা নাম লিখাইয়াছিল, তাহাদের প্রধান দলটির নাম ছিল "রিভোল্ট পার্টি"। যুগান্তর ও অনুশীলন হইতে ইহারা সরিয়া আসিয়াছিল। বক্সা-ক্যাম্পের চিন্তারাজ্যে যে-আন্দোলন দেখা

দিয়াছিল, এই দলের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাকে বিশেষ একটি বাস্তব মূর্তি দিবার জন্য ব্যস্ত ও কর্মতৎপর হইলেন।

একদিন আমার ডাক পড়িল। কম্বলের ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বিষ্ণুর (চ্যাটার্জি) কক্ষে প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখি প্রতুলবাবু (ভট্টাচার্য), বিনয়বাবু (রায়), খাঁ সাহেব, পঞ্চাননবাবু, বোধ হয় যতীনদাও (ভট্টাচার্য) উপস্থিত রহিয়াছেন।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বভাবসুলভ চাপল্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিলাম "বাবা, এ যে দেখছি হাইকম্যাণ্ড মিটিং! আমাকে তলব কেন?"

কেনটা বুঝাইবার ভার প্রতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য যতই পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আমার দুই ভুরু ততই কুঞ্চিত হইয়া আসিতে লাগিল। অর্থাৎ আমিও চিন্তাশীল বা চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। টের পাইলাম, আমার স্বভাবের গাত্র হইতে চাপল্য বহির্বাসের ন্যায় পরিত্যক্ত হইল, আমার সত্তার সমস্ত শক্তি লইয়া আমি গম্ভীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রতুলবাবুর মোট বক্তব্য এই যে, নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, অন্ততঃ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি পার্টি গঠন বক্সা-ক্যাম্পেই করিয়া লওয়া উচিত। সকলেই সম্মত হইয়াছেন। অবশেষে মাস্টার মশায়ের (অধ্যাপক যতীশ ঘোষ) নিকট যাওয়া হয়। তিনি সমস্ত শুনিয়া শেষে নাকি মন্তব্য করিয়াছেন, "অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।" অর্থাৎ, আমার মতামত না জানা পর্যন্ত, তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করিবেন না, কিংবা আমি যদি এই পার্টিগঠনে সম্মত হই, তবে তাঁহার দিক দিয়াও কোন আপত্তি থাকিবে না।

প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি বলেন?"

আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "Misuse of energy, শক্তির অপচয়।"

যেন বোমা মারিয়া বসিয়াছি, এমনই মুখের ভাব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের দেখিতে পাইলাম। দেশের স্বাধীনতার দেখা নাই, অথচ মতবাদের মোহে বা লড়াইতে ইঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন, এই মনোভাবটিই উক্ত ইংরেজী শব্দ কয়টিতে ব্যক্ত হইল। ইহাকে ভৎর্সনাও বলা চলে।

বেশী বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়া সংক্ষেপে বলিলাম, "না, এখন পার্টি গঠন হতে পারে না, অন্তত জেলে তো নয়ই। এ পণ্ডশ্রম করবেন না।" বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

কম্বলের ঘরে আসিয়া ডেক চেয়ারে কাৎ হইলাম। প্রথমেই মনে হইল কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়া চলিয়াছে !

দ্বিতীয় যে-কথাটি মনে জাগিল, আমার জীবনেরই তাহা মারাত্মক প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিই ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের প্রধান ও একমাত্র প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল বছর তিনেক পরে, তখন আমরা রাজপুতানার মরুভূমিতে দেউলী-ক্যাম্পে। এই প্রশ্নটির ধাক্কায় আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, এই প্রশ্নের যে-পরিণতি আমার জীবনে দেখা গেল, তাহাতে আমার জীবনের ভারকেন্দ্রই উৎপাটিত হইয়া স্থানান্তরিত হইল। এতদিনের আমিটা অকস্মাৎ তাহার আজন্ম নিবাসটি ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে ঘর বাঁধিল। প্রশ্নটির ইহাই হইল পরিণাম, তাই ইহাকে আমি মারাত্মক প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

ডেক-চেয়ারে কাৎ হইয়া আছি, মুখে সিগারেট, চোখ বুজিয়া টানিয়া যাইতেছিলাম। কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়া চলিয়াছে, আমার বন্ধুদের রাজনৈতিক জীবন-ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এই মনোভাব আমার টের পাইলাম। তারপর দেখি যে, আমার ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রেও এই জল গড়াইবার সুত্রপাত শুরু হইয়াছে।

মনের গভীর হইতে প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল, 'কে তুমি ? কতটুকু তুমি জান শুনি যে, এতগুলি লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মত প্রকাশ কর ? কতটুকু

তুমি দেখিয়াছ যে, পথ দেখাইতে যাও? সামান্য ছোট্ট একখানা হাতচাপা দিলে যার দৃষ্টি অন্ধ হয়, পরের মুহূর্তে কি ঘটিবে যে জানে না, সে কোন্ জোরে ও কোন্ বুদ্ধিতে এমনভাবে 'হাঁ' বা 'না' নির্দেশ দেয় শুনি? নিজের জীবনের পথেই যে নিজে অন্ধের মত পা দিয়া পথ পরীক্ষা করিয়া চলে, সে কেন এবং কেমনে পথ দেখার বলিতে পার?'

সত্তার গভীরে কোথায় আমার যেন ফাটল ধরিয়াছে, তাই এই অপরিচিত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? কস্ত্বং?"

ইহাকেই বলে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হওয়া। আমার জীবনে অভিশাপ ছিল, তাই সাপ বাহির হইয়া আসিল।

গভীর রাত্রে পঞ্চাননবাবু আমার কম্বলের ঘরে ঢুকিলেন। পঞ্চাননবাবু আমার আবাল্য-সুহৃদ। স্কুলে নীচের ক্লাশে থাকিতেই আমরা কয়েক বন্ধু এই বিপ্লবের যাত্রাপথে বাহির হইয়াছিলাম, সে ১৯১৪।১৫ সালের কথা। তারপর দীর্ঘদিন একত্র চলিয়া আসিয়াছি। আমাদের জীবন যেদিন শেষ হইবে, সেদিনও একই পরিণামে আমরা একত্র অবসান লাভ করিব, বিধাতার এই নির্দেশ আমরা যেন না শুনিয়াও শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা জানিতাম যে, আমাদের জীবনের আরম্ভ একত্র, যাত্রাও একত্র এবং অবসানও এক সঙ্গে।

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এত চটে গেলি কেন?"

বন্ধুর প্রশ্নে ভিতরে ঝড় জাগিল, সংযম হারাইয়া ফেলিলাম।

বলিলাম, "তুমি জান না পঞ্চাদা, আমার সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাশিয়াতে বিপ্লব করেছে, গভর্নমেণ্ট হস্তগত করেছে, বেশ বুঝি আমি। বিপ্লবের শিক্ষা তাদের কাছে নিতে আমি প্রস্তুত আছি, কেমন করে দল গঠন করতে হয়, বিপ্লব প্রচার করতে হয় সবই আমি তাদের কাছে শুনতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একটা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করেছে বলেই যে সেই জোরে জীবন সম্বন্ধে, জীবনের অর্থ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার অধিকার তার জন্মেছে, এ আমার

কাছে অসহ্য মনে হয়। হাতে গভর্নমেণ্ট পেলেই যে মানুষকে তার জীবনের অর্থ সম্বন্ধে পথ নির্দেশের অধিকারও তার হবে, একে আমি বেআদপী মনে করি। জীবনের অর্থ যদি বুঝতে চাই, তার জন্য মরে গেলেও আমি মার্কস, লেনিন, ষ্টালিনদের কাছে যেতে রাজী নয়। জান, চোখ বুজলে আমি কি দেখি? দেখি কম করেও তিন হাজার বৎসর এই দেশের বোধিবৃক্ষতলে, গুহায়-গহ্বরে, পর্বতে-প্রান্তরে সাধকশ্রেণী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তিন হাজার বৎসর, ধারাবাহিক এই ধ্যানের সত্যানুসন্ধান। আমি যাব জীবনের অর্থ জানতে এই ক্ষণিকের বুদ্বুদ মার্কস ও লেনিনের কাছে? তুমি জান না, আমার সমস্ত অস্তিত্বে কী জ্বালা ধরে এই অর্বাচীনদের আস্পর্ধায়, অনধিকার চর্চায়। আমি ঋষির দেশের মানুষ, আমি বুদ্ধ-শংকর-চৈতন্যের সাধনার উত্তরাধিকার-ক্ষেত্রের অধিবাসী, আমি রামকৃষ্ট-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মানসভূমির বাসিন্দা। সমস্ত পৃথিবীও যদি তোমার কম্যুনিষ্ট হয়, তবু আমি বলব যে, গোল্লায় যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।"

ইহাই ছিল আমার মনোভাব। হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া গভীর নিশীথ রাত্রে সেদিন আমার সত্তার সমস্ত আবেগ আমি বন্ধুর নিকট অবারিত করিয়া দিয়াছিলাম। এই আত্মমোক্ষণে মনটা শান্ত হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি বল?"

পঞ্চাননবাবু ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "যাহা সত্য, তাহা আমার একান্ত আপন ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে আমি মাথাব্যথা করি না, বাদপ্রতিবাদও করি না। দেশের স্বাধীনতা চাই, তা যেভাবে যে-পথেই আসুক, তাতেই আমি প্রস্তুত। আমার নিজের কথা এর মধ্যে কিছু নাই। কম্যুনিস্ট হলেই যদি স্বাধীনতা আসে, আমি তাতেও প্রস্তুত। এই আমার সোজা হিসাব। আমার সত্য-মিথ্যার হিসাব আমি এর সঙ্গে জড়াইনে।"

গভীর রাত্রে উভয়ের নিকট উভয়ের হৃদয়ের দ্বার কৈশোর দিনের মতই আর একবার আমরা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলাম। হিমালয় এই হৃদয়োদ্ঘাটনের মৌন সাক্ষী রহিল!

আপনারা জানেন যে, চিরদিন কারো সমান যায় না, আমাদেরও যায় নাই। তাই দুঃখের দিন আমাদের দেখা দিতে লাগিল। তারিখটা এখন আর ঠিক স্মরণে নাই, তবে যতটুকু মনে পড়ে সেটা বোধ হয় এই বছরেরই প্রথম ভাগে, প্রথম বিপদটা দেখা দিয়াছিল। ঠিক দেখা না দিয়া দূর হইতে দাঁত দেখাইয়া অথবা ভ্যাংচি কাটিয়া গেল বলিলেই সত্য ভাষণ হইবে।

বেলা তখন গোটা নয়েক হইবে, পূবের পাহাড় ডিঙ্গাইয়া সূর্য আকাশের অনেকখানি হামাগুড়ি দিয়া আগাইয়াছে, আমরা ব্যারাকের বারান্দায় বসিয়া জটলা করিতেছিলাম। এমন সময় জনপঁচিশেক সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া মার্চ করিয়া গেটের পথে ক্যাম্পে ঢুকিয়া পড়িল।

তিন-নম্বরের সামনের মাঠটুকুর কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। সেখানে আসিতেই হাবিলদার অর্ডার দিল,—হল্ট। সিপাহীরা থামিয়া পড়িল। তারপর কি অর্ডার দিল তাহা হাবিলদারই জানে, আমরা দেখিলাম সিপাহী পঁচিশজন অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া বিশেষ একটা ভঙ্গীতে সঙ্গীনমুখো বন্দুক কয়টি আমাদের ব্যারাকের অভিমুখে বাগাইয়া, যাকে বলে তাক করিয়া রাখিল। আমরা ভাবিলাম, ব্যাপার কি!

বীরেনদা একটা চেয়ারে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, "ইয়ং বেঙ্গল, গরম সীসার জন্য রেডি হও।" গরম সীসা মানে গুলী।

সে নয় বুঝিলাম, কিন্তু হঠাৎ কেন এই যুদ্ধং দেহি ভাব, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। আর, ঐ নাকবোঁচা সিপাহীদের মুখের ভাব দেখিয়া আমাদের কারো মনে কোন সন্দেহ রহিল না যে, শুধু হুকুমের অপেক্ষা, তাহা হইলেই কারণে বা অকারণে হাসিতে হাসিতে উহারা গরম সীসা বর্ষণ করিতে পারে।

অনেকের ধারণা যে, ইহাদের হৃদয় বলিয়া কোন দৈহিক যন্ত্র আদৌ নাই, যেমন মাকুন্দদের বা মেয়েদের গোঁফ দাড়ি নাই।

উপেন দাস বলিলেন, "নে বাবা, এখন বন্দুকের মুখগুলো শূন্যের দিক রাখ না, তাক করবার যথেষ্ট সময় পাবি।"—ব্যারাকের ভিতরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একে একে সকলেই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "ব্যাপার কি?"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা মালুম হইল। ব্যাপার আর কিছু নয়, সেই যাকে বলে,—হিং টিং ছট। অপরিচিত কয়েকটি লালমুখো সাহেব গেট দিয়া ক্যাম্পে ঢুকিলেন, সঙ্গে ক্যাম্পের অফিসারগণ, পরে জানা গেল যে, হোমমেম্বর প্রেন্টিস সাহেব ক্যাম্প পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তাই এই সতর্ক আয়োজন।

যাক্ ব্যাপারটা সে-যাত্রা ভ্যাংচির উপর দিয়াই গেল। কিন্তু বিপদের ভ্যাংচি, কাজেই মনের নিশ্চিন্ত ভাবের গোড়াতেই একটা কামড় বসাইয়া দিয়া গেল।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা আপনাদের একটু স্মরণ করিতে হইবে, স্মরণে আমিই সাহায্য করিতেছি। আইন-অমান্য-আন্দোলনের পর 'অর্দ্ধনগ্ন ফকির'-এর সঙ্গে গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট হইয়া গিয়াছে, বড়লাট আরুইন বিদায় হইয়াছেন এবং মাস চারেক হয় লর্ড উইলিংডন দিল্লীর গদিতে আসিয়া বসিয়াছেন। দেশের মনের ভাব, লড়াইতে আমরা প্রায় জিতিয়াছি; আর বিলাতের চার্চিল-কোম্পানী এবং এ-দেশে তাদের সরকারী বে-সরকারী জাতভাইরা 'গেল রাজ্য গেল মান' ভাবনায় ম্রিয়মান হইয়া আছেন। নূতন বড়লাট বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়া গান্ধীজীকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে সম্মত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গান্ধীজী ১৯৩১ সালের ২৯শে আগষ্ট বোম্বাই হইতে লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তো বিলাতে রওয়ানা হইয়াছেন, আর এদিকে ব্রিটিশ সরকারী বে-সরকারী দল এই সুযোগে ভারতে বসিয়া

ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কাজটা পূর্বাহ্নেই সারিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একটা দিন বাদ গেল, তার পরেই ইংরেজগণ মাঠে নামিয়া পড়িলেন। গান্ধীজী বোম্বে ত্যাগ করিয়াছেন ২৯শে আগষ্ট, ৩০শে আগষ্ট চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আশানুল্লাকে নিজাম পল্টন ময়দানে সন্ধ্যাবেলা খেলার জনতার মধ্যে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক ১৬ বছরের একটি ছেলে পিস্তলের গুলীতে হত্যা করে। খানবাহাদুর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলা তদন্তের ও তত্ত্বাবধানের চার্জে ছিলেন, বিপ্লবীর হাতে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শহরের অপরাপর ইংরেজগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন যে, এবার মুসলমান সমাজ ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও বিদ্বেষ বেশ পাকা ও প্রগাঢ় হইবে এবং ফলে বিলাত হইতে 'অর্ধনগ্ন ফকিরকে' খালি হাতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু সেদিন ও সে-রাতে চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে কোন বিক্ষোভই দেখা গেল না। তবে কি হিসাবে ভুল হইল ?

বাধ্য হইয়া হিসাব ঠিক করিতে ইংরেজের গোপন হস্ত সক্রিয় হইল। গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ গেল যে, লাঠিসোঁটা লইয়া দলে দলে সকলে যেন শহরে আসে, কারণ খানবাহাদুরের শব লইয়া শোভাযাত্রা করা হইবে। পরদিন পঞ্চাশ হাজার মুসলমান জনতা শব-শোভাযাত্রার জন্য সহরে সমবেত হইল, হাতে তাদের লাঠিসোঁটা।

তারপরের সংবাদ সংক্ষিপ্ত। সিগন্যাল দেওয়া হইল—চট্টগ্রাম শহরে হিন্দুর দোকান বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদিতে নরকের মুখের ঢাকনী খুলিয়া গেল। বে-সরকারী ইংরেজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও পুলিশবাহিনী এই দানবীয় উৎসবে বীভৎস উল্লাসের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শহর হইতে মফঃস্বলেও এই নারকীয় অগ্নি বহন করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

বক্সা ক্যাম্পে আমাদের মনের আকাশেও মেঘ জমিল, আমরা কোথায়

চলিয়াছি এবং এ-দেশের কপালে না জানি আরও কি ভয়াবহ দুঃখ ও দুর্গতি লেখা আছে! ইংরেজের চরিত্রের আর নূতন করিয়া বিচার বা সমালোচনা আমরা করিলাম না। আমরা ভাবিত হইলাম অন্য কারণে।

চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজের যে-মনোভাব ও চরিত্র সেদিন ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই আমাদের বিশেষভাবে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতা কোন স্তরে ও কত অন্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে যে, এত অনায়াসেই বিদেশীদের হাতে অগ্নি-ইন্ধন হইয়া দেশের ঘরেই আগুন লাগাইতে পারে! জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কত বড় বিপজ্জনক শত্রু যে দেশের ঘরেই কুণ্ডলী পাকাইয়া গুপ্ত রহিয়াছে, সেদিন আমরা বুঝিতে পারিলাম। কোন ভয়াবহ ভবিষ্যতের প্রথম ও পূর্ণ রিহার্সেল যে সেদিন চট্টগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে অবশ্য ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত দেশকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

আমাদের ভাগ্যের আকাশে ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। বে-সরকারী ইংরেজ মহলে প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা আশু প্রয়োজন। 'ভারত-বন্ধু' ষ্টেটসম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরামর্শ দিলেন, বন্দিশিবির হইতে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের বাছিয়া লইয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড় করানো হউক! তারপর? তারপর আর বিশেষ কিছু নহে, গুলী করিয়া ইহাদের একটি একটি করিয়া হত্যা করা হউক। লাভ? লাভ হইবে এমন শিক্ষালাভ যে, জীবনে এদেশে কেহ আর কখনও বিপ্লবী হইবার কথা মনে আনিতেও সাহস পাইবে না, বিপ্লব তো অনেক দূরের কথা।

আমরা বাঁচিয়া আছি দেখিয়া মনে করিবেন না যে, এই পরামর্শ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। চট্টগ্রামের আগুন ভালো করিয়া নেভেও নাই, চট্টগ্রামের দিন পনর পরেই এই পরামর্শ বাস্তবে কার্যকরী করা হইয়া গেল।

১৭ই সেপ্টেম্বর পত্রিকার খবর পড়িয়া বক্সা ক্যাম্পে মৃত্যুর কালো ছায়া নামিয়া আসিল। খবরে প্রকাশ যে আগের দিন রাত্রে হিজলী বন্দিশিবিরের মধ্যে ঢুকিয়া সিপাহীরা বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছে। রাত্র তখন সাড়ে নয়টা হইবে,

কেহ কেহ আহার করিতেছিল, কেহ কেহ বা শয়ন করিয়াছিল, কেহ কেহ পড়াশুনা বা গল্পগুজব করিতেছিল, এই সময়ে এই আক্রমণ। সন্তোষ মিত্র শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহাকে তলপেটে গুলী করিয়া মারা হয়, আর তারকেশ্বর সেনকে কপালে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। গুলী ও বেয়নেটের চার্জে পঁচিশজন বন্দী মরণাপন্ন ভাবে আহত হয়।

খবরে সমস্ত ক্যাম্প ম্রিয়মান ও স্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও এক ভাই যে হিজলী ক্যাম্পে বন্দী, এই কথাটা নিজের মনে আনিতেও ভয় পাইতেছিলাম। আমাদের আহার বন্ধ হইয়া গেল। হিজলী গুলীবর্ষণের তদন্তের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন আরম্ভ করিলাম। সাতদিনের মধ্যেই খবর আসিল যে, এই ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে, আমরা অনশনব্রত ভঙ্গ করিলাম।

ক্যাম্পের নেতৃস্থানীয়দের অশঙ্কা ছিল যে, এই ঘটনায় বক্সা-ক্যাম্পে বন্দীদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে, হয়তো এখানেও ভয়ানক কিছু ঘটিতে পারে। কিন্তু তেমন কোন হঠকারিতা এখানে বন্দীদের পক্ষ হইতে কেহই দেখায় নাই। বঙ্গের বিপ্লবী দলগুলির নায়কগণ প্রায় সকলেই বক্সা-ক্যাম্পে থাকায় শিবিরে শৃঙ্খলা বস্তুটি ছিল, তাই হিজলীর পুনরাবৃত্তি আমাদের অদৃষ্টে দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের বন্দিজীবন হইতে আনন্দ ও সহজ ভাবটুকু হিজলীর ঘটনায় লোপ পাইয়া গেল। সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইতে আমাদের বেশ কিছুদিন লাগিয়াছিল।

দুঃখের দিন আমাদের শেষ হইল না। ক্যাম্পের কম্যাণ্ডাণ্ট হইয়া আসিলেন ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ সুপার কোট্রাম সাহেব। এই বেঁটে-খাটো লোকটি, যাঁকে আমাদের সন্তোষবাবু বা রবিবাবু এক চপেটাঘাতে সাবাড় করিতে পারেন, তিনিই ঢাকাতে এত অত্যাচার করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। ইঁহার হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, এমন অনেকেই বক্সা ক্যাম্পে তখন ছিলেন। তাঁহাদের কথার সত্যতা দুদিন না যাইতেই আমরাও স্বীকার পাইতে

বাধ্য হইলাম। এতবড় পাজী মানুষ জেলদারোগাদের মধ্যেও আমরা খুব কমই দেখিয়াছি।

কোট্রাম সাহেবের ছবি বা কীর্তি স্মরণে উদিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা বড় বিশেষ করিয়া আমার মনে জাগে। কথাটি এই, দুর্বল ব্যক্তির হাতে কদাচ ক্ষমতা দিতে নাই, দিলে সর্বনাশ অনিবার্য। বিশেষ করিয়া যাহারা অতি সহজেই বিচলিত হয়, বিপদের সম্ভাবনাতেই যাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়, তেমন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়ার মত বিপজ্জনক ব্যবস্থা আর হইতে নাই।

টাকার যেমন একটা গরম আছে, শক্তিরও তেমনি একটি গরম আছে। শক্তিকে যাহারা সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বহন করিতে পারে না, তাহারা বহুর ক্ষতি তো করিবেই, নিজেরও ক্ষতি তাহারা করিয়া বসে। শক্তি পাওয়াই যথেষ্ট নহে, শক্তির উপর আধিপত্য অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

এইজন্যই ভারতীয় সাধক-সমাজে শক্তি-অর্জন যেমন সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়, শক্তি বর্জন তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর সিদ্ধি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। শক্তি বর্জন মানে শক্তিকে নিজের স্বভাবের মধ্যে সংহরণ করিয়া গোপন করা। যে-শক্তি নিয়ন্ত্রিত ও সংযত নহে, সে-শক্তির স্বভাবে প্রলয় ও অকল্যাণ নিহিত আছে, ইহার দৃষ্টান্ত ভারতীয় পুরাণের দৈত্য ও অসুরগণ। শক্তির সিদ্ধি তাহাদের ছিল, কিন্তু সে-শক্তিকে শান্ত করিয়া দেবশক্তির কল্যাণ স্বভাবটুকু আয়ত্তগত করিবার কৌশল তাহারা জানিত না। আমার বহুদিনের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সৃষ্টিতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান, যার চিত্ত সর্বাবস্থায় শান্ত ও সমাহিত।

কোট্রাম সাহেবের প্রসঙ্গে শক্তির এই তথ্যটুকুর কথাই আমার বার বার মনে হইত এবং এখনও লিখিতে গিয়া আবার মনে পড়িতেছে। লোকটি অত্যন্ত নার্ভাস্ প্রকৃতির, অল্পেই বিচলিত হইয়া পড়া ছিল তাঁহার স্বভাব। তাই আমরা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম যে ব্যাটা না জানি কখন কি কাণ্ড ঘটাইয়া বসে।

কোট্রাম সাহেব যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা তাঁহার আগমনের দিন কয়েকের মধ্যে টের পাওয়া গেল। দুর্গের পশ্চিম পাদমূল ঘেষিয়া যে ঝরণাটি প্রবাহিত

ছিল, তাহা হইতেই আমাদের স্নানাহার ইত্যাদির প্রয়োজনীয় জল সঞ্চয় করা হইত। একটা ইঞ্জিন ঘর ছিল, তাহার সাহায্যেই পাম্প করিয়া জল আনিয়া প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে মজুত করা হইত। ইঞ্জিন ঘরের মুখোমুখী ঝরণার অপর তীরে বকসার পোস্ট অফিস, মাঝখানে কাঠের একটা চওড়া পুল, দুর্গ হইতে এই পথেই বক্সা স্টেশনে যাইবার রাস্তা।

ভোরের দিকেই ইঞ্জিনটা বিগড়াইয়া গেল। ক্যাম্পে জলাভাব দেখা দিল। ভুটিয়া কুলীরা টিনে করিয়া জল আনিয়া রান্নাবান্নার প্রয়োজনটুকু নির্ব্বাহ করিয়া দিল। সমস্যা দেখা দিল স্নানের জলের। তিন চৌকার তিন ম্যানেজার চিঠি দিলেন যে, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খিড়কীর গেটটা খুলিয়া দেওয়া হউক, আমরা ঝরণার জলে স্নান সারিয়া আসি।

প্রস্তাবটা মোটেই অযৌক্তিক বা আদৌ নূতন ছিল না। একবার এই ঝরণাটা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল, পাম্পের সাহায্যে যে-জলটুকু পাওয়া যাইত, তাহা রান্নাবান্না ইত্যাদি গৃহস্থালীতেই ব্যয় হইয়া যাইত। তখন এই খিড়কীর দরজাটা ঘণ্টা কয়েকের জন্য খোলা হয়, আমরা দল বাঁধিয়া নীচের বড় ঝরণাটায় স্নানাবগাহন ক্রিয়া দিনকতক করিয়াছিলাম। কিন্তু কোট্রাম সাহেব তিন ম্যানেজারের চিঠির কোন প্রত্যুত্তরই দিলেন না।

ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পার হইল, সূর্য্যও আকাশের তুঙ্গে স্থির হইয়া তপ্তরৌদ্র বর্ষণ করিতেছিল। কাজেই বাবুদেরও মাথার তাপ সর্বোচ্চ পয়েণ্ট স্পর্শ করিয়া বসিল। আমরা অধিকাংশই বাঙাল, জলের দেশের মানুষ, আমাদিগকে জল ও স্থল উভচরই বলা চলিতে পারে। বর্ষার দুইটা মাস তো আমরা ঘরবাড়ী সমস্ত কিছু লইয়া জলেই ভাসমান জীবন যাপন করিয়া থাকি। স্নানটা আমাদের চাই-ই। তাপটা তাই আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ধর-ধর হইল, তার কিছু উত্তাপ অফিস পর্য্যন্ত পৌছিল।

সাহেব অবশেষে অর্ডার দিলেন, দশজনের এক একটি দল ছাড়া হইবে, তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার দশজন স্নানার্থে নির্গত হইবে। কিন্তু

কিছুক্ষণ পরেই সাহেবের ভুল ভাঙিল যে, এই ব্যবস্থায় সকলের স্নান শেষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কাজেই খিড়কীর গেট দেড় ঘণ্টার জন্য খুলিয়া রাখার অর্ডারই শেষে প্রদত্ত হইল।

কোয়াম সাহেব দুই কারণে গেট খুলিতে রাজী হন নাই। প্রথম, বন্দীদের বাহিরে আনা বড়ই বিপজ্জনক ঝুঁকি, এই পাহাড়ের কোন পথে কে সরিয়া পড়ে তাহার কোন স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়, ইঞ্জিনটাকে একটু ঠুকিয়া-ঠাকিয়া লইলেই সে আবার চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

কাপড়-গামছা লইয়া খিড়কীর পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তা ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। দুই ধারে পাহাড়ের উপরে এখানে সেখানে রাইফেল হস্তে সিপাহীরা সামরিক ঘাটি আগলাইয়া আছে। ইঞ্জিন ঘরের কাছা-কাছি আসিয়া পড়িলাম।

দেখিলাম, পুলের রেলিং দুইটা আলনার কাজ দিয়াছে, বাবুদের কাপড় গেঞ্জি, সার্ট ও টাওয়েল সেখানে ঝুলিতেছে। আর একটু আগাতেই দেখি যে, ঝরণার জলে বাবুরা চীৎ হইয়া আছেন, মাথাটা পাথরের উপাধানে রক্ষিত।

অবশেষে স্থানে পৌছিয়া গেলাম। গিয়াই থম্‌কাইয়াইয়া দাঁড়াইলাম, ব্যাপার গুরুতর।

• ইঞ্জিন ঘরের সম্মুখে ছোটখাটো একটি ভীড়। কোন বস্তুকে কেন্দ্রে রাখিয়া ভীড়ের এই বেষ্টনী, দেখিবার জন্য দৃষ্টিটা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল, কিন্তু ভীড়ের বহির্ভাগেই ধাক্কা খাইয়া দৃষ্টি প্রতিবারই প্রতিহত হইতেছিল।

একবার একটু ফাঁক পাইয়া গেলাম, দৃষ্টিটা সে-পথে সোজা কেন্দ্রে গিয়া শলাকার মত যে-বস্তুটিতে বিদ্ধ হইল, তাহা একটি টুপি। ধূম হইতে অগ্নি অনুমানের ন্যায় টুপি হইতে আমাদের কমাণ্ডাণ্ট কোট্টাম সাহেবকে পাইয়া গেলাম।

তাঁহার সম্মুখে দেখিলাম, বিরাট দেহ লইয়া বিজয় (দত্ত) ও ভূপেনবাবু (দত্ত) দণ্ডায়মান, কোট্টামের মুখের সম্মুখে বিপজ্জনকভাবে হাত নাড়িয়া উত্তেজিতভাবে বাক্য বাণ বর্ষণ করিতেছেন। আর সকলেও যে চুপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু এই দুই বক্তাই বিশেষভাবে কোট্টামকে লইয়া পড়িয়াছেন।

সাহেবের আরদালী কালো টুপি মাথায় অদূরে দাঁড়াইয়া নাট্যের অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছে, সময় বুঝিলেই বাঁশী বাজাইয়া দিবে। তারপরের কাজটুকু যাহাদের উপর, তাহারাও অদূরে দুই ধারে পাহাড়ের উপর রাইফেল-হাতে প্রস্তুত হইয়া আছে।

ভয় পাইয়া গেলাম। যে-ভাবে ইঁহারা কোট্টাম সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করিতেছেন, তাহা হাতাহাতিতে পরিণতি লাভ করিতে বেশী সময় লইবে বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরে কি ঘটিতে পারে, তাহা আর অনুমান করিয়া দরকার নাই।

ভয় পাইবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল—বিজয়। আমার এই বন্ধুর একটু পরিচয় দিলেই বুঝিবেন যে, ভয় হওয়াটা উচিত কি অনুচিত।

আপনারা জানেন যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারেরা স্বভাবে একটু গুণ্ডা প্রকৃতির হইয়া থাকে। না হইয়াও উপায় নাই। মানুষের জ্যান্ত ও মরা দুই রকম শরীর

কাটাছেঁড়া লইয়াই একের কারবার, তাই দেহে ও মনে দয়া মায়া ইত্যাদি দুর্বলতা এদের থাকেও না। আর, দ্বিতীয়টির কারবারও প্রায় ঐ একই গোছের। লোহা পোড়াইয়া হাতুড়ী পিটাইয়া গঠন দেওয়া, পাহাড় ফাটাইয়া পথ বাহির করা, বাঁধ বাঁধিয়া নদীকে নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশ্বকর্মার বিরাট হাতুড়ী ইহাদের হাতে, হাতুড়ীতে একদিক দিয়া ভাঙেও যেমন, গড়েও তেমন। এই ভাঙা-গড়ার কাজে ইহাদেরও দেহ ও মন হইতে দুর্বলতার ক্লেদটুকু মার্জিত হইয়া স্বভাবে একটি নির্মম কাঠিন্য সঞ্জাত হয়।

বিজয় ছিল ইঞ্জিনীয়ার। ছাত্র-জীবনে কলেজে শারীরিক শক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "হিরো অব দি ডে"-এর লরেল কয়েকবারই সে পাইয়াছিল। শরীরে অসুরের শক্তি। শরীরটাও অসুরের। লোকে বিজয় দত্ত না বলিয়া বলিত বিজয় দৈত্য।

সালটা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৯২৯ সালই হইবে। মাদারীপুরের যে সরকারী রাস্তাটা কোর্টের দিক হইতে থানার অভিমুখে গিয়াছে, বিজয় সেই রাস্তা ধরিয়া আগাইতেছিল; সময় তখন অপরাহ্ণ। বিপরীত দিক হইতে পুলিশ সুপার হলম্যান সাহেব ছ'ফুট তিন ইঞ্চি শরীর লইয়া আরদালী সহ লম্বা পায়ে আসিতেছিলেন।

বিজয় মনে করিল যে, সাহেব পাশ কাটাইয়া যাইবে, সাহেব মনে করিলেন যে, বাঙ্গালীবাবু পাশ কাটাইয়া যাইবেন। অর্থাৎ উভয়েই মিলিটারী। একের মনোভাব, নিজের দেশে নিজের সহরের রাস্তায় ঐ ব্যাটাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ানো চলিতে পারে না। অপরের মনোভাব, রাজার জাতি, তদুপরি পুলিশের বড়কর্তা, সহরের রাস্তায় তাঁরই অধিকার এবং নেটিভকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া, সে কি একটা কথা হইল! ফলে, বিপরীত দিক হইতে দুই দৈত্য একে অপরের মারাত্মকভাবে মুখোমুখী হইয়া পড়িল, পরমুহূর্তেই কলিশন।

মিঃ হলম্যান ধাঁ করিয়া এক ঘুঁষি মারিয়া বসিলেন। বিজয় প্রত্যুত্তরে দিল দুই ঘুঁষি, চোট সামলাইতে না পারিয়া সাহেব পুঙ্গব মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

আরদালী বাঁশী বাজাইয়া দিল, পাশেই ছিল পুলিশ ব্যারাক, লাঠিসোঁটা হাতে পুলিশের দল বাহির হইয়া আসিল। এদিক হইতে আসিল ক্লাবের ছেলেরা, তাদেরও হাতে লাঠি। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড, ছোট্ট সহরের ডোবায় বিজয় যেন সমুদ্রের তুফান জাগাইয়া বসিয়াছে।

ব্যাপারটা অবশ্য ভালোয় ভালোয় শেষ হইয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

বিজয় বলিল, "ছাব্বিশ।"

—"আমার সাতাশ। আমরা সমবয়সী। আমি ঘুঁষি মেরেছি, তুমিও মেরেছ, চুকেবুকে গেল। নেও, This is a present for you," বলিয়া নিজের ছড়িটা বিজয়কে উপহার দিল।—এই সেই বিজয় দত্ত।

আর ভূপেনবাবু (দত্ত), তাঁহারও এই বিষয়ে সুনাম আছে। শুনিয়াছিলাম যে, সাহেব দেখিলেই নাকি তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া বসে এবং তখন ইংরেজীতে যে বকুনী নির্গত হয়, তাহা প্রায় লাভা-স্রোতেরই সামিল। এই দুই দত্তের পাল্লায় কোট্রাম সাহেব নিপতিত হইয়াছেন। ইহার পরিণামটা যে নির্ঘাত রোমহর্ষক, তাহা দিব্য-চোখে দেখিয়া ফেলিলাম।

রোগা পাতলা মানুষ আমি, ভীড়ের ফাঁকে অলিঘুঁজি গলিয়া একেবারে কেন্দ্রের অকুস্থানে উপস্থিত হইলাম। যে-দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোট্রাম সাহেব বংশপত্রের মত কম্পিত হইতেছেন। সাহেবও ভয়ে কাঁপেন, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছেন! অন্ততঃ আমি পারি নাই।

সাহেবের সার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, হাতে একটা ঝাড়ন, তাহাতে ও সাহেবের দুই হাতে কালির দাগ। বুঝিলাম, বিগড়ানো ইঞ্জিনটাকে মেরামত করিতে নিজেই হাত লাগাইয়াছেন। সেই ঝাড়ন হাতে আমাদের সাহেব কাঁপিতেছিলেন। ভূপেনবাবু যত প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার উত্তরে তিনি শুধু তো-তো করিতেছেন। ভয়ে জিভে জড়তা আসিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ে দয়া উপজিল।

বিজয়কে কহিলাম, "কি আরম্ভ করেছিস? যা, স্নান করতে যা।" বাক্যে ফল দিল, বন্ধু স্থান ত্যাগ করিল।

যাইবার সময় সাহেবকে একটি সদুপদেশ দিয়া গেল, "ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কর, নইলে অদৃষ্টে তোমার দুঃখ আছে।"

ভূপেনবাবু বয়স্ক ব্যক্তি, তদুপরি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাকে কিছু বলা শোভা পায় না। তাই কোট্টাম সাহেবকে লইয়াই পড়িলাম।

বলিলাম, "এস" এবং হস্ত ধারণপূর্বক তাঁহাকে ভীড় হইতে বাহির করিয়া উভয়ে ইঞ্জিন ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ইঞ্জিনের একটা লোহার ডাণ্ডার উপর নিতম্ব স্থাপনপূর্বক আমি হাফ-উপবিষ্ট হইলাম, মিঃ কোট্টাম সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নিজের ইংরেজী বিদ্যায় যতটা কুলাইল, তাহাতে সাহেবকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলাম। উপদেশগুলি খুব সারগর্ভ ও ভালো ছিল, কারণ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু তোমার নাম?"

বুঝিলাম ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি। ব্যাটা এক কান দিয়া শুনিয়াছে, অন্য কান দিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, অর্থাৎ উপদেশে কর্ণপাত করে নাই। এখন তাহার হৃদয়ে বোধহয় কৃতজ্ঞতার ঢেউ চলিতেছে, তাই রক্ষাকর্তার নাম জানাটাই হইয়াছে তাঁহার প্রথম কর্তব্য।

কহিলাম, "আমার নাম দিয়ে তোমার কোন কাম নাই। যা বলি শোন ক্যাম্প চালাতে হলে এ বুদ্ধি ও মেজাজ দুই তোমাকে ছাড়তে হবে। ক্যাম্পের যাঁরা ম্যানেজার তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি চল, তবে কোন হাঙ্গামাই তোমাক পোহাতে হবে না, নইলে প্রতি পায়ে তুমি বিপদে পড়বে।"

শুনিয়া কোট্টাম সাহেব বলিলেন যে, তিনি এই পরামর্শ মনে রাখিবেন। তারপর বলিলেন, "বাবু, তোমার নামটি বল।"

কি বিপদ, আমার নাম কি এমনই বস্তু যে স্মৃতিতে কবচ করিয়া রাখিলেই সমস্ত মুশকিল আসান হইয়া যাইবে। যাক্, এমন ধন্না দিয়া

ধরিয়াছেই যখন, দেই না কেন নামটা ফাঁস করিয়া। নামটা আমার জিহ্বা হইতে সাহেবের কর্ণে চালান করিয়া দিলাম।

মিঃ কোট্রাম যে অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, এই প্রথম পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দু'দিন না যাইতেই তিনি ক্যাম্পে একটা হৈ-হৈ তুলিয়া দিলেন।

এতদিন আমাদের রোলকলের তেমন কোন হাঙ্গামা ছিল না। ফিনী সাহেবের আমলে মিঃ লিউলিন আই-সি-এস ছিলেন এডিসন্যাল কমাডাণ্ট, একটা খাতা বগলে তিনি সারা ক্যাম্পে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম মিলাইয়া দাগ দিয়া যাইতেন। এই জন্য কখনও রান্নাঘরে, কখনও স্নানের ঘরে, এমনকি, পায়খানার মহল পর্যন্ত তাঁহাকে ধাওয়া করিতে হইত। অর্থাৎ রোল-কলের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকিলেও আমরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

কোট্রাম সাহেবের এই অবস্থা মোটেই মনঃপুত বোধ হইল না। তিনি একদিন ব্যবস্থা দিলেন যে, ভোর আট ঘটিকার সময় প্রত্যহ সকলকে ক্যাম্পের বাহিরে খেলার মাঠে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, তখন রোলকল বা নাম-ডাকা হইবে। হুকুম শুনিয়া, আসলে পাঠ করিয়া আমরা ভাবিলাম, ব্যাটা বলে কি!

তিন পার্টির তিন সভা বসিয়া গেল, বিবেচনার বিষয় হইল—কিং কর্তব্যং। আমাদের পার্টির সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন মাষ্টার মশায় (যতীশ ঘোষ)। সভায় বয়স্করা মন্তব্য করিলেন যে, আমরা এতকাল সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছি, লিউলিন ভালো মানুষ বলিয়া রোলকলের সময়টা সীটে না থাকিয়া যদৃচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাই আজ এই সমস্যা।

কে একজন বলিলেন, "তাতো বুঝলাম, এখন কি করবেন, তাই বলুন"

কি করা যায়, কাঁচা পাকা সব মাথাতেই এই প্রশ্নটার নাড়াচাড়া চলিতেছিল। স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করায় সকলেই সাময়িকভাবে চুপ করিয়া গেলেন।

কোট্টাম সাহেব যে অত্যন্ত গোঁয়ার মানুষ, ঢাকার লোকেরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই রিপোর্ট সভায় পূর্বেই পেশ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি হিজলী বন্দিনিবাসে গুলীবর্ষণের কথাটা তখনও আমাদের স্মৃতি হইতে লোপ পায় নাই।

এক প্রবীন ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন, "সাহেবের সঙ্গে একটা আপোষের চেষ্টা করা যাক।"

একজন প্রশ্ন করিলেন "সাহেব শুনবে কেন?"

যতদূর মনে পড়ে এই সময়ে খাঁ সাহেব প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, "কি সর্তে আপনারা আপোষ করতে পারেন?"

আপোষের প্রস্তাব যিনি তুলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "রোলকলের সময়টা আমরা যে-যার সীটে থাকব।"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "তা নয় রাজী হওয়া গেল, কিন্তু কাল ভোর থেকেই যে মাঠে যাবার অর্ডার দিয়ে বসেছে। আপোষের কথা শুনবে বলে তো মনে হয় না।"

আমরা ভাবিত হইয়া পড়িলাম, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গিয়াছে! সভার আলোচনা হইতে এইটুকু বুঝা গেল যে, ইহা যে আমাদের কৃতকর্মের ফল, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

সভাপতি মাষ্টার মশায় এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?"

এতক্ষণ চুপ করিয়া বুদ্ধিমানের মত সভার শোভাবর্ধন করিতেছিলাম, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ধরাইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ ভাষণের বিপদে তিনি আমাকে ফেলিলেন।

বলিলাম, "কোট্টামকে সোজা জানিয়ে দিন যে, তাঁর এ-প্রস্তাব মানতে আমরা অক্ষম।"

নাম বলিব না, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একেবারে মারমুখী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এর পরিণাম কি হবে, ভেবে দেখেছেন?"

কহিলাম, "সাধ্যমত দেখেছি।"

ধমকের সুরে বক্তা প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখেছেন?"

—"দেখেছি যে, এর পরে রোলকলের সময় আমাদের সীটে থাকতে হবে।"

বক্তা যেন আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় পাইয়াছেন, এমনই মনোভাবে প্রশ্ন করিলেন, "জানেন, এ-প্রস্তাব তুনম্বর কিচেন থেকে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল, তৎসত্বেও কোট্রাম এই অর্ডার দিয়েছে।"

কহিলাম, "জানি।"

—"তবে কেমন করে বলেন যে, সীটে থাকতে আমরা রাজী হলেই কোট্রাম রাজী হবে।"

এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলাম, "কোট্রাম যাতে রাজী হয়, সেজন্যই তো জানাতে বলেছি যে, তার অর্ডার মানতে আমরা অক্ষম।"

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলিলেন, তার নির্গলিতার্থ যে, আমি অপরিণামদর্শী, ক্যাম্পকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার বক্তব্য শ্রবণের পর সভার অধিকাংশই সাব্যস্ত করিলেন—আমার প্রস্তাবিত পন্থাই আপোষে পৌঁছিবার সহজ রাস্তা। আপোষের কথাটা কোট্রামের দিক হইতে না-আসা পর্য্যন্ত আপোষের যখন সম্ভাবনা নাই, তখন ব্যাটাকে আপোষের পথে নামাইতে হইলে নিজেদের ঠিক বিপরীত পথে আক্রমণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সাব্যস্ত হইল যে, এ হুকুম আমরা মানি না।

যাহা ভাবা গিয়াছিল, তাহাই হইল, কিছু টানা-হ্যাচঁড়ার পর কোট্রাম সাহেব আপোষে আসিতে বাধ্য হইলেন। ঠিক হইল যে, রোল কলের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমরা সীটে থাকিব।

কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও কোট্রাম সাহেব তুদিনের মধ্যেই খুঁত বাহির করিলেন। রোল কলের সময় তাঁহাকে দেখিয়াও বিজয় দত্ত উঠিয়া বসে নাই, টান হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল, এই অপরাধে এক সপ্তাহ তার চিঠি

পাওয়া ও দেওয়া বন্ধ হইল। আরও কয়েকজনের ক্ষেত্রেও এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিলেন।

ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। ঢাকায় কোট্টাম সাহেব স্বদেশী পরিবারগুলির উপর যে-নির্যাতন করিয়াছেন, সে-জ্বালা অনেকেরই মনে ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হইল ক্যাম্পের এই বিরক্তিজনক ও অপমানকর ব্যবহার। ক্যাম্পের বাতাসে একটা সম্ভাবনা ঘুরাফিরা করিতে লাগিল যে, হয়তো কিছু একটা শীঘ্রই ঘটিবে।

কিছুটা ঘটিয়াও গেল। একদিন দুপুরবেলা খবর আসিল যে, অফিসে ধীরেনবাবু (মুখার্জ্জি) কোট্টামকে জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেলে আবদ্ধ করা হইয়াছে। পরদিন শোনা গেল যে, পূর্ণানন্দবাবুও (দাশগুপ্ত) পূর্বদিনের ন্যায় অফিসে কোট্টামকে জুতা মারিয়াছেন এবং তিনিও সেলে আবদ্ধ হইয়াছেন।

পূর্ণানন্দবাবু অনুশীলন-পার্টির লোক, তেজস্বী ব্যক্তি, তাঁহারই নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। কাজেই অনুশীলন-পার্টির এই কাজটিকে সমর্থন করা কোন কোন মহলে স্বভাবতঃই সম্ভব হয় নাই, এমন কি নিন্দাই শোনা গেল। নিরপেক্ষ মহল হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মন্তব্য করিলেন যে, কাজটা ভালো হয় নাই।

ক্যাম্পে জনমত গঠনের এই চেষ্টাটা আমার ভালো লাগিল না। বন্ধুবর পঞ্চাননবাবু এবং আমিও প্রকাশ্যে এই কাজ সমর্থন করিয়া বলিলাম যে, ব্যাটার প্রাণ যাওয়াই উচিৎ ছিল, জুতার উপর দিয়া গিয়াছে, ইহা কোট্টামের ভাগ্যই বলিতে হইবে।

জলপাইগুড়ি কোর্টে পূর্ণানন্দবাবু ও ধীরেনবাবুর বিচার হইল, বিচারে উভয়ের ছয় মাস জেল হইল। কোট্টাম সাহেবকে জুতা মারার অপরাধে তাঁহারা ডেটিনিউ-স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া কয়েদীর ভূতলে পতিত হইলেন, জলপাইগুড়ি হইতে কলিকাতার জেলে তাঁহারা চালান হইয়া গেলেন।

কোট্টাম সাহেব ইহার পরে যেন কতকটা শান্ত হইলেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু স্বভাব যাইবে কোথায়? কোট্টাম সাহেবের স্বভাবদোষে ও বুদ্ধির ত্রুটিতে তিনি কিছুকাল পরেই বক্সা-ক্যাম্পে ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে শ'খানেক বন্দীরও জীবন যে সেদিন শেষ হয় নাই, সেটা নেহাৎ দৈবের দয়া। আমরা বক্সা ত্যাগ করার পরেই ঘটনাটি ঘটে।

সুরপতি চক্রবর্তীর নাম আপনাদের স্মরণ আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে এবং জানিলে জীবনে কেহ ভুলিতে পারিবেন না। দীর্ঘকায়, রোগা মানুষ; সারা মুখে খাড়ার মত একটা নাক ঝুলিয়া আছে, আর আছে দুইটি চোখ, যাহা শিশুর চোখের মত পরিষ্কার। আসল খবরটাই বলা হয় নাই, রংটি ব্রাহ্মণের কিন্তু আবলুস কালো। ডেটিনিউদের মধ্যে যদি প্রতিভাবান ও মেধাবী বলিয়া কাহাকেও গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই সুরপতিবাবু। এম এস-সি পরীক্ষার আগে ধরা পড়েন। ফরাসী ভাষাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। পরিচয় আরও একটু বাকী আছে। পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য রেল ষ্টেশনে চায়ের দোকানে চাকর হইয়াছেন, কলিকাতাতে কোন এক গৃহস্থ বাড়িতেও কিছুদিন বাসন-মাজা চাকরের চাকরী করিয়াছেন। চেহারাটা এই দিক দিয়া তাঁহার কাজে লাগিয়াছিল।

কয়েকদিন যাবৎ রোল কলের সময় সুরপতিবাবুকে পাওয়া যাইতেছিল না। অফিসাররা অবশ্য অন্য সময়ে দেখিতে পাইতেন যে, তিনি ক্যাম্পেই আছেন। চতুর্থ দিনে কোট্টাম চিঠি দিয়া তাঁহাকে অফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সুরপতিবাবু এই নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তিনি একটি ভুলও এই সঙ্গে করিয়া ফেলিলেন। বিকালে গেট খুলিলে তিনি আর সকলের সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়া হাজির হইলেন।

খেলার মাঠটির উত্তরেই উঁচু স্থানে কমাণ্ডাণ্টের বাংলো। আরদালী সহ

ট্রাকোম সাহেব বাংলো হইতে বাহির হইয়া উত্তরের গেট দিয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অফিসে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। মাঠের মধ্যভাগে আসিতেই সুরপতিবাবুকে দেখিতে পাইলেন। আগাইয়া গিয়া সুরপতিবাবুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "you are under arrest" অর্থাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

কোট্রাম সাহেবের স্থান ও সময় নির্বাচনে অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। বন্দীরা খেলা ফেলিয়া সাহেবকে বেষ্টন করিয়া লইল, এক ঝটকায় সুরপতিবাবুকে ছাড়াইয়া লইল এবং কোট্রাম সাহেবের হস্ত চাপিয়া ধরিল।

বাংলো হইতে মেম সাহেব বাহির হইয়া আসিয়া ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আর এদিকে দক্ষিণে হাত ত্রিশ-চল্লিশ উপরে ক্যাম্পের সীমানায় রাইফেল হাতে সিপাহীরা স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। হাবিলদার অর্ডার দিল, "বন্দুকে গুলী ভর"। পঁচিশটি রাইফেলে গুলী ভরা হইয়া গেল। পরে অর্ডার দিবে—"ফায়ার।"

ঠিক এই সময়েই এডিসন্যাল কম্যাণ্ডাণ্ট ক্যাডম্যান আই-সি-এস-এর উচ্চ চীৎকার শোনা গেল—"stop।" দৌড়াইয়া আসিয়া সাহেব সিপাহীদের উদ্যত বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সুরপতিবাবুকে লইয়া কয়েক বন্ধু ইতিমধ্যেই পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া ক্যাম্পে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তখন বন্দীরা কোট্রামকে কহিলেন, "তুমি এখন যেতে পার।"

ছাড়া পাইয়া কোট্রাম সাহেব আবার রাস্তা ধরিয়া অফিসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন পর্যন্ত পা তাঁহার ঠিকমত পড়িতেছিল না, ক্যাডম্যান দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া কোট্রামের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

মেম সাহেবও বাংলোতে গিয়া ঢুকিলেন।

স্মৃতি হইতে অনেক বড় বড় ঘটনা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বক্সা ক্যাম্পের একটি ভোরের স্মৃতি এখনও মন ধরিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাই।

দুর্গের ঘণ্টায় সাতটা বাজিলে তবে আমার ঘুম ভাঙ্গে, ইহার আগে জাগিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না। ভোরের বাজার নাই, স্কুল-কলেজের পড়া নাই, অফিসের চাকুরী নাই, কারও খাইও না পরিও না, অর্থাৎ সপ্তাহে সাতটাই রবিবার। পুণ্যের জোর ছিল, তাই "ডেটিনিউ" হইয়াছি, এক কথায়—চুটাইয়া পেনসন ভোগ করিতেছি।

সেদিন যথাসময়ে ভোর হইয়াছে, তেমনি আমার যথাসময়ে ঘুমও ভাঙ্গিয়াছে এবং জাগিয়া যথানিয়মে আবার ঘুমাইতেছিলাম। মানে, পাশ ফিরিয়া পাশ বালিশটা টানিয়া লইয়া চোখ বুজিয়া আরাম করিতেছিলাম।

চোখ বুজিয়া দৃশ্য বন্ধ করা চলে এবং ইচ্ছা হইলে চোখ বন্ধ করাও চলে, কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর মানুষের তেমন কোন অধিকার নাই। ইচ্ছা হইলেই কর্ণ বন্ধ করা তো পরের কথা, ইচ্ছা হইলে যে পশুদের মত কানটা নাড়িব, মানুষ হইয়াও আমাদের সে সুবিধাটুকু নাই। মানুষ হওয়া মানেই যে বেশী সুবিধা পাওয়া, ইহা যেন কেহ মনে না করেন।

কাজেই, বিছানায় শুইয়াই বারান্দার গলার আওয়াজ শুনি। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে-জাগারদল ভোরের বাতাস হইতে অগস্ত্যটানে স্বাস্থ্য শুষিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়াছেন বুঝিলাম। ব্রাহ্মমুহূর্তের ব্রহ্মচারী দলের আওয়াজ কানে আসে, একবার ভাবি উঠিয়া পড়ি, খানিকটা পাহাড়ী বাতাস গিলিয়া আসি, কিন্তু আত্মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না, অর্থাৎ আরামের শয্যা কিছুতেই রেহাই দিতে চাহিল না।

এমন সময়ে কানে আসে বারবেলের শব্দ, ডাম্বেলের ঠুংঠাং, মুগুরের সোঁ-সোঁ, বৈঠকের দুপ্‌দাপ। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কম্বলের ঘরে বিজয় দত্তের দল ঢুকিয়াছে।

কম্বলের ঘর মানে ব্যায়ামশালা। ব্যারাকের ঘরের মধ্যেই খানিকটা জায়গা কম্বলে ঘিরিয়া লইয়া বিজয় এই ব্যায়ামাগার বানাইয়াছে। দেয়ালে দুই দুইখানা বৃহৎ আয়নাও টানাইয়াছে, সম্মুখে দাঁড়াইলে পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্যন্ত তামাম শরীরটাই দেখিয়া লওয়া চলে। কয়েক জোড়া মুগুর, বারবেল, ডাম্বেল ইত্যাদি সাজসরঞ্জামও সে সংগ্রহ করিয়াছে।

আর সংগ্রহ করিয়াছে স্বাস্থ্যান্বেষী একটি দল, যাঁহারা বিজয়ের তত্ত্বাবধানে এই কম্বলের ঘরে স্বাস্থ্যের সাধনা করিয়া থাকেন। বিরানব্বই পাউণ্ড ওজনের একটি শরীর ও বগলে একটি ল্যাঙ্গোটী লইয়া পান্নাবাবু (মিত্র) পর্যন্ত দুইবেলা এই কম্বলের ঘরে নিয়মিত প্রবেশ করিয়া থাকেন।

কম্বলের ঘরের দুপ্‌দাপ্‌, সোঁ-সোঁ, ফোঁস-ফোঁস কানে আসিতে লাগিল। হঠাৎ ভয়ানক একটা আওয়াজে চমকাইয়া উঠিলাম, ভারী একটা বস্তু পতনের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ফণীর (মজুমদার) আর্তচীৎকার—'বাবারে গেছিরে।'

ফণীর চীৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটিয়া আসিয়া মশারীর মধ্যে আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কমাণ্ডাণ্ট ব্যাটা বাঁশডলা দিতে ব্যারাকে ঢুকিল না তো ?

কহিলাম, "কি উপেনবাবু (দাস) কি হোল ? ব্যাপার কি ?"

উপেনবাবু বলিলেন, "দৈত্য মুগুর ছুড়ে মেরেছে। কপাল ঘেঁষে ফসকেছে কিন্তু বুকের অর্ধেকটা রক্ত শুষে নিয়ে গেছে।"

বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম এবং অকুস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিক্ষিপ্ত গদা যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না।

বলির পাঁঠা নিশ্চয় দেখিয়াছেন, কাজেই আপনাদের বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবে না। মরা ছাগলের চোখ যদি আপনাদের দেখা থাকে, তবে দৃশ্যটি ষোল আনাই আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবেন। ফণী তেমনি চোখমুখ লইয়া তাহার লোহার খাটিয়ার একটা পাশ চাপিয়া ধরিয়া আছে

এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। চোখে চোখ পড়িতেই সানুনাসিক স্বরে, ফণী নস্য ব্যবহার করিত, যাহা বলিল, তাহার চেয়ে ক্রন্দনও ভালো ছিল।

আমাকে দেখিয়াই ফণী বলিয়া উঠিল, "বাবা বলতেন, এত লোক মরে, আর এ ব্যাটা একেবারে অমর হয়ে জন্মেছে, যমেরও অরুচি। এত সয়েও টিকে গেছি। শেষে কিনা এখানে এ-ব্যাটা আস্ত যম হয়ে ঢুকেছে, আমাকে সাবাড় না করে ছাড়বে না।"

—"কার কথা বলছিস ?"

—"আর কার কথা ? তোমার গুণধর বন্ধুর কথা।"

কহিলাম, "কে ? বিজয় ?"

উত্তর হইল, "এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়।"

এখানে উল্লেখ থাকে যে, বিজয় শুধু আমারই নহে, ফণীরও গুণধর বন্ধু, স্কুলের ক্লাশ-থ্রি হইতেই আমাদের বন্ধুত্বের আরম্ভ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ?"

চটিয়া গিয়া উত্তর দিল, "কি হয়েছে ? আজ যে গদার চোটে চ্যাপটা হইনি, সে আমার বরাত। এখানে আর এক দণ্ডও নয়। আজ ফসকেছে বলে যে কালও ফসকাবে, তার কি গ্যারান্টি আছে শুনি ? অভ্যাসে হাতের তাক আরও পাকা হবে না ?"

সম্মুখে দণ্ডায়মান ঘরের চাকরটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই ফণী বলিল, "ও বাবা লালজী, তুম উধার খাড়া হ্যায় কাঁহে ? এধারে আসতে নেহি পার ? ধর না ব্যাটা, খাটটা ও কোণামে নিয়ে যাই।"

বলিয়াই আমার দিকে ফিরিল এবং কহিল, "আর তুইই বা ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে আছিস কোন আক্কেলে ? গদা মারবার বেলা, যত বন্ধু। ধর—"

কহিলাম, "কোথায় যাবি ?"

—"এঘর ছেড়ে যেতে পারলেই ভাল হত। আবার পার্টি অনুযায়ী ঘর ভাগ করে বসেছে, কোন ঘরেই বা নেবে? কারো সঙ্গে তো আর সুবাদ রাখনি যে, অসময়ে জায়গা দেবে। ধর—"

খাটিয়া ধরিয়া কহিলাম, "কোথায় যাবি, তা তো বল্লি না?"

—"চল, ঐ কোণায় যতীন দাশের সীটের পাশে যাই, ওর মুগুর ভাঁজার রোগ নেই। শোন, এখনই একটা চিঠি পাঠিয়ে দে।"

বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "চিঠি? কাকে?"

—"কমাণ্ডাণ্টকে। লিখে দে, ঘরের মধ্যে ডন বৈঠক কি? এটা তো খোট্টার খোঁয়াড় নয়, ভদ্রলোকদের থাকবার জায়গা।"

এমন সময় খোঁট্টার খোঁয়াড় মানে কম্বলের ঘর হইতে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। সারা গায়ে ঘর্মের গঙ্গোত্রীধারা, হাতে একটা টাওয়েল।

কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "গদা ছুড়লি কেন?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিলাম, "ছুড়িনি, ফসকে গেছে।"

শুনিয়াই ফণী খাটিয়া ছাড়িয়া দিয়া খ্যাকাইয়া উঠিল, "ফসকে গেছে! এ কি গরু পেয়েছ যে, বুঝিয়ে দিলেই হোল? অন্যের মাথা তাক করে ফসকায় কেন? হাতের কাছে নিজের মাথাটা পছন্দ হয় না? ফসকে গেছে—"

বলিয়া আমাকে ধমক দিল, "ছেড়ে দিলি কেন? ধর—"

বিজয় কহিল, "এতো আর হামেশা হয় না। আজ accidentally—"

শেষ করিবার সুযোগ না দিয়া ফণী পূর্ববৎ খ্যাকাইয়া উঠিল, "অহো, কত দুঃখ যে, হামেশা হয় না, accidentrlly—, আজ যদি accidentally একটা accident হোত?"

বিজয় উত্তর দিল, "তাতে কি, মরতে তো একদিন হবেই।"

ফণী আনন্দে নাচিয়া উঠিল, "ওহো হো, একেবারে তপোবনের ঋষি-উবাচ, একদিন তো মরতেই হবে! এতই যদি টনটনে জ্ঞান, তবে আর ও হাঙ্গামা কেন? দড়ি দিচ্ছি, ঝুলে পড় না, আপদ যাক্।"

শুনিয়া বিজয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলেও হাসিতে ফাটিয়া পড়িল।

ফণী কহিল, "আবার হাসিস কোন্ আক্কেলে, লজ্জা করে না ?"

বিজয়ের কিন্তু লজ্জার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হাসিতে হাসিতেই স্থানত্যাগ করিল।

ফণীকে কহিলাম, "খাট সত্যি সরাবি ?"

প্রশ্নটায় ঘৃতাহুতি পড়িল, সেকেণ্ড কয়েক তেরছা দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়া লুইয়া তারপর চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, "কেন, ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে ? যা কাজে যা। এই লালজী ধর।"

উপেনবাবুও খাটের একধার ধরিয়া বলিলেন—"না, সরাই ভালো। কে জানে, আবার যদি ছোটে।"

ফণী কহিল, "এর মধ্যে যদি নেই, যে পর্যন্ত আমার মাথাটা ছাতু না হয়, সে পর্যন্ত রোজ ফসকাবে, তুই দেখে নিস। প্রাণ নিয়ে জেল থেকে বেরুতে পারলে হয়।

ফণীর খাটটা যথাস্থানে সরাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই বিজয়ের মুখোমুখি পড়িয়া গেলাম।

জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মাঠের গেট কটায় খুলবে জানিস ?"

—"সাড়ে ছয়টায়।"

—"যাই, মাঠে বেড়িয়ে আসি।" বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল।

কহিলাম, "এই, কমলা পেলি কোথায় ?"

টাওয়েলের মধ্যে কয়েকটি কমলা জড়ানো, তাহার লাল রংটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

উত্তর দিল, "তোকে তিনটে করে হাসপাতাল থেকে দিচ্ছে দুদিন যাবৎ।"

—"কই, আমি তো জানি না।"

—"ডাক্তারকে বলে আদায় করেছি। দুদিনের ছয়টা জমেছিল, মাত্র পাঁচটা নিলাম।"

কহিলাম, "মাত্র পাঁচটা নিলি কেন, মাত্র ছ'টা নেনা। বাকী কয়াটতেই আমার চলবে।"

শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। বুঝিলাম রসজ্ঞান আছে। ফণী যে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টের পাই নাই। বিজয় তখন দরজায় পা দিয়াছে, পিছন হইতে ফণীর গলা শোনা গেল—"চোর। তোকে জেলে দেওয়া উচিত।"

বিজয় দরজা হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "খাবি ?"

ফণী কিন্তু সত্যই জবাব দিল, "খাবি ? ক্যান, দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পার না ?"

বিজয় টাওয়েল হইতে একটা কমলা লইয়া ফণীকে ছুড়িয়া দিল এবং দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ন্যায় কমলাটাকে ফণী ক্যাচে লুফিয়া লইল। উপেনবাবুও হাত বাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু পিছনে ছিলেন বলিয়া হাতটা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছায় নাই !

ফণী কহিল, "ছটার মধ্যে মাত্র পাঁচটা তো নিয়েছিস, উপেনকে একটা দে।"

—"ওটাই দুজনে ভাগ করে খা," নির্দেশ দিয়া বিজয় বারান্দা ধরিয়া অদৃশ্য হইল।

সেদিনের মুষলপর্বটা ভালোয় ভালোয়ই শেষ হইয়াছিল, অর্থাৎ ফলপর্বে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সর্বত্র শেষটা এবম্প্রকার হয় না। অনেক শুভ-আরম্ভই অপঘাতে শেষ হয়, অনেক জাতকই সুতিকাগারে প্রথম ও শেষ নিঃশ্বাস দুইই টানিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপে একটি শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা হরেক রকমের লোক ছিলাম এবং হরেক রকম প্রতিভা লইয়াই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলাম। অতএব আমাদের মধ্যে সাহিত্যিক থাকিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র বা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বরং সাহিত্যিকের সংখ্যাটা যেন একটু বেশীই ছিল। আর, বাঙ্গালী মাত্রেই কবি, একথা তো প্রবাদবাক্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাহিরে থাকিতে কর্মের ঘানিতে ঘুরিয়া ঘর্ম ব্যয় করিতেই সময়টা খরচ হইয়া যাইত, জেলে আসিয়া প্রতিভা প্রয়োগের প্রচুর সময় এবার আমরা পাইয়া গেলাম। প্রকাশ্যে যাঁহারা সাহিত্যচর্চা করিতেন, খোঁজ লইলে দেখা যাইত যে, তাঁহাদের চেয়ে তুলনায় গুপ্ত-সাধকদের সংখ্যাটাই সমধিক ছিল।

যাঁহারা সাহিত্যিক বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না, তাঁহারা প্রায়ই একত্রিত হইয়া আড্ডা জমাইতেন। শাস্ত্রেই আছে যে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, অর্থাৎ গেঁজেল গেঁজেলকে চিনিয়া লয়। তারপর যাহা হয়, তার নাম গাঁজাখোরের আড্ডা।

তেমনি আড্ডা একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের সীটে বসিয়াছিল। পঞ্চাননবাবু ও আমার তুইজনের তুইখাট যুক্ত অবস্থাতেই থাকিত, কারণ তাসের নিয়মিত আড্ডার এটী ছিল স্থায়ী আসর।

সেদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন অতীন রায়, সুরপতি চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, নলিনী বসু, প্রমথ ভৌমিক এবং আমরা তিন বন্ধু—কালীপদ, পঞ্চাদা ও আমি। সিগারেট ও চায়ের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মস্তকগুলির মধ্যে প্রেরণা পাক দিয়া উঠিল এবং হৃদয়ে উৎসাহ গা মোড়ামুড়ি দিয়া জাগ্রত হইল।

এক সময়ে কে একজন প্রস্তাব করিলেন যে, এভাবে সময় নষ্ট করা আমাদের অকর্তব্য।

আমরা মাথা নাড়িয়া অভিমতটা সমর্থন করিলাম। প্রস্তাবক অতঃপর বলিলেন যে, আমাদের আটজনে মিলিয়া একটি উপন্যাস রচনা করা কর্তব্য।

নলিনী বসু সঙ্গে সঙ্গে অ-জাত উপন্যাসের নামকরণ করিলেন, "নামটা হবে অষ্টবজ্র।"

ভাবী উপন্যাসের নামও সমস্বরে সমর্থিত হইয়া গেল। রাম না হইতে রামায়ণ হইয়াছিল, কাজেই আমরা নূতন বা অদ্ভুত কিছু করিলাম না। মাত্র আদি কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম।

সমস্যা দেখা দিল উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া। অবশেষে আমি প্রস্তাব করিলাম যে, একটি জারজ ছেলেকে সংসারে ও সমাজে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, দেখি অষ্টবজ্রের অষ্টাঘাতে তিনি কোন অষ্টাবক্র মূর্তি পরিগ্রহণ করেন।

সুরপতি চক্রবর্তী উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিলেন,—"বহুৎ আচ্ছা। আমিই ব্যাটাকে প্রথম আসরে আনয়ন করিব।"

সুরপতিবাবুর সাহসে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এখানে একটি খবর দিয়া রাখি। ডেটিনিউদের মধ্যে যে কয়েকজন লেখকের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত, তন্মধ্যে সুরপতিবাবুর কলমটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হইয়াছে।

সুরপতিবাবু আরম্ভ করিবার ভার নিলেন। তাঁহার পর কে কে লিখিবেন, তাহাও সাব্যস্ত হইয়া গেল। এখন শুধু এইটুকু স্মরণে আছে যে, সপ্ত মহারথীর হাতের মার খাইয়া নায়ক যখন মুমূর্ষু অবস্থায় পরিত্যক্ত হইবেন, তখন আমি আসিয়া অষ্টম আঘাতে অর্থাৎ মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়া তাহাকে খতম করিব। নিজের উপর এই বিশ্বাসটুকু ছিল যে, মড়াকে চেষ্টা করিলে নিশ্চয় মারিতে পারিব।

আসর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতেই টের পাইলাম যে, খবরটা ইতিমধ্যেই ক্যাম্পে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বীরেনদা বারান্দাতেই ছিলেন, লণ্ঠন জ্বালিয়া লোহার খাটিয়াতে দাবার আসর বসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া বীরেনদা বলিলেন, "এই যে অষ্টবজ্র।"

আমরা খুব গোপনে আলাপ করি নাই এবং আমাদের বক্তব্য বেশ উঁচু গলাতেই আমরা আসরে পেশ করিয়াছিলাম। গোপন মন্ত্রণাটাও

দেয়ালের কানে যায়, আর আমাদের প্রকাশ্য সঙ্কল্প সর্বত্র ঘোষিত হইবে, ইহাকে অধিক কিছু বলিয়া আমরা মনে করিলাম না। অর্থাৎ, খবরটা সকলে জানিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিতই হইলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আসর বসিল, সুরপতি চক্রবর্তী উপন্যাসের প্রথম কিস্তি আসরে পেশ করিলেন, মানে পড়িয়া শুনাইলেন। উপন্যাস যাঁহার নিজেকে শেষ করিতে হইবে না, শুধু আরম্ভ করিবার দায়িত্বটুকই যাঁহার উপর ন্যস্ত, তাঁহার সুবিধা নিশ্চয় অধিক। সুরপতিবাবু নিশ্চিন্ত মনে বেপরোয়াভাবেই উপন্যাসের আদি পর্ব রচনা করিলেন।

দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব কাহার উপর ছিল, ঠিক মনে নাই। এইটুকু মনে আছে যে, সন্তোষবাবু, পঞ্চাননবাবু, প্রমথবাবু এবং অতীনবাবুও নিজ নিজ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন এবং আসরে তাহা পঠিত হইয়াছিল।

অষ্টপর্বের পঞ্চপর্ব শেষ হইল, কিন্তু একটা “কিন্তু” আসিয়া দেখা দিল। আমরা আবিষ্কার করিলাম যে, রচনা অগ্রসর হইয়াছে অর্ধেকের অধিক, কিন্তু আখ্যায়িকা বা ঘটনা মোটেই অগ্রসর হয় নাই এবং নায়ক তাহার ভ্রূণাবস্থার মধ্যেই একটি একাকার মূর্তিহীনতায় অপেক্ষা করিতেছে।

ডিমে পক্ষিণীমাতা তা দেয়, ফলে খোলার তরল পদার্থটুকু শনৈঃ শনৈঃ বিহগমূর্তি গ্রহণ করিতে থাকে এবং একদিন ঠোঁট, পালক, ঠ্যাং ইত্যাদি লইয়া একটি শাবক খোলা ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইয়া আসে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। আমাদের পঞ্চতপার উগ্র মানসতাপে উপন্যাসের খোলার মধ্যেকার বাষ্পীয় পদার্থটুকু বাষ্পীয়ই রহিয়া গেল, একটি সর্বাঙ্গ মূর্তি তো দূরের কথা, একটা মাংসস্তূপ বা কবন্ধ মূর্তিতে পর্যন্ত তাহা দানা বাঁধিল না।

আমরা অষ্টবজ্র ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। অষ্টবজ্র সম্মেলনের এই পরিণতি দর্শনে আমাদের উৎসাহ একেবারে দমিয়া গেল। উপন্যাসের নায়ক বা কাহিনী সম্বন্ধে আমরা আশা ত্যাগ করিলাম।

'অষ্টবজ্র' আমাদের হাতযশে 'অষ্টরম্ভা'তেই অবশেষে শেষ হইল। আমরা 'হরিবোল' দিয়া অসমাপ্ত উপন্যাসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছিলাম।

আমাদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা আপনারা নিশ্চয় করিয়া লইয়াছেন। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কি ধারণা, দুইটি মন্তব্য হইতে বাকীটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

বছরে একবার করিয়া আমাদের আই-বি ইণ্টারভিউ হইত। আমাদের চরিত্রের কতটা উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, এই ইণ্টারভিউ হইতেই তার বাৎসরিক রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হইত।

এই রকম এক ইণ্টারভিউ সারিয়া জনৈক ডেটিনিউ ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলেন। দশজনে তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বারতা রে দূত!"

দূত বার্তা পেশ করিলেন, "জিগ্যেস করলে কেমন আছেন?"

—"আপনি কি বললেন?"

—"বললাম, কেমন আছি খবরটা জানবার জন্য এত খরচ ও এত কষ্ট করে এখানে আসবার কোন দরকার ছিল না, মেডিকেল রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেই হোত।"

শ্রোতাদের একজন বলিলেন, "ভালো বলেছেন, দশের মধ্যে আপনাকে দশ দিলাম। তারপর?"

দূত বলিলেন, "তারপর জিগ্যেস করলে, অনুতাপ হয়েছে কিনা, বলুন? হয়ে থাকলে খালাসের চেষ্টা দেখতে পারি।"

শুনিয়া এক শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন, "অনুতাপ! ব্যাটা বলে কি।"

রোগা, ফর্সা, কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী জনৈক ডেটিনিউ একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি যে-মন্তব্য করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই চমকিত, বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। মন্তব্যটি ডেটিনিউদের সম্বন্ধেই, তবে

একটু অশ্লীল। পদি পিসীকে যে-পদ্ধতিতে পদ্মিনী করা হয়, মন্তব্যটিকেও সেই পদ্ধতিতে যথাসাধ্য মার্জিত করিয়া লইতেছি।

একপাশ হইতে বেশ একটু স্পষ্ট গলাতেই উক্ত ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "অনুতাপ? ডেটিনিউ কি চীজ ব্যাটারা এখনো বোঝে নাই দেখছি। মাথায় কল্কি চাপিয়ে ড্যাস্ দিয়ে ধোঁয়া বের করলে তবে বুঝবে।"—এখানে ড্যাস্ মানে দেহের নবদ্বারের সর্বনিম্ন দ্বারটি।

মানুষের শরারটাকে হুঁকা বানাইয়া তামাকু সেবন করিবার মত প্রতিভা যাঁহাদের থাকে তাঁহারাই ডেটিনিউ, ইহাই হইল আমাদের আত্মপরিচয়।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি যাঁহার, তিনি আমাদের অশ্বিনীদা (গাঙ্গুলী)। তখন তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে বড়হাজতে ছিলেন এবং আরও অনেকেই ছিলেন।

সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, আটটাও প্রায় বাজে, অথচ ভোরের টিফিনের টিনের ট্রে বা হাফ-বাক্স মাথায় লইয়া তখনও কয়েদীরা আসিতেছে না। বাবুরা অস্থির হইয়া উঠিলেন। আটটা বাজিয়া গেল, তবু বড়হাজতের গেটে বাঞ্ছিত কড়া নাড়ার শব্দ শ্রুত হইল না। নয়টাও বাজিয়া শেষে দশটার কোঠায় ঘড়ির কাঁটা পৌছিয়া গেল, টিফিনের দেখা নাই। বাবুরা রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অশ্বিনীদা তাঁহার খাটিয়াতে বসিয়া পত্রিকা পড়িতেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিফিন আসে নি বুঝি?"

একটি ছেলে বিরসবদনে উত্তর দিল, "না।"

অশ্বিনীদা সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "ভেবেছে, জব্দ করবে। আরে ব্যাটারা, আমরা যে কি চীজ, এখনও বুঝলিনে? উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে পরে মুষ্টিভিক্ষার চাল যোগাড়ে বার হই, আমরা সেই চীজ। আমাদের জব্দ করবি?"

দুইটি মন্তব্যে আমাদের যে আত্মপরিচয় স্বমুখে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা এক কথায় এই যে, আমরা অদ্ভুত। অদ্ভুতের অদৃষ্টে অদ্ভুতই আসিয়া জোটে।

শাস্ত্রেই আছে, যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে, আমাদের মত গ্রাম্য লোকের ভাষায়—যেমন দেবা, তেমন দেবী।

বরাত জোরে আমাদেরই যোগ্য দুই ডাক্তার জুটিয়াছিল। বরাতের জোর আরও একটু বেশি ছিল বলিয়া দিন সাতেকের বেশি আমাদের খবরদারী করিবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই, স্বস্থানে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিজলী ক্যাম্পে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে আমরা যখন অনশন আরম্ভ করি, তখন ক্যাম্পের বড় ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না, বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা গিয়াছিলেন। এদিকেও বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল, শ'দুয়েক বন্দী অনশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জলপাইগুড়িতে কমাণ্ডাণ্টের জরুরী তার গেল, প্রত্যুত্তরে দুইজন সাব-এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন সশরীরে ক্যাম্পে আবির্ভূত হইলেন।

একজনের নাম হর্ষ, অপরের নাম হেরম্ব, আমরা বলিতাম হিড়িম্বা ডাক্তার। হর্ষের দেহের দৈর্ঘ্য নাই, প্রায় সবটুকুই প্রস্থ। একটা গোলাকার মাংপিণ্ডের, অভাবে বস্তুর, নিম্নে দুইটা ঠ্যাং ও উর্দ্ধে দুইটা হাত ঝুলাইয়া দিলেই হর্ষের মূর্তি প্রায় পনর-আনা পাওয়া যায়। এর পর যদি উপরের দিকে ছোট্ট গোলাকার একটি মুণ্ড বসাইয়া দেন, তবে তো হর্ষের প্রতিমূর্তি পুর্ণাঙ্গই পাইয়া গেলেন। হর্ষ ডাক্তার চলেন আস্তে, বলেনও আস্তে, প্রায় মৌনীবাবা। অনেকের ধারণা যে, ভয়েই হর্ষ ডাক্তারের বাক্‌সংযম দেখা দিয়াছিল।

হিড়িম্বা ডাক্তার সব দিক দিয়া হর্ষের বিপরীত। তাঁহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ছিল। আকৃতিতেই শুধু নহে, প্রকৃতিতেও তিনি হিড়িম্বা ছিলেন। তিনি আসিবার আগে তাঁহার জুতার বিরাট আওয়াজ জানান দেয় যে, তিনি আসিতেছেন। চলেন যেমন, বলেনও তেমনি। হিড়িম্বা ডাক্তার ব্যারাকের এ-কোনায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিলে ও-কোণায় তার ঢেউ লাগে, গলার তারটি জন্মাবধিই এমনি মোটা সুরে বাঁধা।

প্রথম দিনেই হিড়িম্বার ডাক্তারী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গেল। অশ্বিনী মাস্টার বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, একবার এদিকে আসবেন।"

—"আসছি।"

উত্তরটা এমন সুরে প্রদত্ত হইল যে, শাসানী মনে হইতে পারিত। যেন "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি" ভাবটি ঐ সংক্ষিপ্ত 'আসছি' শব্দটির মধ্যে তিনি ভরিয়া দিলেন।

হিড়িম্বা ডাক্তার অশ্বিনী মাস্টারের খাটের পাশে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে ?"

—"পেটে ভয়ানক ব্যথা।"

—"ব্যথা ? ব্যথা হল কেন ?"

রোগী উত্তর দিলেন, "তা আমি কি করে বলব। আমি তো ডাক্তার নই।"

ডাক্তার উত্তর দিলেন, "আপনার পেটে ব্যথা, আর আপনি বলতে পারেন না কেন ব্যথা হল ?"

অশ্বিনীবাবু এবার ভালো করিয়া হিড়িম্বা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। পরে বলিলেন, "বাজে কথা রাখুন, যদি ওষুধ কিছু দিতে পারেন দিন, নইলে উঠুন।"

হিড়িম্বা ডাক্তার সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি কি ওষুধ দেব। আপনি যদি কোন ওষুধ সাজেস্ট করতে পারেন, বলুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

—"আপনি যান, আমার কোন ওষুধের দরকার নাই।"

এবার হিড়িম্বা ডাক্তার বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিলেন, "না খেয়ে আছেন, তাই পেটে ব্যথা হয়েছে। খাওয়া আরম্ভ করলেই সেরে যাবে।"

হিড়িম্বা যে অদ্ভুত, এটুকু এই প্রথম পরিচয়েই জানা গেল, কিন্তু তাঁহার আসল প্রকৃতিটি যে কি, জানিবার জন্য আরও একটু অপেক্ষা করিতে

পরদিন উপেন দাস হর্ষকে ডাকিলেন, "শুনুন তো।"

শুনিবার জন্য হর্ষ ডাক্তার নিঃশব্দে আগাইয়া আসিলেন

উপেনবাবু বলিলেন, "বসুন।"

হর্ষ ডাক্তার নীরবে নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন এবং বসিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন।

উপেন দাস কহিলেন, "হেরম্ববাবুকে আপনি কদ্দিন চেনেন?"

এবার হর্ষ মুখ খুলিলেন, "অনেক দিন, চোদ্দ-পনর বছর।" কিন্তু কেন এই প্রশ্ন, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করিলেন না।

উপেনবাবু ঘনিষ্ঠ সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, হেরম্ববাবুকে রোগের কথা বললে তা তিনি এড়িয়ে যান কেন?"

হর্ষ ডাক্তার যেন আদালতে শপথ গ্রহণ করিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছেন, সেই ভাবে জবাব দিলেন, "কি করবে। ডাক্তারী যে কিছুই জানে না।"

—"তবে চাকুরী করছে কেমন করে?"

—"ছাড়িয়ে দেয় না বলেই করতে পারছে।"

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, লোকে উপরে রিপোর্ট করে না?"

হর্ষ উত্তর দিলেন, "লোকের সঙ্গে খুব খাতির করতে পারে।"

উপেনবাবুর যেটুকু জানিবার জানিয়া লইলেন। পরের দিন হিড়িম্বা ঘরে ঢুকিতেই উপেনবাবু আমন্ত্রণ জানাইলেন, "ডাক্তারবাবু এদিকে আসুন।"

—"একটা মানুষ আমি কত দিক সামলাই" বলিতে বলিতে হিড়িম্বা ডাক্তার উপেনবাবুর সীটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আরও কয়েকজন ডেটিনিউ উপস্থিত ছিলেন।

হিড়িম্বা উপবিষ্ট হইলেই উপেনবাবু বলিলেন, "বুকে, পিঠে, পেটে, সারা শরীরে বড্ড ব্যথা, কি করি বলুন তো?"

হিড়িম্বা অসন্তুষ্ট সুরে জবাব দিলেন, "আচ্ছা, আমাকে দেখলেই কি আপনাদে অসুখের কথা মনে পড়ে।"

—"আপনি ডাক্তার, আপনাকে দেখলে রোগের কথা মনে পড়েবে না তবে কিসের কথা মনে পড়বে?"

হিড়িম্বা প্রশ্নের উত্তরের ধার দিয়াও গেলেন না, প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "ডাক্তারেরা রোগ সারাতে পারে, আপনাদের ধারণা ?"

সৌরভ ঘোষ জবাব দিলেন, "আমাদের তো তাই ধারণা।"

হিড়িম্বা প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "এ আপনাদের মস্ত ভুল ধারণা। রোগ সারতে হলে আপনিই সারে, কোন ডাক্তারের সাধ্য নেই যে রোগ সারায়, আমার কাছে শুনে রাখুন।"

উপেনবাবু বলিলেন, "ওসব কথা থাক। আমাকে একটা ওষুধ দিন। অসহ্য ব্যথা।"

হিড়িম্বা বলিলেন, "আর একটু সহ্য করুন, বিকেলে আপনাদের ডাক্তার ফিরবেন। আমাকে আর ভোগাবেন না।"

সৌরভবাবু বলিলেন, "ডাক্তার আসবেন কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর এদিকে সহ্য করতে গিয়ে লোকটা মারা যাক, কি বলেন ?"

হিড়িম্বা কাচু মাচু হইয়া কহিল, "আমাকে দেখলেই আপনাদের রোগ চাড়া দিয়ে উঠে। কেন আর আমাকে ভোগান। জানেনই তো ওষুধে কিছু হয় না। দয়া করে বিকেল পর্যন্ত সহ্য করুন।"

সৌরভ ঘোষ বলিলেন, "আপনি কি গরুর ডাক্তার ?"

হিড়িম্বা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইলেন, "তা বলতে পারেন।" কথাটা যেন দুধারী তলোয়ার, শ্রোতাদের এমনই সন্দেহ হইল।

হিড়িম্বা উপেন দাসকে বলিলেন, "খুব যদি ব্যথা হয়ে থাকে, তবে আমি তর্ষবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাঁর ধারণা, তিনি ডাক্তারীটা জানেন, অন্যেরাও তাই মনে করে। পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটা ওষুধ চেয়ে নিন।"

উপেন দাস কহিলেন, "সত্যই আপনি মনে করেন, সারবার হলে রোগ আপনিই সারে, ডাক্তারে কিছু করতে পারে না ?"

"সত্যি তাই মনে করি। এইভাবেই তো এতটা বছর চিকিৎসা করে এসেছি, আপনাদের কাছে মিথ্যে বলে কি লাভ হবে ?"

উপেনবাবু কহিলেন, "বেশ আপনার উপদেশই শিরোধার্য, সারতে হলে আপনিই সারবে। জীবনে আর ডাক্তার ডাকে কোন শালায়। নিন, সিগারেট খান।"

ইহার পর হিড়িম্বা ঘরে ঢুকিলেই প্রত্যেক সীট হইতে আহ্বান আসিত, ডাক্তারবাবু, এদিকে আসুন, এদিকে" এবং হিড়িম্বাও উত্তর দিতেন —"আমি একটা মানুষ, কতদিক সামলাই।" কথাটা ঠিক, সকলেই চাহিত হিড়িম্বাকে লইয়া আড্ডা জমায়, তাঁর এমনই চাহিদা হইয়াছিল। কেহই তাঁহাকে রোগের বা ঔষধের কথা বলিত না। সাতদিন থাকিয়া হিড়িম্বা ও হর্ষ বিদায় নিলেন।

যাইবার সময় হিড়িম্বা বলিয়া ফেলিলেন, "বাঁচলাম, কি বিপদেই পড়েছিলাম। অবশ্য, আপনারাও আমাকে বুঝে নিয়েছিলেন। মনে রাখবেন।"

তাঁহার শেষ অনুরোধটা রক্ষা করিয়াছি, তাঁহাকে আমরা মনে রাখিয়াছি।

এই সুযোগে আমাদের বড় ডাক্তারের কথা একটু বলা উচিত বোধ হইতেছে।

মৈমনসিংহের সতীশবাবু হন্তদন্ত হইয়া একদিন আমাদের ব্যারাকে ঢুকিলেন, কহিলেন, "ডাক্তারবাবু গেলেন কোথায় ?"

ট্যানাবাবু জবাব দিলেন, "পাঁচ নম্বর ব্যারাকের দিকে গেছেন দেখলাম। কেন, ব্যাপার কি ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "ব্যাপার সীরিয়াস। পরে বলব।" বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশবাবুর পরিচয় দরকার। ক্যাম্পে তিনি সতীশ-ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। বেঁটেখাটো চট্‌পটে মানুষটি। কোন অবস্থাতেই অপ্রভিত হন না, যেন জাপানী পুতুল, কাৎ করিয়া দিলেও উঠিয়া বসেন। সতীশঠাকুর নিরলস ব্যক্তি, একটা কিছু লইয়া সর্বদাই ব্যস্ত, চুপ করিয়া থাকিলেও মাথার ভিতর প্ল্যানের প্যাঁচ কষেন। ক্যাম্পের সর্বত্রই তিনি আছেন এবং হৈ হৈ লইয়া আছেন। একটু নমুনা দিতেছি, চাখিয়া দেখিবার জন্য।

ব্যারাকের সম্মুখ দিয়া সতীশঠাকুরকে যাইতে দেখিয়া বিজয় দত্ত আহ্বান করিল, "আসুন, এক বাজী দাবা হোক।"

মল্লের আহ্বানে মল্লোচিত সাড়া সতীশঠাকুর দিলেন, বলিলেন—"আসুন, আপনার সঙ্গে দাবা খেলব বাঁ হাত দিয়েই," বলিয়াই বসিয়া গেলেন।

জনৈক বয়স্ক ডেটিনিউকে সতীশঠাকুর ডাকিতেন খুড়োমশায়। খুড়োমশায়ের শীতকালে বিশেষ একটা অভ্যাস ছিল। পাহাড়ের শীতে রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব করা কষ্টকর বোধ হওয়ায় খুড়োমশায় বিছানায় থাকিয়াই বৃহৎ একটি বোতলে উক্ত কার্য সম্পাদন করিতেন, পরে বোতলটা ছিপি আঁটিয়া হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখিয়া দিতেন, ভোরে জমাদার আসিয়া তাহা সরাইয়া নিত এবং বোতলটি ধৌত করিয়া পুনরায় স্থানমত রাখিয়া যাইত।

একদিন ভোরেই সতীশঠাকুর আমাদের ব্যারাকে আসিয়া দেখা দিলেন। সৌরভবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ভোরে যে? ব্যাপার কি?"

সতীশঠাকুর উত্তর দিলেন, "গুরুতর ব্যাপার, খুড়োমশায়ের 'স্লিপ অব টং।"

'স্লিপ অব টং' বুঝিতে না পারিয়া আমরা চাহিয়া রহিলাম। অর্থটা ব্যাখ্যা করিতেই সীটে সীটে হাসি ফাটিয়া পড়িল।

খুড়োমশায় গতরাত্রে মূত্রবেগে উঠিয়া বসেন, হাত বাড়াইয়া খাটের তলা হইতে বোতলটা তুলিয়া লন। কিন্তু ঘুমের চোখে বোতলের মুখটা ঠিক ঠাহর করিতে পারেন নাই, ফলে এক পশলা মূত্র শয্যাতেই পতিত হয়। ইহাই সতীশঠাকুরের ভাষায় খুড়ো মশায়ের 'স্লিপ অব টং।'

সতীশঠাকুর ডাক্তারকে ছয় নম্বর ব্যারাকে গিয়া ধরিলেন। পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু!"

শান্ত হাসিতে ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন, "বলুন।"

—"ক'দিন যাবত আমার বুকে একটা পেন বোধ করছি।"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুকে ব্যথা? কখন হয়?"

সতীশবাবু বলিলেন, "ঘুম থেকে উঠলেই ভোরবেলা।"

—"দেখি।"

এক টানে গেঞ্জিটা খুলিয়া সতীশঠাকুর পাশের সীটে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরে বলিলেন, "ব্যথাটা এক জায়গাতেই থাকে, না মুভ করে?"

সতীশঠাকুর জানাইলেন, "না, নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"

—"উপর থেকে নীচে নামে, না নীচু থেকে উপরে উঠে?"

সতীশবাবু বিব্রত বোধ করিলেন, বলিলেন, "তাতো ঠিক বলতে পারবো না।"

—"সেটা ভালো করে ওয়াচ করুন। কোথায় প্রথম ব্যথাটা উঠে, কোন দিকে যায়, ভালো করে দেখে রাখবেন।"

"আচ্ছা।"

পরদিন ডাক্তারবাবু যথারীতি ব্যারাকে ঘুরিয়া সতীশঠাকুরদের ঘরে আসিলেন। দেখিলেন যে, সতীশঠাকুর বিছানায় পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন? ব্যথাটা ওয়াচ করেছিলেন তো?"

"করেছি", বলিয়া সতীশবাবু গেঞ্জিটা খুলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন, "দেখুন।"

ডাক্তারবাবু ব্যাপার দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কহিলেন, "এ কি?"

সতীশঠাকুর কহিলেন, "এই লাল দাগগুলি উপর হইতে নীচে নামার, আর নীল দাগগুলি নাচু হইতে উপরে উঠার।"

সতীশঠাকুরের সারা বুকটা নীল ও লাল লাইনে চিত্রিত হইয়া একটি চিত্রব্যাঘ্রের রূপ লইয়াছে। ডাক্তারের 'নির্দেশমত বুকের ব্যথাটার গতিপথ অনুসরণ করিবার জন্য সতীশঠাকুর একটা লাল-নীল পেনসিলের সাহায্য লইয়াছেন, সেই চলমান ব্যথাটার উর্দ্ধ গতি নীল দাগ দিয়া অনুসৃত হইয়াছে আর নিম্নাভিমুখী গতিটা লাল দাগে চিহ্নিত হইয়াছে। ফলে সারা বুকটা লাল-নীল পেনসিলের রেখায় বিচিত্র একটি গোলকধাঁধার পট চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডাক্তারবাবুর শান্ত মুখে একটি শান্ত হাসি দেখা দিল। ডেটিনিউ বন্ধুরা সশব্দ হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন।

সতীশবাবু ধমক দিলেন, "রোগীর সীটে অত হল্লা করবেন না, ওদিকে গিয়ে যত খুশী দাঁত বের করে হাসুন।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনার কেসটা একেবারে নূতন; আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় এ রকম রোগ দেখিনি।"

সতীশবাবু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু বাঁচব তো?"

—"ডাক্তারদের আশা ছাড়তে নেই। দেখুন আপনাকে এখন আমি ওষুধ দিতে চাইনে।"

সতীশঠাকুর কহিলেন, "কেন? আপনি কি এ রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন না?"

—"পারব। আপাততঃ আপনাকে মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে রোজ একটা মুরগী, ৪টা কলা, ৪টা আপেল, ৪টা কমলা আর এক ছটাক মাখন দিচ্ছি। ক'দিন খেয়ে দেখুন। যদি উপকার না হয়, তখন ব্যবস্থা দেখা যাবে। কি বলেন?"

—"আপনি যখন বলছেন, তখন আপনার কথা শুনতে হবে বৈকি!"

এবার ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, "আপনাদের চিকিৎসা করে সুখ আছে। এবার আপনি সেরে উঠবেন, কি বলেন ?"

সতীশঠাকুর বলিলেন, "সে আপনার হাতযশ।"

—"শুধু হাতযশ ? কেন, ব্যবস্থাটা মনঃপুত হয়নি ?"

—"ডাক্তারের ব্যবস্থার উপর কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। আপনার কথামত খেয়ে দেখি, কি ফল পাই।"

ডাক্তারবাবু সতীশঠাকুরের জন্য উক্তপ্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা লিখিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশবাবু বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু লোকটা যতই খারাপ হোন, ডাক্তারীটা জানেন কিন্তু।"

বন্ধুরা সমস্বরে সায় দিয়া বলিলেন, "তাতে আর সন্দেহ আছে ?"

পরদিন ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতীশবাবু, ব্যথাটা এখন কেমন বোধ করছেন ? একটু কমেছে বলে মনে হয় না ?"

সতীশবাবু বিনীত সুরে জবাব দিলেন, "একটু যেন কমেছে বলেই মনে হয়। ওষুধটা যেন ফস্ করে বন্ধ না করেন। ফল যখন একটু পাচ্ছি—"

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "পাগল হয়েছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই ব্যবস্থা একমাস বলবৎ থাকবে।"

ডাক্তারবাবু বাহির হইয়া গেলে সতীশঠাকুর বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া আজ বলিলেন, "ডাক্তার ডাক্তারী জানবে, এ নূতন কিছু নয়। কিন্তু লোকটি বড়ই বিবেচক।"

বন্ধুরা আজও সমস্বরে সায় দিলেন, "তা আর বলতে।"

দুপুর বেলা, খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ হইয়াছে, বাবুদের মধ্যাহ্নের ব্যসন-পর্ব চলিতেছিল। অক্ষ-ক্রীড়াকে ব্যসন বলিলে তাস ও দাবাকে তাহার অন্তর্গত করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। বাবুদের অনেকেই এই তিনটি

ব্যসনে লিপ্ত ছিলেন। আর দিবানিদ্রাকে পুরাতনেরা কামজ-ব্যসনের মধ্যে প্রথম স্থানই দান করিয়াছেন। বাবুদের অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যাটা এই ব্যসনের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। শুধু কতিপয় বাবু ছাত্র না হইয়াও অধ্যয়নরূপ তপস্যা করিতেছিলেন। বিশ্রাম ও ব্যসন লইয়া তখন বকসা ক্যাম্পে মধ্যাহ্ন তাহার প্রহর যাপন করিতেছিল।

এমন সময়ে খবর আসিল যে, সেনগুপ্ত (দেশপ্রিয়) বক্‌সা আসিয়াছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা ক্যাম্পে খবরটি ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা ঘুমাইয়াছিলেন, তাঁহারাও জাগিয়া বসিলেন। সকলের মনেই এক প্রশ্ন,—সেনগুপ্ত কেন আসিয়াছেন? এবং কি খবর লইয়া আসিয়াছেন?

আমাদের মনের গোপনে একটা আশাও বাসা বাঁধিল যে, নিশ্চয় একটা শুভ খবর লইয়া আসিযাছেন। কিন্তু সে-আশাটাকে বিশেষ কোন মূর্তিতে স্পষ্ট করিতে আমরা বিরত রহিলাম। সারা ক্যাম্পটা শুধু একটী প্রশ্নের বড়শী-গাথা হইয়া প্রতীক্ষায় ঝুলিতে লাগিল যে, সেনগুপ্ত কেন আসিয়াছেন?

সবুর করিলে মেওয়া ফলে, ধৈর্য ধরিলেও সব কিছু জানা, হয়তো পাওয়াও যায়। আমরাও এক সময়ে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া গেলাম।

সেনগুপ্ত বক্‌সা আসিয়াছেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এবং গান্ধীজীর নির্দেশেই তিনি আসিয়াছেন। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার পূর্বে গান্ধীজী সেনগুপ্তকে তাঁহার অনুগমন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার পূর্বে সেনগুপ্ত যেন বাঙলার বিপ্লবীদের অভিমত ও মনোভাব জানিয়া যান, এই স্পষ্ট নির্দেশই গান্ধীজী দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের দাঙ্গা ও হিজলী বন্দী-শিবিরে গুলিবর্ষণের ব্যাপার সংঘটিত হয়, ফলে সেনগুপ্তের বিলাত গমন পিছাইয়া যায়। অধুনা সেই অবসর তিনি পাইয়াছেন।

আমরা আরও জানিলাম যে, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে কোন সরকারী কর্মচারী বা বাহিরের কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। এমন কি, আমরা যদি গান্ধীজীকে দিবার জন্য কোন গোপন পত্র দেই, তাহা

সরকার তো দূরের কথা সেনগুপ্তও খুলিয়া দেখিবেন না। গান্ধীজীর অনুরোধক্রমেই গভর্নমেণ্ট আমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তের এইভাবে সাক্ষাতে সম্মত হইয়াছেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাঙলার বিপ্লবীদের মতামত পূর্বাহ্ণে না জানিয়া ইংরেজের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করা যে চলিতে পারে না, ইহাতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন সত্যই বাঙলার বিল্পবীদের এমন ক্ষমতা ছিল যে, ইংরেজের সঙ্গে আপোষের সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পণ্ড করিয়া দিতে পারিতেন। বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমত এই যে, গোলটেবিল বৈঠকের পর ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট বলিয়া ইংরেজের নিকট যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মূলে নাকি ছিল বাঙলার বিপ্লবীদেরই বোমা আর পিস্তল।

সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বলিতে আমরা নহি, বাঙলার বিপ্লবীদের নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং বক্সা ক্যাম্পে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা দেখা দিল।

সন্ধ্যার দিকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। ক্যাম্পের চৌহদ্দীর বাহিরে কমাণ্ডাণ্টের বাঙলোর বিপরীত দিকে একটা বাড়িতে সিপাহীদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করিত, সেই স্কুলঘরেই সাক্ষাতের স্থান নির্বাচিত হইল।

যতদূর মনে পড়ে, অনুশীলন-পার্টির পক্ষ হইতে ত্রৈলোক্য মহারাজ, রবিবাবু ও প্রতুলবাবু গিয়াছিলেন এবং যুগান্তর পার্টির পক্ষ হইতে গিয়াছিলেন পূর্ণদাস, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, ভূপেন দত্ত ও অরুণ গুহ। আর গিয়াছিলেন মাষ্টারমশায় যতীশ ঘোষ। এই দশজনের সম্মিলিত বৈঠকেই সেনগুপ্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল।

এদিকে ক্যাম্পেও তিন-নম্বর ব্যারাকে পঞ্চানন বাবুর সীটে এক গোপন বৈঠক বসিল। জরুরী তলব পাইয়া লাইব্রেরী ঘরের জমাট আড্ডাটা ত্যাগ করিয়া আমাকেও অবশেষে এই বৈঠকে উপস্থিত হইতে হইল। গিয়া দেখি

বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিরা চিন্তাকুল ও গম্ভীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অনুমান করিলাম, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর।

ব্যাপারটা এক কথায় এই যে, বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির নাই, ইহা তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার নহে। যুগান্তর ও অনুশীলন-পার্টির বাহিরে আরও একটি শক্তিশালী দল ছিল। এই দলটিকে নাম দেওয়া হইয়াছিল "রিভোল্ট পার্টি," পূর্বোক্ত দুই দলেরই চরমপন্থীগণ মিলিত হইয়া এই দল গঠন করিয়াছিলেন। এই দলের বক্তব্য না জানিয়া গেলে সেনগুপ্তের দায়িত্ব অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। এই গোপন বৈঠকে তাই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে, এই অবস্থায় কিংকর্তব্যং।

প্রতুলবাবু (ভট্টাচার্য), বিনয়বাবু, যতীনদা একে একে সকলেই স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করিলেন। সকল বক্তব্যেই একটা জ্বালা ও অপমানবোধ ব্যক্ত হইল। হইবার কারণও ছিল। যাহাদের লইয়া এই দল গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে নগণ্য বা তুচ্ছ ছিলেন না। তাঁহাদের বাদ দিয়া এই যে সাক্ষাৎকার, ইহাকে শিবহীন যজ্ঞ আখ্যা দেওয়া খুব বেশী অত্যুক্তি হইত না।

প্রতুলবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি করা যায় বলুন ?"

উত্তর দিলাম, "অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু আপনারা কি চান ?"

শুনিয়া প্রতুলবাবু আমার দিকে এমনভাবে তাকাইলেন যে, আমি যেন একটা গর্হিত প্রশ্নই করিয়াছি, অথবা নিতান্ত বোকার মতই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছি।

সংকট হইতে আমিই উদ্ধার করিলাম, কহিলাম, "সেনগুপ্তের সঙ্গে আপনারাও দেখা করতে চান, এই তো ?"

সকলের পক্ষ হইতে প্রতুলবাবু মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। বুঝিলাম আমি ইঁহাদের মনের ইচ্ছাটি অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছি।

কহিলাম, "কাগজ কলম নিন, একটা চিঠি লিখুন।"

প্রশ্ন হইল, "চিঠি ? কাকে ?"

—"মাস্টার মশায়কে।"

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া এই গোপন বৈঠকের সদস্যগণ আমার প্ল্যানটি নিজেদের কাছে পরিষ্কার করিয়া লইলেন এবং রিভোল্ট পার্টির হাইকমাণ্ড আমার প্ল্যান অনুমোদন করিলেন।

কাগজকলম আসিল। পঞ্চাননবাবুর নামে মাস্টার মশায়ের কাছে এক লাইনের একটি চিঠি গেল, "প্রয়োজন হইলে আমার ও আমার বন্ধুদের হইয়া আপনি কথা বলিতে ও দিতে পারেন।"

তখনই অফিস-আর্দালী নীলাদ্রিকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাহাকে যথাযোগ্য উপদেশ ও এক প্যাকেট সিগারেট দেওয়া হইল। পত্রখানা লইয়া নীলাদ্রি চলিয়া গেল। দশজনকে লইয়া সেনগুপ্ত আলাপে মগ্ন, নীলাদ্রি গিয়া চিঠিখানা মাস্টার মশায়ের হস্তে প্রদান করিল।

যাহা ভাবা গিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। চিঠিটি সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। চিঠির বক্তব্যও মাস্টার মশায় বৈঠকে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ফলে মৌচাকে ঢিল পড়িল।

মাস্টার মশায় বলিলেন, "পঞ্চাননবাবুকে ডেকে পাঠান।"

যুগান্তর ও অনুশীলন দুই পক্ষই প্রতিবাদ করিলেন, "না, তাহাকে ডাকা চলে না। যে একদিন আমাদেরই ভলান্টিয়ার ছিল, তাহার সঙ্গে একত্র এই আলোচনা চলিতে পারে না।"

মাস্টার মশায়ও সোজা জানাইয়া দিলেন, "পঞ্চাননবাবুকে ডাকা না হলে এ আলোচনাতে আমি যোগ দেব না।"

অবস্থাটা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিল এবং সেনগুপ্ত সমস্যায় নিপতিত হইলেন। বৈঠকের আলোচনা সেদিন শেষ হইল না। রাত্রি গোটা নয়েকের সময় সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে নেতৃবর্গ ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিবস ভোরে আবার নেতৃবর্গের ডাক আসিল, তাঁহারা পূর্বস্থানে পূর্ববৎ

সেনগুপ্তের সঙ্গে বৈঠকে সম্মিলিত হইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে পঞ্চাননবাবুর ডাক পড়িল।

পঞ্চাননবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেই যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির নেতৃবর্গ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একযোগে সকলেই আলোচনা-সভা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কেবল মাস্টার মশায় যতীশ ঘোষ নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। সেনগুপ্তের সঙ্গে পঞ্চাননবাবু কথাবার্তা শেষ করিয়া চলিয়া আসিলে পর নেতৃবর্গ আবার বৈঠকে প্রবেশ করেন। এতক্ষণ তাঁহারা বাহিরে গাছতলায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইল। দলাদলি আমাদের চরিত্রেও মাঝে মাঝে কোন প্রকৃতি ও কি আকৃতি গ্রহণ করিত, তাহার উৎকৃষ্ট একটি নিদর্শন এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। সেনগুপ্ত কার্যশেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর নেতারাও একে একে আসিয়া গোপনে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। প্রত্যেকেরই সেই একই বক্তব্য যে, উক্ত ঘটনার জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী নহেন, দায়ী অমুক নেতা। এই সাফাই-এর প্রয়োজন ছিল। কারণ বাঙলার শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী নেতারও এমন অধিকার অর্জিত হয় নাই, যাহাতে পঞ্চাননবাবু সম্পর্কে এমন ব্যবহার করা চলিতে পারে। চরিত্র ও তেজস্বিতায় পঞ্চাননবাবু প্রকৃতই বিপ্লবীদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

একটু ব্যক্তিগত কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নেতৃবর্গের অপমানজনক আচরণের কথা দিনের বেলাতেই বিস্তারিত পঞ্চাননবাবুর নিকট শুনিয়া লইয়াছিলাম। রাত্রে শুইতে গিয়া দেখি কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। সমস্ত মাথাটার মধ্যে শরীরের সমস্ত বাতাস যেন আসিয়া জমা হইয়াছে, এমনি মনে হইল। রক্ত মাথায় চাপিয়াছিল, তাহাও বলিতে পারেন।

অপমান যে কত জ্বালা, সেদিন বুঝিয়াছিলাম। রাগে, ক্রোধে, ঘৃণায় চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা উষ্ণ জল নির্গত হইয়া আসিল। আজও স্পষ্ট মনে আছে যে, রাত তখন গোটা দেড়েক হইবে, চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, আর মনে মনে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, "হে উদ্ধত ও গর্বিত বিপ্লবী নেতার দল, একদিন তোমাদের সকলকেই এই পায়ের তলায় আনিয়া আমি দাঁড় করাইব।"

তখন বুঝি নাই, আজ মাথা ঠাণ্ডা হওয়ায় বুঝিতে পারিতেছি যে, উদ্ধত ও গর্বিত বলিয়া নেতাদের উপর আমি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমার অহমিকাও যে সেদিন তাঁহাদের অহংকারকেও বহুগুণে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, এ খেয়াল আমার ছিল না।

মান-অপমান সমান জ্ঞান করিবার উপদেশ শুধু শাস্ত্রেই নহে, কর্মজীবনে বহু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও দিয়া থাকেন। অপমানের জ্বালা সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমি দ্বিধাহীনভাবেই বলিব যে, ইহা এক অসম্ভব উপদেশ। যে-মন আমরা ব্যবহারের জন্য পাইয়াছি. সে-মনে মান-অপমান সমান-জ্ঞান কোনকালে সম্ভব নহে। ধৈর্যশক্তি অধিক থাকিলে মান-অপমানের ধাক্কা সামলানো বড় জোর চলিতে পারে, কিন্তু উহাকে সমান-জ্ঞানে গ্রহণ কদাচ চলিতে পারে না। যে পর্যন্ত মন হইতে মানুষ মুক্ত হইতে না পারিবে, সে পর্যন্ত 'মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য' কথাটা পরম সত্যরূপেই স্বীকৃত ও স্থিত থাকিবে। যাহার মান-অপমান বোধ নাই, সে হয় মৃত নয় মুক্ত পুরুষ। সংসারে আমরা এই দুইয়ের কোনটাই নহি।

বৎসর ঘুরিয়া আর একটা নূতন বৎসর আসিল, আমাদের সুখের সংসারে ভাঙ্গন দেখা দিল। ১৯৩২ সালের প্রথমভাগেই বিপ্লবীদের আঠার জন নেতাকে 'ডেটিনিউ' হইতে তিন-নম্বর রেগুলেশনের রাজবন্দীরূপে পরিবর্তিত করা হইল। এই আঠারোজনের মধ্যে সতেরজনই ছিলেন বকসা ক্যাম্পের।

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা জিনিস আমাদের কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলাম যে, এ-ভাঙ্গন এখানেই শেষ হইবে না, ইহা শুধু আরম্ভ মাত্র এবং অদূর ভবিষ্যতেও আমাদের মুক্তি দিবার তেমন কোন ইচ্ছা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নাই, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন নদীর ভাঙ্গনপাড়ে ঘর বাঁধিয়াছি, এমন ভাবেই আমরা দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আতঙ্কজনক কানাঘুষা শোনা গেল যে, আমাদের জন্য বাংলার বাহিরে পাকা বন্দোবস্ত হইতেছে। বাংলায় আমাদের রাখা সরকার নিরাপদ মনে করেন না, আমাদের কোথায় রাখিয়া তাঁহারা একটু সুস্থির হইতে পারেন, অধুনা সেই বাঞ্ছিত স্থানের অনুসন্ধান চলিতেছে।

দুপুরবেলা, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আমরা জটলা করিতেছিলাম, বীরেনদা (চ্যাটার্জি) আসিয়া দেখা দিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই সাহেবী বাংলায় সকলকে শুনাইয়া তিনি সন্তোষ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা কারলেন, "ইউ সন্তোষ জংলী, টোম্বাকটো জানে ?"

গাঙ্গুলী শব্দটা বীরেনদার সাহেবী উচ্চারণে "জংলী" রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

সন্তোষবাবু কহিলেন, "টোম্বাকটো ? সে কি বস্তু, খায় না গায়ে মাখে ?"

বীরেনদা কহিলেন, "টুমি ডেকছি, কিচ্ছু জানে না।"

তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "টোমরা টৈয়ার ঠাকে, টোম্বাকটো যেটে হোবে।"

আমাদের চোখমুখের ভাব দেখিয়া বীরেনদা বুঝিলেন যে, তাঁহার 'টোম্বাকটো' আমাদের মালুম হইতেছে না। তিনি চটিয়া গেলেন, তাঁহার সাহেবী উচ্চারণ খসিয়া খাস বাঙ্গালী বুলি জিভ হইতে বহির্গত হইল।

কহিলেন, গোপেশ্বরের (আশু মুখার্জি) গোয়ালের যত গরু, কিছুই শেখনি দেখছি। এই জংলী, জিওগ্রাফিটা একটু নাড়াচাড়া কোর, টোম্বাকটো হোল একটা দ্বীপ, বুঝলে মূর্খ।"

আমরা সংবাদে যথারীতি ভীত হইলাম। সৌরভ ঘোষ বলিলেন, "দোহাই আপনার, দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না, তা হলে পেরাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।"

বীরেনদা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, ফিরবার প্রয়োজন হবে না। ওখানেই পেরাণ নিয়ে ঘরবাড়ী বেঁধে স্থায়ী বাসিন্দা হোতে পারবে, সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।"

দিনকতক পরে এমনই এক দুপুরের ব্যাপার, অফিস হইতে পত্রিকা আসিয়া গিয়াছে কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে বিলি করা হয় নাই। বীরেনদা একটা 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা টান দিয়া তুলিয়া লইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জয় মা বিশালাক্ষী, ফাঁড়া কেটে গেছে।"

কিরণদা (মুখার্জি) বারান্দা ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আগাইতেছিলেন। বলিলেন, "এই শূয়োর, এত আনন্দ কিসের ?"

কিরণদা ছোটবড় সকলকেই উক্তপ্রকার মধুর সম্বোধন করিয়া থাকেন। বীরেনদা জবাব দিলেন, "টোম্বাকটো যেতে হবে না, বেঁচে গেলেন।"

তারপর ঘোষণা করিলেন, "রাজপুতনার মরুভূমিতে ব্যবস্থা হচ্ছে। মিঃ ফিনী খোঁয়াড়ের স্থান নির্বাচনে বেরিয়েছে। নেও, চেঁচিয়ে পড়ে শুনাও,"

বলিয়া 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাখানা যতীন দাশের হাতে দিলেন এবং স্থানটুকু আঙুল দিয়া চিহ্নিতও করিয়া দেখাইলেন।

কয়েক ছত্রের ছোট্ট সংবাদ, আজমীড় হইতে 'স্টেটসম্যান'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বাংলা গভর্ণমেণ্টের পদস্থ পুলিশ কর্মচারী মিঃ ফিনী তথায় গিয়াছেন, বাংলার ডেটিনিউদের ব্যাপার সম্পর্কেই তাঁহার এখানে আগমন।

মিঃ ফিনী আমাদের ভূতপূর্ব কমাণ্ডাণ্ট এবং ডেটিনিউ সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। দুই আর দুই যোগ করিলে চার পাওয়া যায়, আমরাও এই নিয়মে ফল পাইয়া গেলাম যে, রাজপুতনাতে আমাদের জন্য পাকা বন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব দিয়াই ফিনী সাহেবকে ওখানে পাঠানো হইয়াছে।

সত্য সত্যই একদিন পালে বাঘ পড়িল। সারা ক্যাম্পটা চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বাথরুমে ছিলাম। হৈ হৈ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হন্তদন্ত হইয়া পাহাড় ভাঙিয়া তিন-নম্বর ব্যারাকে উঠিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সেখানে একটা মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

আজমীড় হইতে মাইল সত্তর-আশি দক্ষিণে রাজপুতনার মরুভূমিতে দেউলী নামক স্থানে একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে, এই হইল প্রথম সংবাদ। দ্বিতীয় সংবাদ, বাংলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাংঘাতিক বা খারাপ চরিত্রের একশত বন্দীকে সেখানে পাঠানো হইবে। তৃতীয় সংবাদ হইল এই যে, উক্ত একশতের ষাট জনই বক্সা-ক্যাম্প হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বাকী চল্লিশ জন যাইবেন বাংলার বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেল হইতে। চতুর্থ সংবাদ, বক্সা-ক্যাম্পের ষাটজনের নামের তালিকা কমাণ্ডাণ্ট আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন কুড়িজনের তিন তিনটি দলে ইহাদিগকে পাঠানো হইবে। এই সংগে কমাণ্ডাণ্ট আরও জানাইয়াছেন যে, প্রথম দল আগামীকল্য রওয়ানা

হইবে। একদিন বাদ দিয়া দ্বিতীয় এবং তারও পরে একদিন বাদ দিয়া তৃতীয় দল রওয়ানা হইবে। সর্বশেষ এবং সবচেয়ে খারাপ সংবাদ এই যে, আমি উক্ত ষাটজনের দলে পড়িয়া গিয়াছি।

সংবাদটিতে ক্যাম্পের মানসিক পরিমণ্ডলে ঝড় তুলিয়া সমস্ত যেন লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। যাঁহাদের যাইতে হইবে, তাঁহাদের মনের নোংগর তোলা হইয়া গেল, এখন পাড়ি দিলেই হয়। আর যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা যেন সেই বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় একেবারে ধরাশায়ী হইয়াই থাকিবেন, এমনই তাঁহাদের মনের অবস্থা।

পরদিন প্রথম দল রওয়ানা হইল। সমস্ত ক্যাম্পটা গেটে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে।

বীরেনদা ছিলেন এই প্রথম দলে। খোলা গেটের সম্মুখে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্বিনীদা কাঁদ কাঁদ স্বরে বরিশালিয়া ভাষায় কহিলেন, "আমাদের কি কইরা গেলারে।—"

বীরেনদাও উক্ত ভাষাতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, "কাঁদিসনারে, কাঁদিস না। ওরে আবাগী, ওরে লক্ষ্মীছাড়ী, কি চীজ সব রাইখ্যা গেলাম, বুঝবি, ঠ্যালা বুঝবি।"

দুইজন প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তির এই বিদায়-ভাষণ, বিচ্ছেদের ব্যথার উপর একটা হাসির স্বচ্ছ আস্তরণ বিছাইয়া দিল। বীরেনদা গেটের পথে শেষবারের মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর হাত তুলিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফলো মি। মেরা পিছমে পিছমে আ যাও" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

আমরা ছিলাম তৃতীয় দলে। দ্বিতীয় দল গত পরশ্ব রওনা হইয়া গিয়াছে। আজ আমাদের পালা।

মালপত্র বহু পূর্বেই রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। একসময়ে আমরাও বাহির হইয়া আসিলাম। ফোর্টের পশ্চিম সীমানায় ঝরণাটার কাছে আসিয়া

পড়িলাম। পুলও পার হইয়া পোষ্টাফিসের সম্মুখে আসিলাম। এখন পথের বাঁক ঘুরিতে হইবে।

কানে আসিল মণি লাহিড়ী রুণুবাবুকে বলিতেছেন, "ও প্রভু, এ কেমন হোলো, বক্সা-ক্যাম্পের জন্য মনটা যে কেমন করছে।"

প্রভু উত্তর দিলেন, "বৎস একেই বলে মায়া, ওরকম হয়েই থাকে। নেও, মন খারাপ করো না। সামনে চল—"

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, শেষবারের মত দেখিবার জন্য। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের এতগুলি দিনরাত্রি ওখানে রাখিয়া আসিয়াছি। আমারই অস্তিত্বের একটা অশরীরী-অংশ ওখানে হিমালয়ের পাষাণকোলে চিরকালের জন্য অহল্যার মত আবদ্ধ হইয়া রহিল।

বছর দেড়েক পূর্বে এক মধ্যাহ্নে বক্সা-দুর্গের তোরণদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আজ তেমনি আর এক মধ্যাহ্নে তাহাকে ছাড়িয়া আসিলাম।

পথের মোড় ফিরিতেই বক্সা-ক্যাম্প পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইল।

সমাপ্ত